ইতিকথার
পরের
কথা

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম সংস্করণ—ভাদ্র, ১৩৫৯

দ্বিতীয় সংস্করণ—বৈশাখ, ১৩৬৩

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট

কলিকাতা—১২

মুদ্রাকর—মন্মথনাথ পান

কে. এম. প্রেস

১।১, দীনবন্ধু লেন

কলিকাতা—৬

প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা:—

আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—

ফোটোটাইপ সিণ্ডিকেট

বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

চার টাকা

এই উপন্যাসটি 'নতুন সাহিত্য' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। পুস্তকাকারে প্রকাশ করার সময় অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্জন করা হয়েছে।

ভাদ্র, ১৩৫৯ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

এই লেখকের

পদ্মানদীর মাঝি | পুতুলনাচের ইতিকথা
দর্পণ জীয়ন্ত | শহরবাসের ইতিকথা
সোনার চেয়ে দামী (বেকার) | সোনার চেয়ে দামী (আপোষ)১
প্রাণেশ্বরের উপাখ্যান | শ্রেষ্ঠ গল্প

১

স্টেশনের গা ঘেঁষে কারখানার লম্বা শেড।

গেটের পাশে পিতলের ফলকেও নাম লেখা আছে—ছোট ছোট অক্ষরে। আলকাতরা দিয়ে বাইরের দেওয়ালে বিরাট বেমানান হরফে লেখা—নব শিল্পমন্দির।

এই ছোট নগণ্য স্টেশনটি ঘেঁসে একক শিল্প প্রচেষ্টার অভিনবত্বের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এত বড় হরফ সন্দেহ নেই। কিন্তু পথের সঙ্গে সমান্তরাল-ভাবে গড়া ইটের দেওয়াল ও টিনের ছাউনিওলা লম্বাটে চালা ও লোহার চিমনিটাই সে কাজ আরও ভালোভাবে করছে, বেখাপ্পা হরফ দিয়ে এ রকম ঘোষণার কোনই দরকার ছিল না। নজরে পড়ার মত এরকম আর কিছুই নেই স্টেশনে বা আশেপাশে। স্টেশনের সংলগ্ন লাল ইটের ঘর কয়েকটি যতদূর সম্ভব ছোট এবং সংক্ষিপ্ত। স্টেশন মাস্টারের দু'কামরার কোয়ার্টারটি দেখলে মনে হয় ছাদে মাথা ঠেকে যায় না তো, পা ছড়িয়ে শুতে পারে তো? পথের দু পাশে শুধু খড় ও টিনের কতকগুলি ঘর এবং চালা, মাত্র কয়েক ঘর মানুষের বসবাস ও দোকান চালাবার প্রয়োজনে এগুলি উঠেছে। কাছাকাছি নাগালের মধ্যে বড় গ্রাম নেই। স্টেশনের লাগাও বসতিটার মতই এখানে ওখানে খোপ খোপা বসানো ছাড়া ছাড়া বসতি, ছোট ছোট কাঁচা কতকগুলি ঘরের সমষ্টি গ্রাম অবশ্যই আছে, বাংলার সর্বত্রই ঘন বসত গ্রাম। স্টেশন থেকে একটু দূরে দূরে পড়েছে গ্রামগুলি। যেন সযত্নে হিসাব করে সমস্ত বড় বড় গ্রাম থেকে যতদূর সম্ভব দূরত্ব বজায় রাখতেই স্টেশন করার জন্য এই স্থানটি বেছে নেওয়া।

আসলে কিন্তু তা নয়। এখান থেকেই কারখানার [illegible]

কাছে হয়, মাইল চারেক। অন্য গ্রামের হিসাব ধরাই হয়নি। স্টেশনের নামও বারতলা।

দু-পাশের স্টেশন দুটি বারতলা থেকে বেশী দূরে দূরে নয়। ওই দুটি স্টেশন থেকেই এই এলাকার বেশীর ভাগ গ্রামে যাতায়াতের সুবিধা। বারতলায় তাই যাত্রীর ভিড় হয় না। প্ল্যাটফর্মে হাঁটলে চোখে পড়ে এখানে ওখানে ঘাসের চাপড়া গজিয়ে আছে লাল কাঁকর ঢেকে দিয়ে। স্টেশন থেকে বারতলা পর্যন্ত সিধে রাস্তার দু-পাশের কয়েকটি ছোটখাটো গ্রাম আর ওই বারতলার যাত্রীরাই শুধু এই স্টেশন ব্যবহার করে।

রাস্তা করার সময়েও অন্যান্য বড় গ্রামগুলির কথা ভাবা হয়নি—জমিদার যেখানে বাস করে সেই বারতলা গ্রামটি ছাড়া যেন রাস্তাঘাটের প্রয়োজন অন্য গ্রামের নেই।

ভিড় হয় বর্ষাকালে। আশে পাশে এই রাস্তাটিই বর্ষাকালে কাদা-শূন্য থাকে। খানিকটা বেশী পথ হাঁটতে হলেও অনেক গ্রামের লোক তখন এই স্টেশন দিয়েই যাতায়াত করে,—কর্দমাক্ত পিছল পথে হাঁটা যতটা সম্ভব কম করার জন্য।

যুদ্ধের সময় ছোট বড় সব শিল্প যখন মেকী ঐশ্বর্যের গরমে খুব ফুলছে, তখন বারতলার জমিদার জগদীশের ছেলে শুভময়ের দুঃসাহসী স্বপ্ন এই কারখানার রূপ নেয়। আত্মীয় বন্ধু নিষেধ করেছিল। টাকা ঢালতে চাও, নবশিল্প গড়তে চাও, শহর থেকে এতদূরে কেন? শহরের চারিদিক বিস্তৃত শিল্পাঞ্চল, এমন কত স্টেশন আর রাজপথের ধারে কত জমি সস্তায় বিকিয়ে যাবার জন্য সাইন-বোর্ড বুকে নিয়ে পতিত হয়ে আছে। একটা সুবিধামত স্থান বেছে নিয়ে টাকা ঢালো, কারখানা করো, ভবিষ্যৎ আছে। এতদূরে এখানে কি এসব কারখানা চলে? সে রকম বড় কারখানা হয়, যাকে ঘিরে আপনা থেকে একটা লোকালয় গড়ে ওঠে, ওয়াগন বোঝাই হয়ে হয়ে কাচা মাল আসে আর তৈরি মাল চালান যায়, সেটা হয় আলাদা কথা। স্টোভ ল্যাম্প লণ্ঠনের মত টুকিটাকি জিনিসের কারখানা এখানে চলতে পারে না।

আত্মীয় বন্ধু কেন, চারিদিকের জীবন ও পরিবেশও যেন তাকে একবাক্যে নিষেধ করেছে, এখানে নয়, এখানে কিছু হবে না। মনুষ্যত্ব ছাড়া কিছু নেই এখনকার মানুষের। মানুষ যে প্রকৃতিকে জয় করেছে, মানুষ যে পশু নেই, তার আদিম কিছু প্রমাণ শুধু মেলে লাঙল দিয়ে জমি চষায়, তাঁত বোনায়, মাটির হাঁড়িকলসী গড়ায়, কুঁড়ে ঘরে উনানের আঁচে লোহা তাতিয়ে কামারের হাতুড়ি ঠোকায়। দুঃখ দৈন্য রোগ শোক ক্ষুধা আর উগ্র অসন্তোষ নিয়ে মানুষ বাস করে, মনের আদিম অন্ধকারে পথ হাতড়ায়। বর্ষায় ঘর ভাসে, খরায় মাঠের ফসল জ্বলে যায়, ডোবা পচে, মশার ঝাঁক ওড়ে, প্রতিটি দিনের সঙ্গে শেষ হয় পথের অভাবে মাঠ ভেঙে চলাফেরা আর স্থূল শিথিল কাজ কর্ম, তেলের অভাবে সন্ধ্যাবেলাতেই সন্ধ্যাদীপ নিভে গিয়ে শুরু হয় নিষ্ক্রিয় ঝিম-ধরা দীর্ঘ রাত্রি। কী দিয়ে রচিত হবে নবশিল্প ?

তবু শুভ থামেনি। কে জানে পল্লী মায়ের শান্ত মধুর স্নেহসিক্ত বিষাদের হতাশা থেকে জিদ এসেছিল কি না। শহর থেকে দূরেই নবশিল্প গড়া দরকার। দূরত্ব ? রেললাইনের ধারে পঞ্চাশ ষাট মাইল কিসের দূরত্ব ! মজুরের অভাব কিসের ? ভূমিহীন কত চাষী উপোস দিচ্ছে, দলে ভিড়ে, আন্দোলন আর হাঙ্গামা করে ক্ষুধার্ত বাঘের মতই মরিয়া নিষ্ঠুর থাবার ঘায়ে ভেঙে চুরমার করে দিতে চাইছে সমাজ সংসার। ওদের একটু শিখিয়ে পড়িয়ে নিলে মজুরের অভাব হবে না।

মজুরি পেয়ে ওরাও বাঁচবে, শান্ত হবে।

যুদ্ধের সময়টা বেশ চলেছিল কারখানা। বারতলা আর আশে পাশের গাঁ থেকে যারা প্রাণ বাঁচাতে শহরের শিল্পাঞ্চলে গিয়ে কারখানায় ঢুকেছিল, তাদের মধ্যে থেকে কিছু লোক ফিরিয়ে এনেছিল জগদীশ। বিদেশে কেন, ঘরে বসে তার ছেলের কারখানায় খেটে রোজগার করবে। তাছাড়া ঘষে মেজে তৈরি করেছিল স্থানীয় কিছু আনাড়ী ভূমিহীন চাষীকে।

যুদ্ধ থামার পর ক্রমে ক্রমে কারখানাও থেমে এসেছে। প্রকট হয়েছে একটা সত্য, শিল্পরাণী অসতী নয়। কোটিপতি পতি ছাড়া কারো দাসীত্ব সে

করবে না। পতি চাইলে তবেই দু-দিনের জন্য একটু ভাব করবে ছুটকো খাবারি প্রেমিকের সঙ্গে, আসলে তার পতি-অন্ত প্রাণ।

রাত নটার গাড়ি আসছে। চাঁদের আলোয় খানিকটা আলো হয়েছে চারিদিক, স্টেশনের বাতি কটা টিম টিম করে জ্বলছে। কুয়াশার সঞ্চারটা অস্পষ্ট অনুভব করা যায়। এখনো ভালোভাবে চোখে ধরা না পড়লেও টের পাওয়া যায় যে ধীরে ধীরে ঘন কুয়াশাই নামছে।

রাত্রির এই গাড়ি থেকে দু-তিন জনের বেশী যাত্রী কোনোদিনই নামে না। কোনদিন গাড়িটা শুধু একটু থেমে দাঁড়িয়ে একটি মানুষকেও নামিয়ে না দিয়ে সিটি মেরে চলে যায়। স্টেশনের বাইরে অন্য দোকান কটি আগেই বন্ধ হয়ে গেছে, আলো জ্বলছে শুধু দুটি দোকানে। গজেনের পান বিড়ি ও চিড়ে মুড়ির মেশাল দোকান এবং সনাতনের দেশী খাবার ও তেলেভাজার দোকান।

সব গুছিয়ে ঠিকঠাক করে দোকান বন্ধের আয়োজন করে রেখেছে দুজনেই। গাড়ি থেকে কেউ নামে কি না, কিছু কেনে কি না দেখেই ঝাঁপ বন্ধ করবে।

সনাতন এখানেই থাকে, দোকানের পিছনটায় তার বাস। গাড়ি আসবে বলে প্ল্যাটফর্মের বাতি কটা জ্বালানোর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভিতরের ঘরে সুরমা কুপী জ্বালে। দেশলাই-এর কাঠি জ্বেলে নয়, দোকানের আলো থেকে ছেঁড়া এক টুকরো কাগজ জ্বেলে নিয়ে। রাত্রে পেটপূজার বাকি আয়োজনটুকু সেরে ফেলবে। রাত্রে তারা দুজনে একসাথে গল্প করতে করতে খায়। কপালে যেদিন যা জোটে, সেদিন তা খায়।

কুপী জ্বালাবার সময় গজেন বেদনায় মুখ বাঁকিয়ে বলে, ও মাসী, পা-টা বড় টাটাচ্ছে গো। ঘরে আজ ফিরতে পারব না। একটু ভাগ দিও, তোমার খেয়ে তোমার ঘরে শুয়ে রাতটা কাটিয়ে দেব। কি করি!

সনাতন বোঝে না, সত্যই ধরে নেয় গজেনের খোঁড়া পা-টা ব্যথা করছে। তাদের ঘরে শুয়ে রাত কাটাবার কথাটা যোগ না দিলে ধরতে পারত না সে তামাসা করছে, বিপাকে পড়ে যেত। নিজের দোকান ঘরটা থাকতে তাদের ঘরে রাত কাটাবার কথা বলায় তামাসা ফাঁস হয়ে গেছে তার কাছে।

সে বলে, বেশ তো ভাগ্নে, খেও। পেঁয়াজ কলির চচ্চড়ি রেঁধেছি। আমার সাথেই শুয়ো।

তামাসার জবাবে তামাসা কিন্তু একটুও হাসে না সুরমা। কুপী জেলে পিছনের ঘরে যায়। কাঁচা-পাকা বাবরি চুল পিছনে ঠেলে দিয়ে খোঁড়া পায়ে একটা থাপ্পড় মেরে হাসি মুখে বিড়ি ধরিয়েছিল গজেন। নাঃ, মেয়েটা সত্যি চালাকচতুর। নইলে এই অচল অবস্থায় স্টেশনের ধারে এই চালা ঘরে এক-গুঁয়ে সনাতনকে নিয়েই শেষ পর্যন্ত একটা সুখের নীড় গড়তে পারত!

তার বড় মেয়ের বয়সী হবে সুরমা। তবু তাকে সে মামী বলে ডাকে। কারণ সনাতন দূর সম্পর্কে তার ভাগ্নে হয়।

দূরে গাড়ির আলো দেখা গেলে সেদিকে চেয়ে সনাতন চিন্তিত ভাবে বলে, পা-টা হঠাৎ টাটাল যে মামা?

গুলির চোটে ঠ্যাং খোঁড়া হলে মাঝে মাঝে অমন টাটায়। তুই কি বুঝবি?

ঝাঁপ আমি লাগাবখন মামা। তুমি এসে খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়। একটা মালিশ টালিশ হলে—

গজেন বিড়ির ধোঁয়া ছেড়ে হেসে বলে, তুই সত্যি গোমুখ্যু সনাতন!

সশব্দে ট্রেনটা এসে থামে। আওয়াজ শুনে খেঁকি কুকুরটা এসে দাঁড়িয়েছে দোকানের সামনে, খাবার কিছু কেনা কাটা হলে পাতাটা চাটতে পাবে। সম্প্রতি বাচ্চা পেড়েছে, সমস্ত শরীরটা চামড়া ঢাকা কঙ্কালের মত শীর্ণ, শুধু আকণ্ঠ খিদের আগুন। জালা পেটটার নীচে ঝুলছে সরস দুধে ফুলে ওঠা স্তনগুলি।

একজন যাত্রীকে নামিয়ে দিয়ে গাড়িটা চলে যায়। মোটে একজন? সনাতন চটে বলে, দ্যুৎ! একঘণ্টা বসে থাকাই সার হল।

কেন, দশ বারো গণ্ডা পয়সা বেচলি না?

তা বটে। এই শেষ গাড়ির যাত্রীর আশাতেই কি আর তারা দোকান খোলা রেখেছে এতক্ষণ। গায়ে হাঁটা পথিক খদ্দের দু-চারজন না জুটলে আটটার গাড়ি বেরিয়ে গেলেই ঝাপ বন্ধ করত।

মাথা ঢেকে গায়ে চাদর জড়ানো যাত্রীটির। চেনা না গেলেও বোঝা যায়

বয়স্ক ভদ্রলোক। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে, তাদের দোকানের দিকে এক নজর তাকিয়ে পা বাড়ায়। কিছু কেনার তাগিদ নেই।

গজেন ডেকে বলে, বাবু যাবেন কোথা? পান বিড়ি নিয়ে যান, আর পাবেন না।

বারতলা যাব। পান বিড়ি খাই না বাবা।

সনাতন চেষ্টা করতে ছাড়বে কেন? সে চেঁচিয়ে বলে, সে তো দু-কোশ পথ বাবু। নতুন গুড়ের ভাল সন্দেশ ছিল, দুটো মুখে দিয়ে যান। এত রাতে গাঁয়ে কিছু মিলবে না কিন্তু।

খানিকদূর এগিয়ে গিয়েছিল মানুষটা, থমকে দাঁড়ায়। গটগট করে ফিরে এসে দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে বলে, কে ডাকলে সন্দেশ খেতে? নতুন গুড়ের সন্দেশ! সব ব্যাটা সন্দেশ খাওয়ালো, বাকি আছ তুমি! জীবন-ভোর জেল খাটিয়ে ঢের সন্দেশ খাইয়েছ, বুড়ো বয়সে আর তামাসা কেন বাবা?

মাথা থেকে চাদরটা খসে গেছে। বয়স ষাটের কম হবে না। গায়ের লোম ওঠা মোটা গরম চাদরটিতে বাড়িতে আপন হাতে সস্তায় সাফ করার চেষ্টাটা খুব স্পষ্ট, সাবান-কাচা ধুতি ও জামাটিতেও ইস্ত্রীহীনতার দীনতা। পায়ে বাদামী রঙের ক্যাম্বিশের জুতো। দোকানের আলোয় গভীর শ্রান্তি ও অবসাদের সঙ্গে তীব্র বিরক্তি মেশানো তার থমথমে মুখ দেখে সনাতন চুপ করে থাকে।

গজেন বলে, ছি ছি, তামাসা কিসের? রাত হয়েছে, গাঁয়ের দিকে খাবার টাবার জুটবে না, তাই বলা—

তবু গরম মেজাজ নরম হয় না ভদ্রলোকের।

হ্যাঁ হ্যাঁ জানি, সব জানি। তাই বলা যে সন্দেশ খেয়ে যান! লোক দেখে টের পাও না লাটবেলাটের গদি পায়নি, লাখ দু-লাখের পারমিট পায়নি? খেতে জোটে না, ঠাণ্ডা রাতে পায়ে হেঁটে চার মাইল পাড়ি দিচ্ছে, সন্দেশ খাবে! যারা সব গুছিয়ে নিয়ে বসেছে, তাদের ডেকে সন্দেশ খাইও। আমাকে কেন!

পাগলাটে বুড়োর বাচালতা মনে হয় না, জোরের সঙ্গে গুছিয়ে বলার ভঙ্গিটা

সুন্দর, বক্তৃতার আমেজ আছে! ঝাঁঝটা সত্যই আন্তরিক। গজেন বলে, আপনারে চিনি চিনি মন করে—

চিনি চিনিই মন করবে। এখন আর চিনবে কেন? দরকার কি!

মানুষটা আর দাঁড়ায় না, হন হন করে চলতে শুরু করে। ধীরে ধীরে কুয়াশা ঘন হচ্ছে, আরও অস্পষ্ট হয়ে এসেছে জ্যোৎস্না। দেখতে দেখতে সেই কুয়াশার সঙ্গেই ছায়ার মত মানুষটা মিলিয়ে যায়।

সুরমা বলে, কী মেজাজ গো বাবা! সত্যি চেনা নাকি?

গজেন বলে, চেনা চেনা যেন লাগল।

সনাতন এতক্ষণে বলে, ভাবলাম দুটো কড়া কথা শুনিয়ে দি। অত মুখ কিসের? তা, কেমন যেন মায়া হল!

সুরমা হেসে বলে, মায়া হল তো মাগনা দুটো সন্দেশ খাইয়ে দিলে না কেন?

গজেন তাড়াতাড়ি দোকান বন্ধ করে। তাকেও খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে পাড়ি দিতে হবে এই পথে। ছোটখাট যে চাষীপাড়ায় তার ঘর, এখান থেকে এক মাইল পুরো হবে না। কিন্তু নেংচে নেংচে গিয়ে পৌছতে তার প্রায় এক ঘণ্টা লেগে যাবে। পয়সার থলিটা কোমরে বাঁধা ছিল, চালের ছোট্ট পুঁটুলিটা ছেঁড়া চাদরের আস্ত কোণটাতে বেঁধে কাঁধে ফেলে, বেগুন দুটোর বোঁটা বাঁকিয়ে কোমরে গুঁজে দু-হাতে মোটা লাঠিটা বাগিয়ে ধরে সে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে রওনা দেয় ঘরের দিকে।

দিনের বেলা এখান থেকে তার ঘরের পাশের তালগাছ কটা চোখে পড়ে। গুলি লেগে পা-টা খোঁড়া হবার আগে কত সংক্ষিপ্ত ছিল এই পথটুকু। দিনে দশবার যাতায়াত করলেও মনে হত না পথ হাঁটা হয়েছে। আজ কত দীর্ঘ হয়ে গেছে পথটা তার কাছে।

পাড়ার কাছাকাছি পৌছে গজেন পথের পাশ থেকে ডাক শোনে, কে যায়? একটু শোন ভাই, শুনে যাও।

মনে হয় সেই মানুষটার গলা, তবু গজেন শক্ত করে মোটা লাঠিটা বাগিয়ে

ধরে। ঠাহর করে দেখে বুঝতে পারে সামনে অল্প দূরে পা ছড়িয়ে বসে আছে একটা মানুষ—মনে হয় সেই মানুষটাই। তবু সেইখানে দাঁড়িয়ে গজেন জিজ্ঞাসা করে, কে?

আমি রে বাবা, আমি! ভয় নেই, একটু এগিয়ে এস।

আপনি ইস্টেশান থেকে এলেন না?

হাঁ, হাঁ, স্টেশন থেকে এলাম। তুমিই আমাকে সন্দেশ খেতে ডেকেছিলে নাকি? রাগ করিস না বাবা, বড় বিপাকে পড়েছি!

গজেন কাছে এসে বলে, আজ্ঞে না, আমি সে নয়। মোর পান বিড়ির দুকান। আপনার হল কি?

ভদ্রলোক বলে, আর হল কি, মন্দ কপালে যা হবার তাই হল, গর্তে পড়ে পা মচকে গেল। ভেঙেছে কি না কপাল জানে। এখন করি কি? রাস্তার ধারে পড়ে মরা অদেষ্টে ছিল শেষকালে!

গজেন বলে, রাম রাম, মরবেন কেন! মানুষের জগতে মানুষ এমনি করে মরতে পায়?

একটু ভেবে বলে, হাঁটতে পারবেন না আস্তে আস্তে? টেনেটুনে দেব পা-টা? মোদের পাড়া এই খানিকটা পথ হবে।

টেনেটুনে দেখেছি, পা পাততে পারি না। এক পা হাঁটতে গেলে মরে যাব। এখুনি যা যন্ত্রণা হচ্ছে কি বলব বাবা তোমাকে।

গজেন উবু হয়ে বসেছিল, উঠে লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে সখেদে নিশ্বাস ফেলে বলে, যদি বা একটা মানুষ এলাম, মোর পা-টা ফের খোঁড়া! ধরে যে নিয়ে যাব পথটা সেটুকু খ্যামতা নেই। খানিক বসেন তা হলে, লোকজন ডেকে আনি।

একটু শীগগির করিস বাবা!

শীগগির কি চলতে পারি বাবু? খানিক এগিয়ে হাঁক মারব, কেউ শুনতে যদি পায় তো ভালো।

গর্তে আচমকা হোঁচট খেয়ে খোঁড়া একটা মানুষকে আবছা কুয়াশায় পথের

ধারে বসিয়ে রেখে আরেক খোঁড়া সাহায্যের খোঁজে যতটা পারে তাড়াতাড়ি চলবার চেষ্টা করে। সেই কবে চাষী আন্দোলনে নেমে গুলি লেগে খোঁড়া হয়েছিল পা-টা, এমনি সব প্রয়োজনের সময় এত জ্বালা বোধ হয় যে বুঝতে পারা যায় খুঁড়িয়ে চলাটা এত দিনেও অভ্যাস হয়নি। তারই ক্ষোভ আর আপসোসে যেন চারিদিক স্তব্ধ হয়ে আছে, শিয়াল পর্যন্ত ডাকে না।

আধঘণ্টা পরে পাঁচজন যোয়ান চাষী এসে পড়ে, একজনের হাতে একটা কালি পড়া লণ্ঠন। ভদ্রলোককে খুঁজতে হয় না, দূর থেকে আলো দেখেই সে হাঁক ডাক করে নিজের অবস্থান জানিয়ে দেয়।

দুখানা মোটা বাঁশে একটি বড় পিঁড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে আনা হয়েছিল। দু-তিন জনে ধরাধরি করে তাকে পিঁড়িতে বসায়, তারপর দোলার মত চারজনে বাঁশ দুটি কাঁধে তুলে নেয়।

লোচন বলে, বাঁশটা ধরে ভালো হয়ে বসেন, মোরা পা চালিয়ে চলি। চুন হলুদ গরম করছে, লাগিয়ে দিলে যন্ত্রণা কমবে।

জানো বাবারা, ধরা গলার ভিজে আওয়াজ থেকে সন্দেহ জাগে যন্ত্রণাকাতর মানুষটার চোখেও নিশ্চয় জল এসে গেছে,—এ দেশে খাঁটি মানুষ থাকে। একটা দুটো নয়, অনেক মানুষ!

গাঁ নয়, ছোট পাড়ার মত। গায়ে গায়ে ফাঁকে ফাঁকে এলোমেলো ভাবে ছড়ানো বারো চোদ্দখানা খড়ের ঘর। দুখানা টিনের ঘর ছিল, টিন যখন সস্তা ছিল এবং পাওয়া যেত সেই সময় করা হয়েছিল—পুরানো ঝাঁঝরা হয়ে গেলেও ইদানীং আর টিন না যোগাতে পেরে সে দুটোরও খড়ের চালা হয়েছে। পশ্চিমের ডোবার ধারে চারখানা ঘর ছিল অন্য ঘরগুলি থেকে একটু তফাতে, পুড়ে ছাই হয়ে গেছে গত দাঙ্গাহাঙ্গামার সময়। সে ঘরগুলি আর ওঠেনি।

লোচনের ঘরের ঢাকা দাওয়ায় তাকে বসিয়ে বুড়ো রসিক অন্ধকারেই নানা কথা বলে যায়। এই চাষী পাড়ায় সেই সবার চেয়ে মান্যগণ্য। পাড়ার মেয়ে পুরুষ অনেকেই এসে হাজির হয়েছে। কে এসেছে, কজন এসেছে অন্ধকারে ঠাহর করা যায় না। শুধু কথা বললে গলার আওয়াজ থেকে মানুষটা কে বুঝে নেওয়া

চলে। রাস্তার কথাই বলে রসিক। সাধে কি গর্তে পা পড়েছে ভদ্রলোকের, সারা রাস্তায় শুধু গর্তের ফাঁদ পাতা। কারো মাথা ব্যথা নেই রাস্তাটার জন্য। অমন পয়সাওলা জমিদার বারতলার, তার গ্রামের নামে স্টেশনের নাম, কারখানা তুলতে অত টাকা নষ্ট করতে পারে, রাস্তাটা ঠিক করার দিকে নজর নেই।

গর্তে পড়ে মোদের নয় ঠ্যাং মচকাল একবার দুবার। দামী গাড়ির চাকা ভাঙবে কার ?

কথা বলতে বলতে বিরক্ত হয়ে রসিক ঝেঁঝে ওঠে, লেণ্টানটা আন না বাবা কেউ ? একটু চুন হলুদ করতে যে রাত কাবার হল।

মেয়েলি গলায় জবাব শোনা যায়, লেণ্টান নিয়ে গেছে। পিদিম জ্বাললে হয়।

রসিক বলে, হয় তো জ্বাল না কেনে পিদিম একটা ছোট বৌ ?

মেয়েলী গলায় তেমনি ফিস ফিস আওয়াজে দৃঢ় স্পষ্ট জবাব আসে, বলে দিলেই পিদিম জ্বলে। কে এল না কে এল, আলো জ্বালবে না আঁধার রইবে জানবো কিসে ?

মোটা সলতের বড় প্রদীপ জ্বলে উঠে দাওয়ার অন্ধকার দূর করে। শাঁখা পরা হাত তিলচিটে ভাঙা কাঁসার গ্লাসটা আগন্তুকের সামনে উপুড় করে রেখে তার উপর প্রদীপটা বসিয়ে দেয়, আঙুল দিয়ে উসকে দেয় সলতে।

রসিক এক মুহূর্ত হাঁ করে চেয়ে থেকে নিজের দুই কান মলে ফোকলা মুখে একগাল হেসে বলে, হা রে আমার পোড়া কপাল, আপনি জীবনবাবু! এতক্ষণ কথা কইলাম, গলা শুনে চিনলাম না ? আরে ও গজেন, তুইও চোখের মাথা খেয়েচিস, জীবনবাবুকে চিনলি না ?

গজেন সোজা তাকিয়ে থাকে দাওয়ার বাইরের অন্ধকারের দিকে। গুলিতে পঙ্গু পায়ে হাত বুলাতে বুলাতে রুক্ষ কঠোর স্বরে বলে, না, চিনলাম আর কই ? চিনি চিনি করেও তো চিনলাম না। চিনলে কি আর খোঁড়া পা নিয়ে উঠিপড়ি খবর দিতে ছুটে আসতাম ? যেথায় থাকা উচিত ছিল সেথায় পড়ে রইত তোমার জীবনবাবু।

চারিদিক থমথম করে। গজেন এসে শুধু খবরটাই দেয়নি, পাশের গাঁ থেকে নন্দ ডাক্তারকে ডেকে আনার প্রস্তাবও সে করেছিল। লণ্ঠনটা নিয়ে ডাক্তার ডাকতে লোক চলে গেছে। বিদেশী একজন ভদ্রমানুষ তাদের দেশ গাঁয়ে এসে বিপাকে পড়েছে, এটুকু না করলে তাদের মর্যাদা থাকে না। শুধু পা মচকানোর জন্য ডাক্তার! এটা তার বাড়াবাড়ি মনে হলেও কৈলাসকে পাঠানো হয়েছে নন্দ ডাক্তারকে ডেকে আনার জন্য।

কারণ গজেন আরও একটা যুক্তি দেখিয়ে বলেছিল, পায়ে যখন গুলি লাগল কি যে না করেছিল বাবুরা মোর জন্যে? তাদের জন্যই তবু খুঁড়িয়ে হাঁটতে পারি।

চাষীর শোভাযাত্রা করে শহরে গিয়েছিল, সেই পুরানো ঘটনা। তাই বটে! তাই বটে! তাদের সকলের প্রাণের মানুষ রসিককেও শহরের এক ভদ্রবাড়ির অন্তঃপুরে লুকিয়ে রেখে মেয়ে বৌরা সেবা করে বাঁচিয়েছিল, হাসপাতালে গেলে একেবারে জেল ঘুরে কতদিনে সে ফিরতো কে জানে! শহরের বিদেশী মানুষ-টার জন্য যথাসাধ্য করতে হবে বৈকি। গজেন ঠিক বলেছে।

সেই গজেনের মুখে এই কথা! চিনতে পারলে জীবনকে সে পথের ধারেই পড়ে থাকতে দিত!

জীবন খানিক স্তব্ধ হয়ে থেকে বলে, দেখলে তো রসিক? শুনলে তো কথা? সারা জীবন জেল খেটে আর ত্যাগ করে কপালে কী পুরস্কার জুটেছে দেখলে তো? আমি তো বাবা তোর ঠ্যাং খোঁড়া করিনি!

গদি পেলে করতেন।

মৃদু হাসির একটা গুঞ্জন উঠেই থেমে যায়, সে হাসির নিষ্ঠুরতা প্রকট হয়ে পড়ে তাদের কাছেই। একজন শ্রান্ত আহত জীবন্ত মানুষ, অর্ধেকের বেশী চুল সাদা হয়ে গেছে, মুখে পড়েছে জীবনব্যাপী দুঃখ ও দারিদ্র্যের রেখা। তর্ক চলে, মানুষটার উপস্থিতি অবলম্বন করে প্রকাশ করা চলে প্রাণের জ্বালা, কিন্তু সামনা-সামনি তাকেই কি আর বিদ্রূপ করা যায়!

এ মানুষটার জ্বালাও কম নয়। স্টেশনে নতুন গুড়ের সন্দেশ কিনতে বলা

নিয়ে তার তেড়ে রুখে ওঠার গল্প গজেন সকলকে শুনিয়েছে। দাওয়ায় এসে বসার পর কথায় কথায় কতভাবে যে বেরিয়ে এসেছে বঞ্চিত মানুষটার অন্তরের জ্বালা। তবে তাদের জ্বালা এর জ্বালায় যেন বিষ আর আগুনের ফারাক। লক্ষ কোটি মানুষের জগৎটা এর একার জীবনের ব্যর্থতার আপসোসে আড়াল হয়ে গেছে। নইলে এতক্ষণে একবার জিজ্ঞাসা করে না বিশ বছর আগেকার দেশগাঁ ও কর্মক্ষেত্রের খবরাখবর, পুরানো দিনের চেনা মানুষের কুশল ? বিশ বছর আগে এদিকে তার আন্দোলনে রসিক ছিল তার বড় সহায়, ছায়ার মত মুখের কথায় ওঠা বসার ভক্ত সাথী ছিল অল্প বয়সী গজেন—আজ বুঝি সে সব কথা তার মনেও নেই। জীবনের সব স্মৃতি তুচ্ছ হয়ে গেছে দুঃখ ও ত্যাগের প্রতিদানে কি পায়নি তারই হিসাব ছাড়া।

গজেন বলে, কী হল চুন হলুদ ? আজ রাতে গরম হবে ?

অল্প বয়সী একটি বৌ গরম চুন হলুদের বাটি এগিয়ে দেয়। জীবন আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করে, গাঁয়ের কচি বৌদের ঘোমটা কী অদ্ভুত রকম হ্রস্ব হয়ে গেছে ; এতগুলি পুরুষ ও বিদেশী একটা মানুষের সামনেও, মুখ পর্যন্ত দেখা যায়। এ অবস্থায় একদিন এই বৌটিরই বুকের কাপড়ে টান পড়িয়েও একগলা ঘোমটায় মুখটা আড়াল না করা ছিল নিন্দার কথা।

রসিক বলে, ডাক্তার এসে পড়বে এখুনি, চুন হলুদটা থাকত, না কি বল ?

গজেন বলে, গরম গরম লাগিয়ে দিলে আরাম হবে। ডাক্তার এলে তুলে ফেলতে কতক্ষণ ?

কিন্তু চুনহলুদ পায়ে লাগাবার আগেই সাইকেলের ঘণ্টা শোনা যায় নন্দ ডাক্তারের, টর্চের জোরালো আলো নজরে পড়ে।

নন্দর বয়স বেশী নয়, রোগা লম্বা চেহারা। সে দাওয়ায় উঠে পিঁড়িতে বসলে রসিক পরিচয় দিয়ে বলে, ইনি বড়গাঁর জীবনবাবু। স্টেশন থেকে আসছিলেন, গর্তে পড়ে পা-টা মচকে গেছে।

অনেককাল আগে গাঁ ছেড়ে শহরে বড় ছেলের কাছে চলে গেলেও এ এলাকায় এখনো লোকে তাকে বড়গাঁর জীবনবাবু বলে চেনে।

জীবন বলে, তুমি নারাণ কর্মকারের ছেলে না? ছাখো তো বাবা হাড়টাড় ভেঙেছে নাকি। পাশ করে গাঁয়েই বসেছ?

পাশ করিনি। বিয়াল্লিশে জেলে গেলাম, এদিকে বাবা মারা গেলেন। পাশ করা হল না।

বোঝা যায় সে পাশ করা ডাক্তার নয় বলে জীবন বেশ ক্ষুণ্ণ হয়েছে। গেঁয়ো ডাক্তার নন্দ তার পা টিপে-টুপে টেনে-টুনে পরীক্ষা করে, জীবন মাঝে মাঝে কাতরায়। বেশ ফুলেছে যায়গাটা। এতক্ষণ সে যে একবারও কাতরায়নি এটা খেয়াল করে সকলে মনে মনে তার সহ্যশক্তির প্রশংসা করে।

হাড় বোধ হয় ভাঙেনি।

বোধ হয় ভাঙেনি? জীবন প্রায় ধমকে ওঠে, বোধ হয় কি রকম? ঠিক করে বল!

পায়ের গোড়ালি থেকে টর্চের আলোটা একবার তার মুখে ফেলে ধীর গলায় নন্দ বলে, গেঁয়ো ডাক্তার, এর বেশী তো বলতে পারব না। বড় হাড় ভাঙেনি, এইটুকু জোর করে বলতে পারি। ছোট হাড় ভেঙেছে কি না এক্স-রে না করে স্পেশালিস্টও বলতে পারবে মনে হয় না।

জীবন লজ্জিত হয়ে বলে, কিছু মনে করো না বাবা, তুমি আমার ছেলের মত। মন মেজাজ ঠিক থাকে না আজকাল। বড় ছেলেটা মারা গেল, ক-বছর কি দিয়ে কি করি, কোন্ দিক সামলাই—

জীবন একটা নিশ্বাস ফেলে। সকলে চুপ করে শোনে।

বুড়ো বয়সে কত সয় বল? দেশের ঘর আর জমিটুকু জগদীশ কিনে নেবে লিখল—তা লিখল একেবারে শেষমুহূর্তে। কালকেই নাকি কোথায় চলে যাবে। বিবেচনাটা ছাখো একবার! কেন রে বাবা, দু-দিন আগে জানাতে তোর হয়েছিল কি? রাতের বেলা এসে নইলে আমার এ দশা হয়!

জগদীশের বাবা জীবনের বিশেষ অনুগত বন্ধু ছিল। সেই কথা উল্লেখ করে জীবন আবার বলে, বুঝেছ, তামাসা জুড়েছে সবাই। ইংরেজকে তাড়িয়েছি, আর খাতির কিসের?

মমতা ও সহানুভূতির একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল সকলের সঙ্গে, মানবতার সেতু তৈরি হচ্ছিল আপন পরের ব্যবধানে, সবার প্রাণের তিক্ত বেদনার স্থানটিতে ঘা লাগায় সেটা আবার ভেঙে যায়।

গজেন বলে, আপনারাই তবে তাড়িয়েছেন ইংরাজকে ?

সাধে কি বলি ! সাধে কি বলি ! উত্তেজিত হয়ে উঠতে উঠতে জীবন ঝিমিয়ে যায়। তার কথাই বোঝে না এরা, এদের যে কি বলবে। দাওয়া আর দাওয়ার বাইরে আরও লোক বেড়েছে। এ পাড়ার লোক আগেই এসে গিয়েছিল, ব্যাপার শুনে কৌতূহলের বশে আশেপাশের গাঁ থেকে আরও অনেকে এসে গিয়েছে।

সামান্য ঘটনা। জগৎ ও জীবনের এতটুকু এদিক ওদিক হবে না এ ঘটনার ফলে। কাল সকাল বেলাই একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে জীবনকে বারতলা পৌঁছে দিয়ে আসবার। সেইখানে ইতি হবে এ ব্যাপারের। তবু কী আগ্রহ এতগুলি লোকের ঘটনাটা প্রত্যক্ষ করার, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা শোনার।

কিন্তু উৎসুক প্রাণগুলির স্পর্শ পায় না জীবন, সঞ্জীবনী প্রেরণা জাগে না। গজেনের কথার আঘাতেই সে মুষড়ে গেছে। নিজের নালিশ আর জ্বালায় একেবারেই সে ভুলে গেছে প্রাণ দিয়ে প্রাণের সঙ্গে কারবার, শুকিয়ে ছিঁড়ে গেছে প্রাণের সঙ্গে যোগাযোগের নাড়িটা।

একথা ঠিক যে মানুষ হিসাবে তার জন্য সকলের এ আগ্রহ নয়। ঘটনা-চক্রে অতীতের একটি জীবন্ত-প্রতীক, মানুষের রূপ ধরা একখণ্ড ইতিহাস এসে পড়েছে গাঁয়ে, একেবারে তাদের কুঁড়ে ঘরের দাওয়ায়, মানবিক নিদর্শনের মধ্যে সেই অতীত ইতিহাসটুকু দেখাশোনা জানাবোঝার আগ্রহ সকলের।

তবু, নন্দ ভাবে, সেই ইতিহাসের একজন রচনাকারী হিসাবে তাজা হয়ে উঠতে তো বাধা ছিল না জীবনের! এমনি পরিবেশে এসে পড়ে কিছুক্ষণের জন্যও কি আদর্শের জন্য নিজের জীবনের ত্যাগ আর দুঃখ স্বীকারকে ইতিহাস বলে গণ্য করতে পারে না মানুষ ? ইতিহাসও তো মানুষকে হাসায় কাঁদায়, উদ্দীপনা দেয়, পথ দেখায়।

তার নির্দেশে চুন হলুদটাই লাগানো হয় জীবনের পায়ে। সে বলে, ঘুমের একটা ওষুধ দিচ্ছি, শোবার আগে খাবেন।

কাল সকালের মধ্যে আমার পৌঁছানো চাই বাবা।

গজেন বলে, বনমালীর গাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া যাবে।

ঘরের মধ্যে সেকেলে আমকাঠের ভারী চৌকিতে ময়লা কাঁথা বালিস সরিয়ে অতিথির জন্য বিছানা পাতা হচ্ছে। সাঁতরাদের ছেলের বিয়ে হয়েছে অল্পদিন আগে, তার বিয়ের নতুন তোষক বালিশ আর ফর্সা চাদর আনা হয়েছে। যাতনাকাতর মানুষটাকে সাঁতরাদের বাড়ি সরানোর চেয়ে তোষক বালিশ নিয়ে এসে এখানে শোয়ার ব্যবস্থা করাই ভালো মনে করেছে সবাই।

একটা কথা শোন।

নন্দকে কাছে ডেকে তার কানে কানে জীবন বলে, গরুর গাড়িতে তোমার ওখানে গেলে হত না? এদের রকমসকম কি রকম যেন লাগছে। রাতে যদি—

নন্দ বলে, আপনি পাগল হয়েছেন? দেশের মানুষকে ভুলে গেছেন? গাঁয়ের অতিথি বলে ঘরে তুলেছে, আপনার জন্য আজ বরং এরা প্রাণ দেবে। কী আশ্চর্য, এমন কথাও মনে আসে আপনার!

গজেন কোথায় উঠে গিয়েছিল। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে তাকে আসতে দেখা যায়। কাছে এসে উৎসাহে বলে, মাছ পড়েছে একটা, নিতাই জেলেটা কাজের মানুষ। তবু মাছ ভাত দিতে হত শুধু, ভাগ্যে রসিক খুড়োর গাইটা দোয়া হয়নি বিকেলে।

সকলে খুশী হয়, স্বস্তি বোধ করে। রসিক বলে, চুক্ চুক্, কপাল রে!

তার মানে হল, গাঁয়ের কপালকে নিন্দা করে আপসোস জানানো।

মানেটা বোঝে সকলেই। হাড়ে হাড়ে বোঝে। গাঁয়ের পুকুর থেকে জেলে একটা মাছ ধরতে পেরেছে, এটা হল বিশেষ আনন্দ সংবাদ! ঘটনাচক্রে একটা গরু দোয়া হয়নি বলে গাঁয়ের অতিথির জন্য একটু দুধের ব্যবস্থা হয়েছে, এটা হল সৌভাগ্য! এদিকটা কি খেয়াল করেছে জীবন? না করুক, তাকে মাছ

দুধ খাওয়াতে ওই গজেনেরও উৎসাহ দেখে পরম নিরাপদে দেবাযত্ন আদর আপ্যায়ন পেয়ে রাতটা কাটাবার আশ্বাস তো অন্তত পেয়েছে জীবন ?

কিন্তু নন্দকে যাওয়ার আয়োজন করতে দেখে এখনও সে ভীরু অসহায় চোখে চারিদিকে তাকায়। পাশ করা ডাক্তার না হোক একমাত্র ভদ্রবেশধারী নন্দই তার ভরসা। চারিদিকে ঘিরে আছে রুক্ষকেশ মলিনবেশ দীনতা দারিদ্র্যের সব জীবন্ত প্রতিমূর্তি, শীতের রাতে কারো গায়ে একটি সুতির চাদর, কারো শুধু কোঁচার খুট, কারো ছেঁড়া চট। পিছন দিকের মানুষগুলিকে আবছা আলোয় দেখাচ্ছে কালো কালো ছায়ার মত। নীচু গলায় নিজেদের মধ্যে তারা কথা বলাবলি করছে—কে জানে কি কথা, কিসের পরামর্শ।

চললে নাকি নন্দ ? কাতরভাবে জীবন জিজ্ঞাসা করে।

হ্যাঁ যাই, রাত হল।

গজেনের মেয়ে লক্ষ্মী বলে, ভিড়টা ভাগিয়ে দিয়ে যান। বাবারে বাবা, গাঁয়ে একটা লোকের পা দেবার যো নেই, জোঁকের মত ছেঁকে ধরবে সবাই !

তার হাতে মুখে তুলো আর ধুলো লেগেছে। জীবনের জন্য সাঁতরাদের ছেলের নতুন বিয়ের শয্যাটি পাতার জন্য পুরানো কাঁথা বালিশ সরাতে গিয়ে এটা ঘটেছে। একটা বালিশ আগে থেকেই ফেঁসে ছিল।

একজন বলে, সং সেজেছ কেন গো লক্ষ্মী মাসী ?

ঢং করতে, আবার কেন ? এবার যাও না যে যার নিজের ঘর ?

কেউ জবাব দেয় না। বিদায় নিতে সমবেত মানুষগুলির অনিচ্ছা সেই নীরবতায় স্পষ্ট হয়ে থাকে।

কৈলাস হাত বাড়িয়ে ছেঁড়া কাগজের একটা মোড়ক লক্ষ্মীকে এগিয়ে দেয়। তোমার তামুক পাতা ধর।

এনেছ ? সত্যি ?

মোড়কটা একরকম ছিনিয়ে নিয়ে লক্ষ্মী এক টুকরো তামাকপাতা ছিঁড়ে মুখে দিয়ে বারকয়েক চিবিয়ে নেয়।

মাথা নেড়ে বলে, তেমন সুবিধে নয়। তবু যে এনেছ আমার ভাগ্যি !

কৈলাস শহরে কাজ করে, প্রতি সপ্তাহে বাড়ি আসে। লক্ষ্মীকে ভালো দোক্তাপাতা এনে দেবার দায়িত্বটা তাকে স্থায়ীভাবে দেওয়া আছে। সেও খুশী হয়ে দায়িত্ব পালন করে। এ সপ্তাহে অসুখ হয়ে বাড়িতে আটকে যাওয়ায় লক্ষ্মীর তামাকপাতা শহর থেকে সময়মত আনা হয়নি।

কৈলাস বলে, সে জিনিস এদিকে কোথা পাব ?

একটু তামাকপাতা এনে দেয়, তাতেই দেমাক কত ?

মুখে পিক জমেছে, ঠোঁট বেঁকিয়ে চেপে চেপে লক্ষ্মীকে কথা কইতে হয়। জীবন তীব্র দৃষ্টিতে তাকে লক্ষ্য করে, যেন ভস্ম করে ফেলবে।

অসন্তোষ চাপতে না পেরে বলে বসে, মেয়েদের নেশা করা উচিত নয় !

মুখে আঁচল চাপা দিয়ে লক্ষ্মী ঘরের মধ্যে গিয়ে জানালার ফাঁকে পিক ফেলে আসে। নিজের মনে বলে, একটা পান পর্যন্ত দিলে না কেউ। পান দেওয়া বন্ধ করাও আইন হয়েছে না কি রে বাবা !

অল্পবয়সী সেই বৌটি একগাল হেসে চুনসুপারিখয়ের দিয়ে একটা বোঁটাশুদ্ধ আস্ত পান তাকে এনে দেয়, তেমনি মৃদু কিন্তু দৃঢ়স্বরে বলে, লক্ষ্মীদি আর সব পারে, শুধু পানটি নিজে নিয়ে খেতে পারে না !

কেন খাব ? পান কি নিয়ে খাবার জিনিস ?

নিজের ঘরেও নয় ?

এতটুকু গেঁয়ো বৌ, বয়সে কিশোরী, তার পাকা কথা দৃঢ় আচরণ জীবনকে আশ্চর্য করে দেয়। সেটা লক্ষ্য করে রসিক পরিচয় দিয়ে বলে, এটি আমাদের লোচনের ছোট ছেলের বৌ। এ ঘরটা আজ্ঞা লোচনের। পাঁচ-ছ মাস হল ছেলেটির কোন খোঁজখবর নেই।

বৌটি প্রতিমার মত দাঁড়িয়ে শোনে।

জীবন বলে, পালিয়ে গেছে ?

লোচন আগাগোড়াই কথা বলছিল কম, এবার সে নিশ্বাস ফেলে বলে, সেটার কথা বাদ দেন। নিজেরও মাথা খারাপ হল, বৌটার মাথাও বিগড়ে দিয়ে গেল।

বৌটি লক্ষ্মীর কানে কানে কি যেন বলে। লক্ষ্মী মাথা নেড়ে সায় দিয়ে জীবনকে বলে, পালাবে কেন, মাথা খারাপ হবে কেন, সে পয়সা কামাতে গেছে। রোজগার করতে না পারলে ঘরেও ফিরবে না, খবরও দেবে না। সবাই কি জগতে এক রকম হয়? তুই রসুইঘরে যা গাঁদা।

গাঁদা মুখ তুলে বলে, কেন? আমি চোর নাকি?

যাবার জন্য সাইকেল ধরে তৈরি হয়ে দাঁড়িয়েও নন্দ ইতস্তত করছিল। গেঁয়ো রাত বলেই, নইলে রাত আর সত্যি সত্যি এমন কি বেশী হয়েছে। আরও কিছুক্ষণ সকলে যদি এখানে ভিড় করতে চায় নবাগত মানুষটাকে ঘিরে, তাদের নিশ্চয় সে অধিকার আছে। লক্ষ্মী স্পষ্ট ভাষায় ভিড় ভাঙার কথা বললেও কেউ উঠে যায়নি। সকলে আরও কিছুক্ষণ বসতে চায় তাতে সন্দেহ নেই।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত লাভ কিছু হবে কি?

তাই সোজাসুজি সকলকে যাবার কথা না বলে সাইকেলের ঘণ্টাটা একবার বাজিয়ে দিয়ে সে গলা চড়িয়ে বলে, আমরা আর কেন তবে রাত বাড়াই?

একজন বলে, কথাবার্তা হল না কিছু, মোদের আশা মিটল না।

আরেকজন বলে, তাই বটে তো। কি শুনলাম? মোটে কিছু নয়। কত আশা করে এলাম—

কি সে আশা? ভাষায় তার প্রকাশ কি?

রুগ্ন নয় অথচ পাঁকাটির মত রোগা নারান বলে, ব্যাপার-ট্যাপার হালচাল যদি খানিক বুঝিয়ে দিতেন—

খবরের কাঙালী বনেছ তোমরা নারান খুড়ো। সেই যে হাপিত্যেশে ছেঁকে ধরেছ, আর রেহাই নেই।

জীবনকে হঠাৎ যেন একটু উৎসাহিত মনে হয়। সে অমায়িকভাবে বলে, শুনতে চায় ভালোই। সকালে বারতলার কাজটা সারি, পা-টা সারুক, একদিন বরং একটা সভা ডেকে—

সেই ভালো! সেই ভালো! একদিন মস্ত মিটিং হবে সবাই বক্তৃতা শুনো!

লক্ষীর উচ্ছ্বসিত হাসিই ফেটে পড়ে আগে, তাই মনে হয় সেই বুঝি হাসির তরঙ্গ তুলে দিয়েছে। জীবন গুম খেয়ে ধীরে ধীরে চিবুকে হাত বুলায়। টর্চ জ্বালিয়ে নন্দ আধমরা ডোবাটার পাশ দিয়ে একটা ঝোপের আড়ালে সাইকেল সমেত অদৃশ্য হয়ে যায়। উপস্থিত মেয়েপুরুষও এবার গা তোলে, দেখতে দেখতে দাওয়া আর অঙ্গন প্রায় শূন্য হয়ে যায়। আজ যে ঘরোয়াভাবে ভালো-মন্দ কিছু বলবে না, পরে একদিন মিটিং ডেকে ভালো করে সব বুঝিয়ে দেবে—একথা জানিয়ে জীবন যেন একবাক্যে বিদায় করেই দিয়েছে মানুষগুলিকে!

তারা আজ দেশবিদেশের খবরাখবরের কাঙালীই বটে কিন্তু নগদ বিদায়ের কাঙালী। একদিন কাঙালীভোজন হতে পারে এটুকু পাবার আশায় তারা আর ধন্না দিতে রাজী নয়। যেদিন ভোজ দেবে সেদিন খবর জানিও, দেখা যাবে। আজ পাত-কুড়োনো ফেলনা যা দিতে তাই খুশী হয়ে নিতাম, দেবার যখন গরজ নেই তোমার, আমারও পাবার গরজ নেই!

লক্ষ্মী উবু হয়ে বসে মুখে হাত চাপা দিয়ে হাই তুলে জীবনকে বলে, কিছু মনে করবেন না যেন। সাদাসিদে গেঁয়ো মানুষ সব—

লক্ষ্মীই যেন সবার আগে হাসিতে ফেটে পড়ে নি!

কৈলাস মুচকে হাসে। কিছুদিন ঘটনাচক্রে কলকাতা শহরে কাটিয়ে লক্ষ্মী মস্ত শহুরে হয়ে গেছে!

জীবন মাথা হেঁট করে ছিল, ধীরে ধীরে মাথা তুলে বলে, কিসের জোরে রাগ করব মা? আমার সব গুলিয়ে গেছে। এরা মিটিং চায় না কেন?

কে বললে চায় না? কালকেই তো মস্ত মিটিং ইস্টিশানের ডাঙা মাঠে—সবাই ভিড় করে যাবে। তবে শুধু মিটিঙে কি পেট ভরে? মুখোমুখি সোজাসুজি কথাও শুনতে চায়। দেখুন না কেন, আজকে বললে আপনি যেমন করে যেসব কথা কইতেন, মিটিঙে কি আর সেভাবে কইবেন?

বক্তৃতা শুনতে চায় না?

কৈলাস বলে, কেন চাইবে না, আরও বেশী শুনতে চায়। শুধু ছাঁকা বক্তৃতা শুনতে চায় না। শুধু মিটিঙে বলবেন আর—

রসিক বাধা দিয়ে বলে, হাঁ হাঁ, তার মানেই হল তাই। জীবনবাবুকে তোমার আর ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে না। উটাও মিটিং হয়েছিল—মিটিং আর কাকে বলে? শরীর ভাল নয়, উনি আজ কিছু বলবেন না, বাস ফুরিয়ে গেল।

আধ ঘণ্টার মধ্যে জীবন মোটা চালের গরম ভাত পেট ভরে খায়। পরিবেশন করে লোচনের বড় ছেলে ঘনরামের বৌ দয়া। গাঁদার সাধ ছিল বুড়োকে সে নিজে হাতে খাওয়াবে কিন্তু যতই ধীর স্থির ও ভারিক্কী হোক তার চালচলন, নিতান্ত ছেলেমানুষ, তাকে এ কাজের ভার দেবার সাহস তার জা-শাশুড়ীর হয় না, লক্ষ্মীও নিষেধ করে। সে টের পেয়েছে, তাকে আর গাঁদাকে জীবনের মোটেই পছন্দ হয় নি।

দয়া আর তারা অবশ্য একই গোয়ালের জীব। তবে দয়া বেশীর ভাগ রসুই ঘরেই ছিল এতক্ষণ, একটা বড় রকম ঘোমটা টেনে সেই ভাত দিল মানুষটাকে।

খিদে পেয়েছিল, কিন্তু বেশী খেতে পারে না জীবন। খিদে পায়, খাওয়ার শক্তি নেই। শরীর পুষ্টি চায় কিন্তু প্রয়োজনীয় খাদ্য হয়ে দাঁড়াবে পেটের পক্ষে অসহ বোঝা। দুধটুকু সবটা চুমুক দিতে সে কতবার যে ইতস্তত করে!

খেয়ে উঠেই ঘুমে আর শ্রান্তিতে অবসন্ন হয়ে আসে দেহ, পায়ের যন্ত্রণা ঘা মেরে তাকে সচেতন করে রাখে। খানিক পরেই সে নন্দ ডাক্তারের যন্ত্রণানাশক ঘুমের ওষুধটা খেয়ে শুতে যায়। এবং সত্যসত্যই ওষুধটা মিনিট দশেকের মধ্যে তার বোধশক্তিকে ভোঁতা করে তাকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়।

লক্ষ্মী অন্য কথা তোলে। তার মুখে শহরের গল্প শুনতে মেয়েরা বড় ভালবাসে। মেয়েরা সাগ্রহে শোনে, নানা প্রশ্ন করে—আবার তার মুখের শোনা কথা নিয়ে আড়ালে তার নিন্দাও করে, বলে, সোয়ামী নেয় না, এসব ধিঙ্গিপনাতেই তো তোর মজা!

তবে দেশের জন্যে তাদের দশজনের জন্যে গজেনের ঠ্যাং খোঁড়া হওয়া

ছাড়াও অনেক কিছু গেছে কিনা, ওই কাজে নেমে লক্ষ্মীরও পুলিসের হাতে লাঞ্ছনা জুটেছে কিনা, নিন্দাটা তেমন জমাট বাঁধে না।

রান্নাঘরের ডিবরিটা তেলের অভাবে দপ্ দপ্ করে উঠলে লক্ষ্মী গা তোলে, বলে, নাঃ, এবার পালাই!

গাঁদা তার সঙ্গে বাইরের দাওয়া পর্যন্ত আসে। লোচন আর ঘনরাম দাওয়ার পাশের ঘেরা জায়গাটুকুতে আগাগোড়া চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। কেউ কোথাও জেগে নেই।

কি করে যাবে লক্ষ্মীদি? ভয় পাও যদি? তোমায় যদি কিছু করে একলা পেয়ে?

এতক্ষণের গাঁদাকে যেন চেনা যায় না। সবজান্তা ভারিক্কী নারীর পালা শেষ করে ছুটি পেয়ে সে যেন ছেলেমানুষটির মতই কাতর হতে পেরেছে বাড়ি ফেরার পথে লক্ষ্মীকে পাছে ভূতে ধরে এই ভাবনায়।

ভয় দেখাসনে, থাবড়া খাবি। এইটুকু তো পথ। দম নিয়ে ছুট দেব, ঘরে গিয়ে দম ছাড়ব।

আমি সাথে যাই?

প্রস্তাব করে গাঁদা নিজেই মাথা নাড়ে, আমাকে আবার কে পৌছে দেবে? তোমার সাথে শোব-খন, অ্যাঁ? একলাটি ভালো লাগে না। রাতের বেলা মনটা এমন করে!

লক্ষ্মী তার মাথাটা দু-হাতে বুকে চেপে ধরে। বলে, শাশুড়ির কাছে শুবি তো।

ও তো বুড়ী!

তোর এখন বুড়ীই ভালো। ছোঁড়াটা ফিরে শুনবে তো তার নিজের মা রোজ রাতে তোকে বুকে আগলে রেখেছে? রাতে কি তোর বাইরে যেতে আছে রে ছুঁড়ি!

লক্ষ্মী তার মাথার চুল ঘেঁটে আদর করতে করতে আবার বলে, এই ফাগুন চোতে যদি না ফেরে মোর নাককান কেটে নিস্।

কি করে জানলে ?

ওসব আমি জানি। তোর জন্যে পয়সা কামাতে গেছে তো ? পয়সা কামাক না কামাক, দম ফেলতে আসতেই হবে। এসে ফের চলে যাক, আসতে হবেই একবারটি।

একবারটি এলে হয়। সবার কাছে মোকে দোষী করে রেখে গেছে !

বাত্তা চেঁছে রাখ, এলেই ক-ঘা লাগিয়ে দিস।

না সত্যি, মোর কি দোষ বল ? একটা মাকড়ি নিয়ে বেচে দিলে। ভাবলাম, কেমন মানুষরে বাবা, নতুন বোয়ের মাকড়ি বেচে দেয় ! দু-দিন বাদে ফের চাইলে আরেকটা দাও।—

বলেছিস তো অনেক বার, কত শুনব ?

আরেকবার শুনলে কি হয় ? দু-দণ্ড শুনতে গায়ে জ্বর আসে তোমার ? সাদাসিদে কাহিনী। মহিম আবার মাকড়ি চাইলে গাঁদা গিয়ে শাশুড়ীকে জানিয়ে দিয়েছিল, তোমার ছেলে ফের মাকড়ি বেচতে চায় গো। তাতে প্রাণে আঘাত লাগে মহিমের। হাতে পয়সা নেই বলেই তো তার এই অপমান— পয়সা রোজগার করতে না পারলে সে বাড়িও ফিরবে না, বোয়ের মুখ দেখবে না। শেষ রাতে উঠে সে এক কাপড়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। কি জন্যে মাকড়ি বেচবে আগে সেকথা কিছুই জানায় নি গাঁদাকে, এটাই তার সবচেয়ে বড় আপসোস। বলেছে পরে, গুরুজনের ধমক খেয়ে ঘরে গিয়ে ঝগড়া করার সময়। ভাগচাষের জোরালো আন্দোলন চলছিল, তারই ফাণ্ডে কার বৌ তাগা দিয়েছে, কার বৌ চুড়ি দিয়েছে, গাঁদাকেও মাকড়ি দিতে হবে। সে কথাটা বললে তো হয় ? মাকড়ি নিয়ে তুমি নেশা করবে না ফাণ্ডে দেবে, গাঁদা জানবে কি করে ?

তুই ঠিক করেছিস্। এবার ঘরে যা।

তাকে ঘরের দিকে ঠেলে দিয়ে লক্ষ্মী দাওয়া থেকে নেমে যায়। এবারকার যুদ্ধের আগে উন্মাদিনী ছাড়া গাঁয়ের সবচেয়ে দুঃসাহসী মেয়েও এত রাত্রে একলা এভাবে ঘরের বাইরে এক মিনিটের পথও পাড়ি দিতে সাহস পেত না। ভয়

হোক আর সাহস হোক চেতনার অনুপাতে ছাড়া তো হতে পারে না। যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ সৈন্য পুলিস দাঙ্গা-হাঙ্গামা ধানের লড়াই একেবারে ওলটপালট করে দিয়ে গেছে চেতনা। আঁতে ঘা খেয়ে খেয়ে সাফ আর শক্ত হয়েছে মাথাগুলি। প্রচণ্ড ঘটনার আধুনিক ট্র্যাক্‌টর চষে দিয়ে গেছে অনুভূতির ক্ষেত, এখনো দিয়ে চলেছে। নিজের সঙ্গে নিজের তুলনা করা যায়, আশ্চর্য হওয়া যায়। মনে হয় না আমি একজন তুচ্ছ চাষীর মেয়ে, কুটার মত শুধু ভেসেছি ঘটনার বন্যায়, কোথায় ছিলাম কি ছিলাম একটা নিরিখ পেয়েছি, নিজেকে খানিক যাচাই করতে পারি!

লক্ষ্মীর গা ছমছম করে, গাঢ় কুয়াশার আবরণে ছোট বড় কোন কোন গাছটাকে সেই চিরকেলে ভয়াবহ মূর্তি মনে হয়ে, বুকটা ধড়াস করে ওঠে, মন তার আপন মনে রামনাম জপ করে। কিন্তু তাতে কি আসে যায়, ভয় তো সে পায়নি। অশরীরী জীবের ভয় তাকে আটকে রাখতে পারেনি লোচনের দাওয়ায়, সাথী ছাড়া এইটুকু পথ পার হওয়া তার পক্ষে অসাধ্য করেনি। লক্ষ্মী জানে, ভূত-প্রেত যদি থাকেও মানুষের তারা ক্ষতি করে না। ওটা শরীরী মানুষেরই একচেটিয়া কারবার। কুয়াশা ভেদ করে একটা ভূত বা প্রেত বা পেত্নী যদি নেহাত এখন তার সামনে এসে দাঁড়ায়, অভ্যাসবশে হয়তো সে মূর্ছা যাবে,—ভয় পেয়ে নয়। আজও ভয় করে, অনেক রকম ভয়, কিন্তু কোন ভয় আর তাকে কাবু করতে পারে না একেবারে।

ভূত নয়, তার সামনে দাঁড়ায় কৈলাস। তার জন্যই কৈলাস অপেক্ষা করছিল। পাছে সে ভয় পায় এজন্য স্পষ্ট গলায় বলতে বলতে সে সামনে আসে: আমি কৈলাস গো, কৈলাস। ডরিও না, আমি কৈলাস! মাদুলি দেখাব, সেই কুন্দু ঠাকুরের মাদুলি, ডরিও না!

মন্ত্রপূত মাদুলি দেখিয়ে কৈলাস প্রমাণ করবে সে রক্তমাংসেরই কৈলাস। মহাশূন্যের অধিবাসীরা মানুষের সামনে আসতে হলে অনেক সময় চেনা লোকের রূপ ধরে আসে। আর সবই তারা নকল করতে পারে, শুধু মাদুলি-কবচ

এগুলি বাদ যায়। তাকে দেখে লক্ষ্মী পাছে চিৎকার করে ওঠে বা মূর্ছা যায় এই ভয়টাই কৈলাসকে ব্যাকুল করেছিল।

কী কাণ্ড যে তুমি কর!

দুটো কথা কইব বই তো নয়।

দুটো কথা কইতে তখন থেকে ঘুপচি মেরে রয়েছ? একলাটি আসব জানলে কি করে? কেউ যদি পৌঁছে দিতে আসত?

ঘুপচি মেরে রইতাম।

ষষ্ঠীতলা এখন দেখা যায় না। অনেক দিনের ষষ্ঠীতলা। বটতলায় কয়েকটা ইটপাথর, হাতখানেক উঁচু মাটির বেদী। দিন হলে দেখা যেত, দুটি সাজানো মাটির প্রতিমা দু-রকম ভঙ্গিতে ভেঙে পড়ে আছে, তাদের বাহন গাধা দুটিরও একই অবস্থা। সাধারণ পাথরের ছোট একটি মূর্তি ছিল, তারও একটি হাত এবং একটি পায়ের পাতা ছিল না। কবে কোন্ পুকুর খুঁড়তে পাওয়া গিয়েছিল মূর্তিটি, কেউ খেয়াল রাখেনি, যদিও কুন্দু ঠাকুর সাঁতরাদের পুকুরটা খোঁড়ার সময় স্বপ্নাদেশ পাওয়া থেকে শুরু করে গোপনে মূর্তিটি সংগ্রহ করে মাটিতে চুপি চুপি পুঁতে রাখা পর্যন্ত অনেক চেষ্টা ও কষ্ট করেছিল ঘটনাকে সবার স্মৃতিতে চিরস্থায়ী করে গেঁথে দেবার জন্য। প্রায় এক বছর ধরে নিয়মিত স্বপ্নাদেশ ও প্রচার এবং পুণ্য তিথিতে পুকুর খুঁড়ে মূর্তি পাওয়া—অনেক হৈ চৈ আশা করেছিল কুন্দু ঠাকুর। কিন্তু বিশেষ সাড়া মেলেনি। বরং বহু দূরের গান্ধীজির অনশনের সমর্থনে সেও যখন এই গ্রামে এগার দিন একটানা উপোস করেছিল, প্রচারের চেষ্টা না করলেও মুখে মুখে প্রচার হয়েছিল অনেক বেশী, দলে দলে মেয়ে-পুরুষ তাকে দর্শন করতে এসেছিল। সে ঘটনা যদি বা কারো কারো স্মরণ থাকে, মূর্তি পাওয়ার ঘটনা দিন দিন বেশী অলৌকিকত্ব পাওয়ার বদলে একবারে মন থেকে মুছে গেছে মানুষের।

মূর্তিটিও নেই। গড়ানো লেভেল ক্রসিং-এর কাছে যখন সৈন্যদের একটা ছাউনি পড়েছিল, দু'জন বিদেশী অফিসার ভারতীয় অসভ্যতার প্রতীক হিসাবে মূর্তিটি চুরি করে নিয়ে গেছে।

এসেছিল অরক্ত মেয়ের খোঁজে। গরীব চাষীর মেয়ে।

লক্ষ্মী বলে, হেথায় একদণ্ড দাঁড়িয়ে তোমার সাথে কথা কইতে পারব না।

কেন? কে জানছে?

তুমি আমি জানছি। চোর যে চুরি করে, কে জানতে যায়?

চুরি কি রকম? একটা স্থযোগ পেলাম তুমি আমি—

আ মরি, কী স্থযোগ! এ স্থযোগ ঘটবে বলে তুমি হা-পিত্যেশ করে বসেছিলে? মোরা চাইলে এমন স্থযোগ যেদিন খুশি হয়, রাতের বেলা চুপি চুপি বেরিয়ে এলেই হল।

সে তো তুমি আসবে না!

তাই তো একে চুরি বলছি। চোর খেটে খাবে না, স্থযোগ পেলে চুরি করবে। তোমার মতলব বুঝিনে আমি? রাত ত্বপুরে এমনিভাবে বাগিয়ে ধরবে, মোর মাথাটাও বিগড়ে যাবে, নরম হয়ে নেতিয়ে যাব। যাই বলি আর যাই করি, মেয়েমানুষ তো!

আমি তা ভাবিনি, মোটে নয়!

কি জানি।

খানিক গুম খেয়ে থেকে কৈলাস বলে, সত্যি ওসব ভাবিনি লক্ষ্মী।

তুমি কথা কইছিলে হাসছিলে, তোমায় দেখতে দেখতে এখন রাগ ধরে গেল আজ—

আমার ওপর রাগ?

না, এমনি। কেন, আমরা মানুষ নই? আমাদের সাধ-আহ্লাদ নেই? আমি ভেসে এসেছি না তুমি ভেসে এসেছ? আমি মন ঠিক করে ফেলেছি। পাপ হোক যাই হোক—

কৈলাস তার হাত চেপে ধরে।

লক্ষ্মী কাতরভাবে বলে, পাপের কথা নয় গো। পাপ হলে নয় নরকে যাব। আসলে তুমি আমি তেমন লোক নই, মোদের এসব পোষাবে না।

কৈলাস রাগতভাবে বলে, কেন? সোয়ামী আছে বলে? সাত বছর খোঁজ

নেয় না; দিব্যি আরেকজনের সঙ্গে ঘর করছে, তোমার অত সতীপনা কেন ?

সতীপনা চুলোয় যাক।

তবে কেন দগ্ধে মারছ ?

প্রাণ থেকে সায় দেয় না,আমি কি করব বল ?

কৈলাসের মুখ দেখা যায় না। অতি মৃদুস্বরে লক্ষ্মী বলে, সেই ধরলে তো হাত ? মাথাটা গুলিয়ে দিতে চাও ?

কৈলাস হাত ছেড়ে দিয়ে বলে, আমায় নিয়ে খেলা করছ, টের পেলাম আজ।

এতকাল পরে টের পেলে ? এদিকে তো বেশ চালাক চতুর ! আমার বেলাই কেবল গোসা করতে জানো। এটুকু বোঝো না, সবাই মোদের ঘেন্না করবে, টিটকারি দেবে ? জানুক না জানুক, সবাই যেজন্য ঘেন্না করবে আমি তা লুকিয়েও করতে পারব না।

লক্ষ্মী এবার নিজে হাত বাড়িয়ে কৈলাসের হাত ধরে, বলে, এই খ্যাখো খেলা করছি।

বলে, সত্যি বলব তোমায় ? নিজেকে আমার বড় ভয়। পুলিসের হাতে জাত গেছে, তাতে আমার বুক জলে কিন্তু দশজনের সাথে বুক ফুলিয়ে মিলিমিশি, মাথা উঁচু রেখে কথা কই। মোরা নয় লুকিয়ে পিরীত করলাম, কেউ জানল না। কিন্তু আমি ঠিক জানি আমি নিজে নিজেই সবার কাছে চোর বনে থাকব।

কৈলাস বলে, তোমার বড় খুঁতখুঁতনি।

কি করব বল ? যেটা আছে সেটা নেই ভাবব কি করে ? যদি পার খুঁতখুঁতনি সারিয়ে দাও—কথাটি কইব না। নয়তো অন্য কোন উপায় কর যাতে তোমার কাছে রাত কাটিয়ে বুক ফুলিয়ে সবার সামনে হাঁটতে পারি।

গোকুল শালা বেঁচে থাকতে কোন উপায় নেই।

লক্ষ্মী তার গলা জড়িয়ে কাঁধে মাথা রেখে বলে, তবে আজ লক্ষ্মী ছেলের মত ঘরে যাও। তোমার ওই গোকুল শালাকে মেরে ফেলে উপায় করতে চাও, আমার কোন আপত্তি নেই। আমায় শুধু জানতে দিও না তুমি খুন করেছ।

লক্ষ্মী চোখ বুজে ছিল, সে টের পায় না। কৈলাস হঠাৎ বলে, চট করে ঘরে যাও। পুলিস গাঁ ঘেরাও করছে।

লক্ষ্মী সঙ্গে সঙ্গে নিঃশব্দে ঘরের দিকে জোরে জোরে পা চালায়।

কৈলাসও আর এক মুহূর্ত দাঁড়ায় না। চোখের পলকেই সে যেন গাছপালার সঙ্গে মিশে যায়। ষষ্ঠীতলার বটগাছটার ডালে একটা রাত্রিচর পাখি কর্কশ আওয়াজ তোলে। দূর থেকে শোনা যায় কুকুরের ডাক।

ভোর ভোর বনমালীর গোরুর গাড়িতে জীবনের বারতলা রওনা দেওয়ার কথা; সে কিন্তু রওনা হল মাঝরাত্রেই, মোটরগাড়ি চেপে!

জীবনকে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সমস্ত পাড়াগাঁটা নিজেও ঘুমিয়ে পড়ে। এত বেশী খাটে সকলে আর এত কম খায় যে ঘুমের টনিক ছাড়া বাঁচাই অসম্ভব তাদের। ঘুমের জন্য তপস্যা করতে হয় না, চাটাই-মাটাই যাতে হোক গা এলিয়ে ছেঁড়া বালিশ বা ন্যাকড়া-জড়ানো খড়ের পুঁটুলিতে মাথা রাখলেই ঘুম যেন মশার ঝাঁকের আগেই এসে যায়। কিন্তু নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোবার কি যো আছে গাঁয়ের লোকের, পা মচকে স্বদেশী-সাধনায় কোন সাধক গাঁয়ে আশ্রয় নিলে! আধ ঘণ্টা বাদে বারতলা থেকে গাড়ি-বোঝাই পুলিস এলে, পনের মিনিট বাদে তাদের সঙ্গে জগদীশের গাড়িতে জীবন বারতলায় রওনা দিলে প্লট ঘোরালো হবে কি না জানি না তবে সেটা বিচ্ছিন্ন বা খাপছাড়া ঘটনা হবে না নিশ্চয়। জীবনের পা মচকে এ গাঁয়ে আশ্রয় নেওয়ারই সেটা জের, নইলে গাড়ি-বোঝাই পুলিস নিয়ে জগদীশের ছুটে আসা প্রয়োজন হত না।

দাওয়ায় মাথা থেকে পা ঢাকা মশারি শীতের আবরণ চাদর খুলে উঠে বসে একেবারে টর্চের আলোর মুখোমুখি লোচন ও ঘনরামের ঘুম ভাঙে। ভালো করে চোখ রগড়ে ঘুম তাড়াবার সুযোগও পায় না।

কে এসেছিলেন এদিকে? কাকে তোমরা গুম করেছ? কোথায় তিনি?

আজ্ঞে এ বাড়িতেই আছেন।

কোথায়?

খাটে শুয়ে ঘুমোচ্ছেন মশারির নীচে।

হৈ চৈ হট্টগোলে জীবন অবশ্য ততক্ষণে জেগে গিয়েছে—গ্রামের লোকেরাও জেগেছে।

মশারির তলা থেকে জীবন বলে, কে? কী ব্যাপার?

তার গলার আওয়াজে দারুণ আতঙ্ক!

জগদীশের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে ব্যাপারটা বুঝে তবে তার বুকের ধড়কড়ানি থামে।

জগদীশ বলে, জীবনবাবু আপনি! আমরা খবর পেলাম—।

জগদীশ একজন বিখ্যাত পদস্থ ব্যক্তির নাম করে। গাঁয়ের লোক নাকি তাকে খুন করার মতলবে গুম করে ফেলেছে, এই খবর গিয়ে পৌঁচেছে বারতলায়।

পুলিস অফিসার ভুবনমোহন বলে, তাই তো ভাবছিলাম, এ কি ব্যাপার! বলা নেই কওয়া নেই, উনি হঠাং এ গাঁয়ে আসবেন কেন?

জগদীশ চটে বলে, সে ব্যাটা গেল কই? বিপিন?

একজন পুলিস আলোয়ান-জড়ানো মাঝবয়সী বেঁটে একটি মানুষকে সামনে ঠেলে দেয়। তার মুখভরা বসন্তের দাগ, কান দুটি মাথার সঙ্গে লেপটেই আছে।

জেনেশুনে খবর দিতে পারিস না শূয়ার? শীতের রাতে মিছিমিছি দৌড় করালি?

বলতে বলতে রাগের মাথায় জগদীশ তার গালে প্রচণ্ড এক চড় বসিয়ে দেয়।

ভুবনমোহন বিপিনকে ঠেলে দিয়ে আড়াল করে দাঁড়ায়, অসন্তোষের সঙ্গে বলে, মেরে বসলেন একেবারে! এরকম ভুলভ্রান্তি হয়। ইনি তো এসেছেন, একটা হৈচৈ তো হয়েছে চারিদিকে—একেবারে বানিয়ে খবর দেয়নি। এ রকম মারধোর করলে কেউ খবরটবর দেবে না আর।

জীবন কাতর কণ্ঠে জগদীশকে বলে, আমি তোমার ওখানেই যাচ্ছিলাম বাবা,

আজ তোমার চিঠি পেলাম। পা-টা মচকে গিয়ে এখানে আটকে গেছি। এরা খুব করেছে আমার জন্যে।

বাইরে খানিক তফাতে লোক জমেছে। যখন তখন যে কোন অবস্থায় চটপট জড়ো হবার শিক্ষাটা ভালভাবেই পেয়েছে গ্রামের মানুষ।

জগদীশ বলে, আপনি এখন কি করবেন ? আমি কাল কলকাতায় যাব। খোকন পরশু দেশে ফিরছে।

ফিবছে ? বেঁচে থাক, সত্যিকারের বিদ্বান হয়েছে ছেলেটি তোমার। কাগজে পড়ছিলাম, অল্প বয়সে বিলেতে অতবড় ডিগ্রি পাওয়া কি সোজা কথা !

ছেলের প্রশংসায় খুশী হয়ে জগদীশ বলে, আপনি কি বাকি রাতটা এখানে ঘুমোবেন ? না আমাদের সঙ্গে যাবেন ?

জীবন ইতস্তত করে বলে, এরা বলছিল ভোর ভোর গোরুর গাড়িতে করে পাঠিয়ে দেবে—

তার চেয়ে আমার মোটরেই চলুন। গিয়ে একেবারে ঘুম দেবেন, সকালে কথাবার্তা হবে ?

তাই যদি বলে জগদীশ তবে তাই সই। গাঁয়ের যারা তার জন্য এত করেছে তাদের ভালো করে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বিদায় নেবার সুযোগ জোটে না বলে জীবনের মনটা সত্যই খচখচ করে। এরা হয়তো ভাববে যে বড়লোক জমিদার এল আর অমনি সে পাততাড়ি গুটিয়ে তাড়াতাড়ি তার মোটরে গিয়ে উঠল। কিন্তু কি করবে, তার উপায় নেই। কাল জমিজায়গার বদলে জগদীশের কাছ থেকে টাকাটা না পেলে সে তলিয়ে যাবে একেবারে।

অল্প অল্প হাওয়া ছেড়েছিল ইতিমধ্যেই কোন এক সময়ে। কনকনে উত্তরে হাওয়া। এই হাওয়া ছেড়ে শীতটা এত জেঁকে না পড়লে জগদীশ হয়তো রাগের মাথায় নিতাই-এর গালে চড়টা বসিয়ে দিত না। সন্ধ্যারাত্রের সেই ঘন গাঢ় কুয়াশা আশ্চর্যজনকভাবে কোথায় উধাও হয়ে গেছে। চারিদিকে মাঝ-আকাশের চাঁদের আলো ছড়ানো। অস্পষ্টতা ঘুচে গিয়ে এখন এদিক ওদিক নজর চলে। জীবন চারিদিকে তাকায়।

গজেন কই ? গজেন ?

খোঁড়া গজেন তফাতে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল, নাম ধরে ডাকাডাকি শুনেও সে এক পা এগোয় না।

জীবন লোচনকে বলে, গজেনকে বোলো আমি আবার আসব। ক-দিন বাদেই আবার আসব।

দুজন পুলিসের কাঁধে ভর দিয়ে জীবন খোঁড়াতে খোঁড়াতে জগদীশের গাড়ির দিকে এগোয়। সারা জীবন ব্রিটিশের পুলিস, তাকে শুধু ধরেছে বেঁধেছে জেলে পুরেছে আর মেরেছে, আজ পঁয়ষট্টি বছর বয়সে সত্যই তবে তার পুলিসের কাঁধে ভর দিয়ে চলার সুযোগ জুটল ! সে ইচ্ছা করলে এদের দুজনের ওপর চোটপাট করতে পারে, গালাগালি দিতে পারে !

ভগবান কি আছেন ? পা মচকানো থেকে, গাঁয়ে আশ্রয় পাওয়া থেকে, ঘন কুয়াশার সঞ্চার থেকে, আকাশবাতাস সাফ করে আবার জ্যোৎস্না ঢালা থেকে সারা জীবন পুলিস-তাড়িত তাকে পুলিসের কাঁধে চড়ে জগদীশের মোটরে ওঠানো পর্যন্ত অঘটন যিনি ঘটাতে পারেন, সেই ভগবান ? যে ভগবানকে বাদ দিয়ে কোন মানে করা যায় না তার একটা রাত্রির জীবনেরও ?

ভগবান কি আছেন ? মচকানো পায়ের ব্যথাটা কি কমিয়ে দিয়েছেন তিনিই ? কিন্তু ওই যে সারিবদ্ধ মানুষ জ্যোৎস্নালোকে নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে তার হয়ে মোটর গাড়িতে চড়া দেখছে, কয়েক দিন পরে ফিরে এসে এদের একটু আয়ত্তে আনার চেষ্টা কি ভগবান সফল করবেন ?

জনতার জোরে ভাগ্য ফিরিয়ে দেবেন ?

২

নবশিল্প মন্দির ভাল না চলায় শুভর বিতৃষ্ণা এসে গিয়েছিল। হঠাৎ সে বিদেশে চলে গিয়েছিল তার বিজ্ঞানের শিক্ষাকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য। শুভ বিদেশ থেকে ফিরছে আরও বড় বৈজ্ঞানিক হয়ে, নতুন ডিগ্রি নিয়ে।

গিয়েছিল জাহাজে চেপে সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে, ফিরেছে আকাশ-পথে প্লেনে। যাওয়ার সময়ের চেয়ে সে এখন নিঃসন্দেহে অনেক বড় বৈজ্ঞানিক।

শুভময় ছেলেবেলায় কবিতা লিখত। সবকিছু জানার একটা জোরালো ঝোঁক ছিল।. বাড়িতে স্নেহ-আদরের যান্ত্রিক সমারোহে আর স্কুলে কিছু না জানতে দিয়ে বিদ্যা দানের ব্যবস্থায় তা ব্যাহত হয়। সেটাই সব কিছু রহস্যময় অজানা সম্পর্কে জানার ব্যাকুলতায় দাঁড়িয়ে গিয়ে কিশোর বয়সে কবিতা হয়ে বেরিয়ে আসত। বিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে তার মাথা খুলে যায়। তরতর করে কলেজে পরীক্ষায় ধাপ বেয়ে উঠেছিল, একটা ডক্টরেট নিয়ে থামত সন্দেহ নেই। সকলে সেই পরামর্শ ই দিয়েছিল। কিন্তু ডক্টরেটের জন্য পা বাড়াতে গিয়ে হঠাং সে কেন থমকে দাঁড়াল কেউ জানে না।

সাধারণ পানা ও কচুরি পানার সবুজ বর্ণসত্তার তারতম্যের জন্য আলোক-রশ্মির বিস্মরণ ও কেন্দ্রীকরণ এবং ম্যালেরিয়াবাহী মশা ও সাধারণ মশার স্নায়ু-তন্ত্রীর উপর ঘুঁটের ধোঁয়ার ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার সামঞ্জস্যের সাহায্যে কি ভাবে আবিষ্কার করা যায় গ্রীষ্ম-মেঘলা দেশে কেন পানা ও মশার উংপাত আর পশ্চিমের সাম্রাজ্য বিস্তার—এই রকম কোন নিগূঢ় জটিল বিষয়ে একেবারে নতুন রকম থিসিস লেখার কথা ভাবতে ভাবতে কেন সে মত পাল্‌টেছিল আত্মীয়বন্ধু কাউকে তার একটু আভাস পর্যন্ত সে দেয়নি।

পরীক্ষা পাশের মাপকাঠিতে পদার্থবিজ্ঞানে একটা ডক্টরেট পাওয়ার মত বিদ্যা আয়ত্ত করে সে পত্তন করেছিল স্টোভ ল্যাম্প লণ্ঠন তৈরীর ওই নবশিল্প মন্দির।

বিদেশে কি শিখতে গিয়েছিল তাও খুলে বলে যায়নি। শুধু এইটুকু জানিয়ে-ছিল যে ডিগ্রি-ফিগ্রির লোভ তার আর নেই, ফলিত-বিজ্ঞান শিল্প-বিজ্ঞান এসব যা পারবে যতটা পারবে শিখে আসবে। এদেশের বিশেষ অবস্থায় বিজ্ঞানের যে বিশেষ শিক্ষা বিশেষভাবে কাজে লাগবে।

শুভর দোষ ছিল না। বিজ্ঞানের এত ভাল ছাত্র, বড় বড় বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে তার যোগাযোগ অথচ এই সহজ বৈজ্ঞানিক শিক্ষাটুকু সে কারও কাছে

পায়নি যে ভাবের বশে এরকম এলোমেলো ভাবে বিজ্ঞান শেখা যায় না। বিজ্ঞান শেখার পদ্ধতিটাও বৈজ্ঞানিক।

দমদম এরোড্রোমে জগদীশ ও কয়েকজন আত্মীয়বন্ধু তার প্লেনের জন্য অপেক্ষা করছিল। সকলের মধ্যে গভীর অস্বস্তিবোধ। যাই শিখতে গিয়ে থাক, এ এক রকম শখের বিলাত যাওয়া। তাও আবার বিয়ে-টিয়ে না করেই গিয়েছে। কি মূর্তিতে কি ভাবে ছেলে ফিরছেন কে জানে!

জগদীশ বলে, ওকে ধরলে আমাদের এলাকায় দুজন বিলেত-ফেরত হল। তাও এক বাড়িতে। কাকা জোর করে গিয়েছিলেন, সে আজ প্রায় চল্লিশ বছর হল। আগের বারের বড় যুদ্ধটার ঠিক আগে। আরও দু-চার জনের শখ হয়েছিল, কাজে কিছু হয়নি। সিদ্ধেশ্বরের ছেলেটা সব ঠিকঠাক করেও শেষ পর্যন্ত একটা চাকরি পেয়ে আর গেল না।

জীবন বলে, স্বদেশীর তোড়টা বেড়ে যাওয়ায় বিলাত যাওয়ার নেশাটা কেটে গিয়েছিল।

জগদীশের বন্ধু ও চিকিৎসক বিলাত-ফেরত স্পেশালিস্ট ডাক্তার ভূদেব প্রায় সাদা-হয়ে-আসা মাথাটা নেড়ে বলে, কে বললে আপনাকে? বিলাত যাবে তার সঙ্গে স্বদেশী আন্দোলন বাড়া-কমার সম্পর্ক কি? পরে তখনকার চেয়ে ঢের বেশী এসেছে গিয়েছে। আজকাল তো ডাল-ভাত।

কলকাতায় ভূদেবের জবর পশার। গোড়ার দিকে কম পয়সার দিনে ছিল উগ্র সায়েব, দেশী মানুষের পয়সা বেশী পরিমাণে ঘরে এসে জমতে জমতে একেবারে স্বদেশী বনে গেছে। মাঝে মাঝে গ্রাম্য অশ্লীল রসিকতা পর্যন্ত তার মুখে শোনা যায়।

একটু বেমানান বেখাপ্পা হয় রসিকতা। যেন, কল্‌কে থেকে দা-কাটা তামাক চুরুটে কিম্বা সিগারেটে ঢেলে সাজা হয়েছে!

নন্দ বলে, ডাল-ভাত? ডাল-ভাত নয়, একটা স্পেশাল ক্লাসের মাংস-রুটি বলুন! আগে থাকত ডবল মুক্তির লোভ, গোঁড়া ফ্যামিলির বাঁধনটাও খসত,

কেরিয়ারও ছিল একেবারে বাঁধা। আজকাল শুধু কেরিয়ার, তাতেও আবার ভীষণ কম্পিটিশন !

ভূদেব খুশী হয়ে চুরুট নামিয়ে বলে, তুমি তো ছোকরা ধরেছ ঠিক! ঠিক কথা, আমি কি শালা শুধু ডাক্তার হতে বিলেত গিয়েছিলাম? আরও কত মতলব ছিল।

জীবন বলে, সে সব দিনকাল আর নেই।

ভূদেব বলে, একেবার নেই বলি কি করে? শুভ খানিকটা ভিন্ন রকম মতলব নিয়ে গেছে এইমাত্র। তফাত এই, যাওয়ার জন্য ওকে মারামারিও করতে হয়নি, একটা বিয়েও করতে হয়নি যাওয়ার আগে।

ভূদেবের স্ত্রী করুণাময়ী, তার চুলেও পাক ধরেছে, বলে, বিয়ে করে গিয়ে কি ঠকেছ?

ঠকেছি? ফিরে এসে তোমাকেই বিয়ে করতাম না!

তবে? দোষটা কি?

কিছু না। দোষের ব্যাপার হলে জগদীশও কি শুভর বিয়ের জন্য অত চেষ্টা করত! কোনমতে বাগানো গেল না তাই, নইলে একটি ইয়ং ওয়াইফকেও এখানে ওয়েট করতে দেখতে পেতাম। সে সব দিন নেই বলে উড়িয়ে দিলে কি চলে জীবনবাবু?

চারিদিকে সব কিছু পালটে গেল—

সব কিছু? এক রাজা গেছে, আরেক রাজা এসেছে। আপনি আমি বুড়ো হয়েছি, আমাদের জগদীশ প্রৌঢ় হয়েছে—

ভূদেবের স্ত্রী বলে, তোমার সব বিষয়ে বাড়াবাড়ি।

ভূদেবের মেয়ে মায়া নন্দর সঙ্গে নিজেই খানিক আগে পরিচয় করেছিল। তাকে সে ধরে নিয়েছিল দূর সম্পর্কের কোন গরীব আত্মীয় বলে—না ডাকলেও যারা আত্মীয়তা বজায় রাখার এই সব সুযোগ যেচে গ্রহণ করে, যদি কোন দিন কিছু সুবিধা মেলে এই আশায়। এ সব আত্মীয়দের সঙ্গে আলাপ করার একটা

ঝোঁক আছে মায়ার। কথা বললেই যারা কৃতার্থ হয়ে যায়, তাদের সঙ্গে কথা বলে সে একটা বিশেষ ধরনের সুখ পায়।

বলেছিল, আত্মীয়স্বজনের শাখা-প্রশাখা এত বেড়েছে, সবার সঙ্গে চেনা থাকাই দায়। আমি ওই ওনার মেয়ে।

সে ভূদেবের মেয়ে এটুকু বলাই যথেষ্ট। আর কিছু বলার দরকার আছে কি?

নন্দ বলে, আমি আপনাকে চিনি। শুভর সঙ্গে অনেকবার আপনাকে বারতলায় যেতে আসতে দেখেছি। গাঁয়ের রাস্তায় হেঁটে বেড়াতেও দেখেছি। শুভর কাছে অনেক শুনেছি আপনার কথা।

মায়া ভড়কে গিয়ে বলে, সে কি? তবু আপনাকে চিনতে পারছি না?

নন্দ নিজের পরিচয় দেয়। আত্মীয় নয়, সে শুভময়ের স্কুলের ক্লাসফ্রেণ্ড।

মায়া সংশয়ভরে বলে, শুভর ফ্রেণ্ডদের মধ্যে আপনাকে তো—

নন্দ বলে, সেরকম ফ্রেণ্ড নই। স্কুলে ক-বছর একসঙ্গে পড়েছিলাম। তারপর মাঝেমধ্যে দেখা হয়েছে এইমাত্র। গত এক বছরে তিন-চারখানা চিঠি লিখেছে আমায়। পরশু হঠাৎ টেলিগ্রাম পেলাম, জানিয়েছে আজ এই প্লেনে এসে পৌঁছবে। ভাবলাম আমি হাজির থাকি এটা বোধহয় চায়, নইলে মিছিমিছি আমায় টেলিগ্রাম করবে কেন? না কি বলেন?

বুঝেছি। ভালো কোন কাজের প্ল্যান ভাঁজছে। আপনাকে দরকার হবে। শুভ চিরকাল এইরকম। নইলে আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেয় না? আপনার নাম আমায় বলে না? অথচ যে প্ল্যান ভেঁজে আসছে তাতে আপনাকে দরকার হবে।

কিসের প্ল্যান?

তা কি করে জানব? দেশের গরীবদের বড়লোক করার কোন একটা প্ল্যান হবে!

মায়ার বয়স অনুমান করা অসাধ্য। বয়স গোপন করার চেষ্টা সে করেনি আর দশজন যেমন করে তার চেয়ে বেশী রকম, তার চেহারাটাই ওই ধরনের। নন্দ কয়েকবার তাকে ভালভাবে নজর করে দেখে চোখের আয়ত্তে আনার চেষ্টা

করে। রূপলাবণ্য যা আছে তা যে কোন মেয়ের পক্ষে যথেষ্ট। তবে তার রূপলাবণ্য যেন একটু আলাদা ধরনের অর্থাৎ যে জন্য রূপলাবণ্য সমাজের সব শ্রেণীতে মেয়েদের বিশেষ গুণ বলে গণ্য হয়েছে ঠিক সে রকম নয়। একবার দেখে আরেকবার দেখার কৌতূহল জাগে অসীম, আর কোন সাড়াই যেন জাগে না।

আশ্চর্য সুন্দর সাবলীল সুললিত গড়ন। চুপ করে দাঁড়াবার ভঙ্গিটি পর্যন্ত নৃত্যছন্দে দোলায়িত। জগদীশের ছোট মেয়ে লতা, জর্জেট-পরা ভাগ্নে-বৌ যেন প্রীতিলতাকে তার পাশে একটু মোটাই মনে হয়। অথচ তাদের দুজনের গায়ে একফোঁটা বাড়তি মেদমাংস আছে কিনা সন্দেহ।

ভাগ্নে ফণীন্দ্র সকলের দেখাশোনা করছিল। যেখানেই যাক এটা তার বাঁধা দায়িত্ব। স্যুটপরা হৃষ্টপুষ্ট মানুষটি নিজে খেতে, আর পাঁচজনকে খাওয়াতে, বড় ভালবাসে।

অবশ্য বড়লোক আত্মীয়বন্ধুর খরচে!

সে মায়াকে বলে, ছোটমাসি কিছু খাবে?

প্লেনের কি দেরি আছে?

এই কিছুক্ষণ।

তবে শুভ মাটিতে নামুক, একসাথে হবে'খন।

শুভময়কে দেখলেই বোঝা যায় যে সে অসুস্থ অথবা সদ্য রোগে ভুগে উঠেছে—কিম্বা অস্বাভাবিক রকম শ্রান্ত। জগদীশের ব্যাকুল প্রশ্নের জবাবে সে বলে, না না, শরীর ভালোই আছে আমার। তোমরা সবাই কেমন আছ খবর বল।

আত্মীয়স্বজন গ্রাহ্যের মধ্যেও আনে না তার জবাব। পুরুষের গলায় শোনা যায় সে সত্যি বড় কাহিল হয়ে গেছে বলে আপসোস, মেয়েলি গলায় শোনা যায় শুধু রাস্তার কষ্টে কি করে সে এত বেশী কাবু হয়ে পড়তে পারে এই বিস্ময়সূচক

প্রশ্নটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে উচ্চারণ করার প্রতিযোগিতা। একটা লাগসই জবাব না দিয়ে শুভর রেহাই নেই। সত্যই তো, সুখের স্বর্গ বিলেত, সেখানে গিয়ে হৃষ্টপুষ্ট হাসিখুশি হয়ে আসার বদলে রোগা হয়ে ম্লান বিমর্ষমুখে শুভ দেশের মাটিতে পা দেয় কোন্ যুক্তিতে ?

শুভ আচমকা চটে যায়, সেটাও আরেক ভাবে প্রমাণ দেয় যে বিদেশে ছেলেটা স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট করে এসেছে। শুধু দেহের নয়, হয়তো বা মনেরও স্বাস্থ্য !

কি সর্বনাশের কথা !

শুভ চেঁচিয়ে বলে, বলছি আমার কিছু হয়নি, তোমরা এমন কিচিরমিচির করছ কেন ? তোমরা গায়ের জোরে আমাকে রোগী বানাবে নাকি ?

সকলে স্তব্ধ হয়ে যায়।

এতদিন পরে ফিরে এসেছে, সকলে স্নেহ জানাবে শারীরিক-মানসিক কুশল সম্পর্কে নানারকম উদ্বেগ প্রকাশের মারফত—খুশি হওয়ার বদলে এ দেখছি রেগে যায় ! জগদীশ ভয়-উদ্বেগ ও ভৎর্সনা-মেশানো দৃষ্টিতে ছেলের দিকে চেয়ে থাকে।

শুভ চেঁচিয়ে বলে, আমি ঠিক আছি, আমার কিছু হয়নি মনটা শুধু একটু খারাপ হয়ে গেছে। কত কি ভেবেছিলাম, এখন বুঝতেই পারছি না কিরকম স্বাধীন দেশে এলাম।

সর্বনাশ ! এতকাল পরে দেশে পা দিতে না দিতে দেশের হালচাল ভাল করে বুঝবার আগেই দেশের জন্য মন খারাপ ! দেশের অবস্থা ভাল করে জানবার পর তার মনের অবস্থা কি দাঁড়াবে ?

ভূদেবের তুলনায় পাশ-না-করা ডাক্তার নন্দকে হাতুড়ে বলা যায়। কিন্তু ভূদেব শুধুই ডাক্তার, সে তাই ধরতে পারে না শুভর এরকম অভদ্রভাবে মেজাজ বিগড়ে যাবার কারণ কি। নন্দ কিনা বন্ধু, সে বুঝতে পারে। আর মজা দেখা উচিত নয় ভেবে নন্দ সামনে এগিয়ে বলে, চায়ের ব্যবস্থা রেডি আছে শুনছিলাম ? শুভ যখন পৌঁছেই গেছে, দেরি করে লাভ কি ?

শুভর দিকে চেয়ে হাসিমুখে বলে, পেট যতক্ষণ খারাপ না হচ্ছে, হাজার মন খারাপ হলেও কিছু আসে যায় না।

নন্দ এসেছ? ভালো হয়েছে, তোমার সঙ্গে জরুরী কথা আছে অনেক।

তার যেন ধৈর্য ধরছে না। চায়ের টেবিলে সে নন্দকে পাশে বসায়, তার দিকে ঝুঁকে নীচু গলায় বলে, সবাই বলছে শরীর খারাপ। আসলে আমি একেবারে ভড়কে গেছি ভাই। আকাশ থেকে একেবারে পাতালে আছড়ে পড়েছি। এরা কেউ বুঝবে না। তুমি যদি বুঝতে পার।

খুলে বল। কেন বুঝব না?

কটা প্ল্যান ঠিক করে এসেছিলাম। এসেই কাজ আরম্ভ করে দেব। আরও বছর খানেক থাকা দরকার ছিল, কিন্তু প্রাণ মানল না।

আস্তে চুমুক দাও। জিভ পুড়িয়ে লাভ কি?

দিনরাত শুধু এই চিন্তা করতাম। প্ল্যানগুলো পারফেক্ট করতাম। দেশে ফিরেই কাজ আরম্ভ করব। পরশু বোম্বায়ে নামামাত্র টের পেলাম আমার সমস্ত প্ল্যান বাজে, আমি শুধু মনগড়া খেলা খেলেছি নিজের সঙ্গে। কি শক্ যে পেয়েছি কি বলব তোমাকে। আমি ভাবুক না বৈজ্ঞানিক? যে কাজে গেলাম সেটা হল না, শস্তা একটা ডিগ্রি নিয়ে ফিরে এলাম। দেশে পা দেবার আগে টেরও পাই নি আমার প্ল্যানগুলি সব আজগুবি।

নন্দ শান্তভাবে বলে, এত মুষড়ে যাচ্ছ কেন? আমার তো মনে হয় তুমি ঠিক প্ল্যান কর নি, স্বাধীনতার আনন্দে মশগুল হয়ে ভাবছিলে এবার দেশটার কি হওয়া উচিত, কি ভাবে হওয়া উচিত।

ওটাই তো আহাম্মকের দিবাস্বপ্ন।

গরীব যদি ভাবে তারও বাড়ি-গাড়ি থাকা উচিত সুখাদ্য পাওয়া উচিত সেটা কি দিবাস্বপ্ন? তোমার প্ল্যানের সব কথা পরে শোনা যাবে, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না তুমি একেবারে উদ্ভট অসম্ভব প্ল্যান ভেঁজেছিলে। অন্য অবস্থায় হয়তো প্ল্যানগুলি খাটত। তুমি বৈজ্ঞানিক বলেই দেশে পা দেওয়া মাত্র টের

পেয়েছ তুমি যা ভেবেছিলে এখনকার অবস্থায় ওসব করা যাবে না। মন খারাপ করার বদলে নিজেকে তোমার বরং তারিফ করা উচিত।

এতক্ষণে শুভর মুখে হাসি দেখা যায়।—নাঃ, নন্দ আমাদের তেমনি আছে, মন বুঝে কথা কইতে ওস্তাদ।

কিন্তু সে হাসি লক্ষ্য করে কেউ খুশী হয় না। সকলকে অগ্রাহ্য করে কেবল বাল্যবন্ধুর সঙ্গেই কি সে হাসিগল্প চালিয়ে যাবে? গেঁয়ো একটা ডাক্তারের সঙ্গে?

শুভময় হাসে কিন্তু বোঝা যায় মনের দুঃখ সে ভুলতে পারছে না। পাঁচজনের সঙ্গে সামাজিকতা রক্ষা করার মত সজীব হতে পারছে না।

জীবন সাগ্রহে তাকে প্রশ্ন করে, ওখানকার অবস্থা কি রকম দেখে এলে বাবা? ভারতবর্ষ হারিয়ে নিশ্চয় খুব দুরবস্থা?

বলব, সব বলব।

তার প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে শুভ নন্দকে বলে, শুধু বাজে প্ল্যান করেছিলাম বলেই নয়। দেশে এসে দেখছি আমি কি করব তাই জানি না। আমার কিছুই করার নেই।

শুভময়ের খেদও ফুরায় না, নন্দকে সে ছাড়তেও চায় না। আর কারো সঙ্গে কথা বলার আগ্রহ বা উৎসাহ তার নেই। গায়ে পড়ে কেউ আলাপ জমাবার চেষ্টা করলে যেমন তেমন একটা জবাব দিয়ে তার মান রেখে আবার সে নন্দর সঙ্গে কথায় মেতে যায়।

ক্ষোভে ও অপমানে কালো হয়ে যায় আত্মীয়বন্ধুর মুখ।

চা খাওয়া শেষ হতেই ভূদেবের স্ত্রী বলে, চল আমরা যাই। শুভ খুব ব্যস্ত, ওর কথা কওয়ার সময় নেই।

নন্দ শুভকে বলে, সবার সাথে আলাপ কর! এসব কথা হবে'খন।

তখন ব্যাপারটা খেয়াল করে উদ্যোগী হয়ে শুভ সকলের মুখের কালিমা দূর করে। কথা বলে মানুষের মন ভুলাতে সে চিরদিনই পটু। অকারণে নিজেকে বেশী জাহির না করে যে যেমন তার সঙ্গে তেমনি ভাবে কথা বলা—কথা বলার

এই অতি সহজ আর্টটিও কত মানুষের আয়ত্ত হয় না কিছুতেই !

জগদীশ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। তার ভয় হচ্ছিল বিদেশে মাথাই বুঝি বিগড়ে গেছে ছেলের !

নন্দকে সে ভাল করেই চেনে। যদিও সেটা দেখা হলে কথা বলে ভদ্রতা রাখার চেনা নয়। এখানে বিশিষ্ট আত্মীয়বন্ধুর মধ্যে কামার জাতের গেঁয়ো ডাক্তারটিকে দেখে সে মোটেই খুশী হতে পারে নি।

সকলকে অবহেলা করে শুভকে কেবল তার সঙ্গে কথা কইতে দেখে রাগে এতক্ষণ গা তার জ্বলে যাচ্ছিল।

এবার ভেবেচিন্তে তার কাছে এগিয়ে গিয়ে উদারভাবে বলে, আজ রাত্রে তুমি আমার ওখানে খাবে।

নন্দ একটু বিব্রতভাবে বলে, আত্মীয়স্বজনকে যদি শুধু বলে থাকেন—

জগদীশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায়।

না, ওখানকার কিছু লোককে বলব ভাবছি। পরে শহরে এসে একদিন আত্মীয়স্বজনকে খাইয়ে দেব।

জগদীশের মতে কয়েকদিন শহরে থেকে যাওয়াই উচিত ছিল কিন্তু শুভ আগেই লিখে জানিয়ে রেখেছে যে এরোড্রোম থেকে সে সোজা বারতলা চলে যাবে, সেই ব্যবস্থাই যেন করা হয়।

সকলের সঙ্গে কথা বলে সকলকে খুশী করে শুভ ঘোষণা করে, গ্রামের জন্য মনটা ছটফট করছে, আজ তাই চললাম। কয়েক দিনের মধ্যে আসব, আপনাদের সঙ্গে দেখা করব।

শহরের আত্মীয়বন্ধুর কাছে বিদায় নিয়ে তারা গাড়িতে ওঠে। মায়া তার সঙ্গে বারতলায় যাবে।

জীবনকে ভূদেব তার বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে যাবে। জীবন শুভকে আরও একবার বলে, ক-দিন বাদেই আসছি বাবা। দু-চার দিন থাকব।

বেশ তো, আসবেন, সুখের কথা !

দূর থেকে জনা লেভেল ক্রসিং-এ ভিড় দেখে জগদীশ উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। এ জমায়েত নিশ্চয় তার ছেলেকে অভিনন্দন জানাবার জন্য! খবরটা সে যতদূর সম্ভব ছড়িয়েছে, অনুগত সকলের কাছে একরকম মুখ ফুটে প্রকাশও করেছে যে এরকম একটা কিছু অভ্যর্থনার আয়োজন করলে সে সুখী বই অসুখী হবে না!

গ্রামে না করে এতদূর এগিয়ে লেভেল ক্রসিং-এ এসে সবাই দাঁড়িয়েছে এটা আরও আনন্দের ব্যাপার।

দেখা যায় আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে শুভর মুখ।

কাছে গিয়ে দেখা গেল, ভিড় অন্য কারণে। একটি ছেলে ট্রেনে কাটা পড়েছে কিছুক্ষণ আগে।

ভুলা বাগ্‌দীর ছেলে বলাই।

গাড়িটা থামানো যায়নি। বারতলা স্টেশনেও এ ট্রেনটা দাঁড়ায় না। ছেলের মৃতদেহের পাশে কোমরে হাত রেখে গাড়িটা যেদিক অদৃশ্য হয়ে গেছে সেই দিকে মুখ করে সামনে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে ভুলা চিৎকার করে অভিশাপ ও গালাগালি দিয়ে চলেছে।

নন্দ বলে, আমি এখানে নামব।

শুভ বলে, আমিও নামব। এ কি অ্যাবসার্ড ব্যাপার! একটা মানুষ কাটা পড়ল, গাড়িটা দাঁড়াল না পর্যন্ত! এর ব্যবস্থা করতেই হবে।

জগদীশ বলে, দাঁড়াও আমি দেখছি! গদা, ছুটে গিয়ে স্টেশন মাস্টারকে ডেকে আন্ তো—বলিস—আমি ডাকছি।

কে জানত বলাই এত ভাগ্য করেছিল যে স্বয়ং জগদীশেরা বাপব্যাটায় তার ছেলে ট্রেনে কাটা পড়ার পরবর্তী ব্যবস্থার দায়িত্ব গ্রহণ করবে। গালাগালি বন্ধ করে ভুলা মুখ গোমড়া করে দাঁড়িয়ে থাকে—জগদীশের সামনে তার হাত দুটি আপনা থেকে জোড় বেঁধে গেছে।

তার বাঁ হাতের একটি আঙ্গুল কাটা। অনেক দিনের কথা, বারো চোদ্দ বছরের কম নয়, জগদীশের সামনে তারই হুকুমে আঙ্গুলটা কেটে ভুলাকে এক

গুরুতর অপরাধে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। ঘরের চাল সারাই করতে করতে শুভর দুবুর্দ্ধির জন্য পড়ে গিয়ে সে শুভকে চড় মেরে বসেছিল, একেবারে টুকটুকে ফর্সা গালে পাঁচ আঙুলের দাগ বসিয়ে।

ভুলা আর চাষী-বাগ্দীরা ছাড়া সকলেই ঘটনাটা ভুলে গেছে। শুভ তাই তার সঙ্গে দু-চারটা কথা বলতে বলতে অনায়াসে জিজ্ঞাসা করে বসে, তোমার আঙুলটা কাটা গেল কি করে?

আজ্ঞে দুগ ঘটনায়।

ভুলা ফ্যালফ্যাল করে শুভর ফর্সা মুখের দিকে চেয়ে থাকে। তার গালে আঙুলের দাগ খুঁজবার জন্য নয়। শুভর গালের আঙুলের দাগ কবে মিলিয়ে গেছে কিন্তু তার কাটা আঙুল আর জোড়া লাগল না ভেবে আপসোস করার জন্যও নয়।

হাঙ্গামা চুকিয়ে ফেরার পথে নন্দ মাঝের গাঁয়ের কাছে নেমে যায়। বারতলা পর্যন্ত সঙ্গে গেলে সে দেখতে পেত শুভকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য জগদীশের বাড়ির কাছে লোক মন্দ জমে নি।

এবং সকলেই তারা অনুগত অনুগ্রহপ্রার্থী নয়!

আশেপাশের গ্রামের লোক ভেঙ্গে পড়লেই জগদীশ খুশী হত। তবু এত লোক যে জমেছে, শাঁখ বাজিয়ে শুভর গলায় মালা পরিয়ে দেবার জন্য অপেক্ষা করছে সেটা মন্দের ভালো বলতে হবে।

মায়া উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, গ্রামের লোক তো তোমায় খাতির করে খুব।

শুভ মাথা নাড়ে।

খাতির? মজা দেখতে ভিড় করেছে।

সব লোক মিলেমিশে একাকার হয়ে ভিড়টা জমালে সে এটা ধরতেও পারত না। কিন্তু ফুলের মালাটালা নিয়ে দপ্তরের কর্মচারী, বাড়ির লোক আর গাঁয়ের কিছু অনুগত লোক মিলে করেছে ছোট একটা ভিড়, খানিকটা তফাত বজায় রেখে অন্য লোকেরা এলোমেলো ভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

অভিনন্দন-পর্বের অংশীদার নয়। তারা শুধু দর্শক।

নিজেদের লোক আর অনুগতেরা হৈ চৈ করে আগে জমা না হলে এরা হয় তো দর্শক হিসাবেও এসে দাঁড়াত না।

এ ব্যাপার শুভ জানে। স্বাধীনতার জন্য যখন প্রচণ্ড সংগ্রাম চলেছে, দেশের প্রাণের মানুষেরা হাজারে হাজারে জেলে গিয়েছে, কলকাতার রাজপথে লাট-বেলাটকে গাড়ি চেপে যেতে দেখতে তখনও পথের দুদিকে মানুষ ভিড় করেছে।

সম্মান জানাতে নয়, শুধু দেখতে। লাটবেলাট এসে পড়বার অনেক আগে থেকে সে পথে আরম্ভ হয় নানারকম পুলিসের গাড়ির ছুটোছুটি ব্যস্ততা—লোকে ভাবে, কে আসছে, ব্যাপার কি একটু দেখাই যাক দাঁড়িয়ে!

দিন কয়েক শুভ যেন নন্দকে আঁকড়ে থাকে।

সকাল বেলাই মাঝের গাঁয়ে হাজির হয়। নন্দকে বলে, চা খাবার সব খেয়ে এসেছি, আমার জন্য ব্যস্ত হয়ো না। নিজের কাজ ঠিকমত করে যাও। আমার দিনরাত ছুটি, তোমার বাড়তি টাইমে আমার সঙ্গে কথা বললেই ঢের হবে।

নারান কর্মকারের পৈতৃক ভিটা জীর্ণ কুঁড়ে ক-খানার গা ঘেঁষে বারান্দাওলা নতুন একখানা কাঁচা ঘর তুলে নন্দ ডিসপেন্সারি দিয়েছে। ওষুধের আলমারিটার মাথায় একটি গণেশের মূর্তি, পিছনের দেয়ালে কালীর পট। একটি লোহার চেয়ার এবং বাড়িতে মিস্ত্রী এনে তৈরী করা দুখানা কাঁঠাল কাঠের টেবিল,—একটি টেবিলে সে প্রেসক্রিপশন লেখে এবং অন্য টেবিলটিতে নিজেই সেই প্রেসক্রিপশন দেখে ওষুধ বানায়। এ ছাড়া ঘরে আসবাব আছে পাটি-বিছানো একটি তক্তাপোষ ও একখানা বেঞ্চি।

চাষাভূষা রোগী এবং ওষুধ ও পরামর্শপ্রার্থী মেঝেতে উবু হয়ে বসে। একটু যারা ভদ্র, অন্তত একটা ফতুয়া গায়ে দিয়ে কিম্বা কাঁধে বিশ বছরের প্রাচীন ও পোকায় কাটা হলেও কোনরকম একটা চাদর ফেলে আসে, তারা বসে তক্তা-পোষে কিম্বা বেঞ্চিটাতে।

শুভ এসে সকাল থেকে বেঞ্চি বা তক্তাপোষে জাঁকিয়ে বসে থাকা আরম্ভ

করার পর এদের বেশীর ভাগ অবশ্য দাঁড়িয়েই থাকে—সাহস করে বসে কেবল ব্রাহ্মণ গুরুজনস্থানীয় দু-একজন। নন্দর ডাক্তারি পেশায় কিছুমাত্র ব্যাঘাত ঘটাতে না চেয়েও শুধু উপস্থিত থাকার জন্যই শুভ নানা গোলমাল সৃষ্টি করে। মনে যার যাই থাক, জগদীশের মত ডাকসাইটে মস্ত জমিদারের বিলাতফেরত ছেলের অস্তিত্ব উপেক্ষা করার অবাস্তব কল্পনাকে কেউ প্রশ্রয় দেয় না।

দু-একজন দেয়। যেমন তালতলার সাঁতরাদের মেজ ছেলে হরিপদ। সম্প্রতি তার বিয়ে হয়েছে এবং সেদিন রাত্রে তারই বিয়ের বিছানা পেতে জীবনকে শুতে দেওয়া হয়েছিল। সবাই জানে বিয়েটা তার বাপভায়েরা এক-রকম গায়ের জোরে দিয়েছে,—বারতলা স্টেশনটা উড়িয়ে দেবার জন্য বাড়িতে সে কলেরাপটাশের পটকা-বোমা তৈরী করতে মেতে গিয়েছিল। অ্যাটম বোমার যুগেও সে ভুঁইপটকা দিয়ে রেল স্টেশন উড়িয়ে দিয়ে জগতে কীর্তি রেখে যাবার স্বপ্ন ছাখে!

সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে সে ডিসপেন্সারিতে আসে, শুভকে দেখে মুখ বাঁকায়, সিগারেটে জোরে টান দিয়ে এমন ভাবে ধোঁয়া ছাড়ে যেন শুভর মুখের উপর ছেড়ে দিতে পারলেই খুশী হত। শুভর কাছেই ধপাস করে বসে। তীক্ষ্ণ বেপরোয়া স্বরে বলে, পেটের ব্যথাটা কাল বেড়েছিল নন্দদা!

পেটে কি হয়েছে ভাই?

শুভ তার গায়ে-পড়া বেয়াদপি গায়ে মাখে না। সহজ ভাবেই প্রশ্নটা করে।

আপনাদের ভেজাল খেয়ে যা হয়—আলসার।

মুখ তুলে নির্বিকার দুঃসাহসের ভঙ্গিতে সে চেয়ে থাকে। পেটে আলসার হয়েছে—পেটে আলসার আর বুকে থাইসিস না হয়ে কি রেহাই আছে এই দুর্ভাগা দেশের যুবজনের—হয়েছে হোক! আমি কি মরতে ডরাই? এ তো তুচ্ছ আলসার!

আবার যেমন প্রৌঢ়বয়সী শশাঙ্ক। খালি পায়ে খালি গায়ে আটহাতি একটি ধুতি পরে কাঁধে একটি তেলচিটে রোঁয়া-ওঠা শতজীর্ণ রেশমের পাকানো চাদর মোটা দড়ির মত ঝুলিয়ে এদেশের একমাত্র স্বাধীনতা পাওয়া ব্যক্তির মত

ডিসপেন্সারিতে ঢোকে, জগতের সমস্ত অশুভের সঙ্গে শুভময়ের মত বিলাত-ফেরত জমিদার-বাচ্চাকে পর্যন্ত মন্ত্রের জোরে উড়িয়ে দেবার ভঙ্গিতে বলে : শুভমস্তু!

শুভর গা ঘেঁষে বসে বলে, সিগারেট হবে নাকি একটা ?

সমস্তই ভগবানের লীলাখেলা, নন্দ ডাক্তারের খড়ের ঘরের ডিসপেন্সারিতেও মানুষকে আশ্রয় করে তার প্রকাশ—দীনহীন দরিদ্র ভিখারী ব্রাহ্মণ যেন এর মজাটা টের পেয়ে গিয়েছে! কেঁচোর মত নরম অসহায় কৃপাপ্রার্থী সেজে থেকে কিছুই হয় না, তবে আর মিছে কেন পরোয়া করা! বরং আমি সবার সেরা সবার প্রণম্য শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ—এভাব দেখালে তবু একটু খাতির জোটে মৌখিক!

শুভই যেন খানিকটা অনুগত কৃপাপ্রার্থীর মত নিজেকে এখানে টিঁকিয়ে রাখে। দেশের সঙ্গে যোগাযোগের অভাবটা সে অনুভব করছে তীব্রভাবে। নন্দর মারফত সেটা খানিক পূরণ হবার আশা সে রাখে।

কি দিয়ে কি ভাবে সেটা হবে তা কিন্তু সে জানে না। কি যোগাযোগ সে চায় দেশের সঙ্গে সেটাই সে জানে না—সুতরাং কি ভাবে সেটা ঘটবে তা জানাও সম্ভব নয়।

নন্দ দেশের কথা বলবে ? নতুন কথা কি তাকে জানাবার আছে নন্দর—তথ্য বরং সে বেশীই রাখে নন্দর চেয়ে। মানুষগুলিকে চিনবে ঘনিষ্ঠতা দিয়ে ? মানুষগুলি তার অচেনা নয়—তাদের আর্থিক সামাজিক শারীরিক ও মানসিক ইত্যাদি সকল দিকের পরিচয় সে ভালভাবেই রাখে।

ইতিমধ্যে দেশে কি ঘটেছে না ঘটেছে তাও তার অজানা নয় কিছুই।

শুধু স্থানীয় অবস্থা ও ঘটনার প্রত্যক্ষ বিবরণ কিছু নন্দ তাকে দিতে পারে, এখানকার সাধারণ মানুষের সাম্প্রতিক মনের গতিটা কোনদিকে খানিক জানাতে পারে।

কিন্তু সেটা জানা কি প্রয়োজন শুভময়ের ?

তার শুধু দেশের শিল্প বাড়াবার চিন্তা। অভিনব এক পরিকল্পনা গড়ে তুলে প্রাণভরা উৎসাহ নিয়ে সে দেশে উড়ে এসেছে, দেশে পা দিতেই অবাস্তব বলে

নিজের কাছেই বাতিল হয়ে গেছে পরিকল্পনাটা। এখন তার প্রয়োজন নতুন একটা সম্ভবপর বাস্তব পরিকল্পনা। কিন্তু এ বিষয়ে নন্দর কাছে সে কি সাহায্য পেতে পারে?

নন্দ তার অনেক কথা বুঝতেই পারে না। সে বলে যে শিল্প নয়—সে গড়তে চায় শিল্প আন্দোলন। শিল্প সম্পর্কে কী আন্দোলন? জাতীয় শিল্প গঠন ও সংরক্ষণ? মূল শিল্প জাতীয়করণ? এ সব তো দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যেই আছে!

কিন্তু না, শুভময় তা বলেনি।

সে আবার তার বাতিল-করা পরিকল্পনার কথা বলে। পরিকল্পনাটা বাতিল হয়ে যায়নি—ও বিষয়ে একটা ধারণা করে না নিলে সে নতুন কি পথ খুঁজছে বোঝা অসম্ভব। নন্দর মুশকিল হয়েছে এই যে শুভ কি ভেবেছিল সব শুনেও সে-ভাবনার আসল মর্মটি সে আয়ত্ত করতে পারে না।

শিল্পে পিছানো দেশ। বহু কালের পরাধীন দেশ। এশিয়া নামক বিশেষ অবস্থা ও অবস্থানের মহাদেশটির অন্তর্গত দেশ। শিল্প কম, চাষ বেশী,—দরিদ্র অন্নহীন কর্মহীন কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিরাট জনশক্তি। এখান থেকে শুভ যখন শুরু করে সব জলের মত পরিষ্কার লাগে। তারপর শুভ যখন আসে শিল্পোন্নতির ধরাবাঁধা পথের বদলে দেশের বিশেষ অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে বিশেষ প্রাথমিক ব্যবস্থার প্রয়োজনের কথায়, তখনও নানা প্রশ্ন মনে এলেও কথাটা মোটামুটি বোঝা যায়।

কিন্তু ওই বিশেষ ব্যবস্থার মানে সে যখন বোঝাতে চায় শিল্পপ্রচেষ্টাগত বিশেষ ব্যবস্থা—ইওরোপ আমেরিকার অগ্রসর যন্ত্রশিল্পের বদলে এদেশের উপযোগী ব্যাপক প্রাথমিক শিল্প প্রচেষ্টা, যাতে যন্ত্রশক্তি প্রধান নয় প্রধান হল জনশক্তি—তখন সব গুলিয়ে যায় নন্দর।

কুটিরশিল্প নয়। না, সেটাই ছিল শুভর বাতিল-করা পরিকল্পনা। বড় শিল্প যখন গড়া যাবে না, একচেটিয়া পুঁজিপতিদের কবলে সব বড় শিল্প কিন্তু

তাও সামান্য—তখন তার বিরুদ্ধে সংগঠিত কুটিরশিল্প গড়ে তোলা, বিরাট কারখানার মত সংঘবদ্ধ কুটিরশিল্প। টাটার কারখানা আছে থাক—লাখ লাখ কামার যে ছাড়াছাড়া ভাবে টিনের নীচে হোগলার নীচে ঠুকঠুক হাতুড়ি ঠুকছে, তাদের একত্র করে বিশাল কামারশালা সৃষ্টি করা। শুধু অপচয় বন্ধ হবে না—শিল্পপ্রধান দেশে আধুনিক ধরনের বিরাট কারখানার মত এই সব সংঘবদ্ধ কামারশালা তাঁতশালার মধ্যে খাটুয়েরা সংঘবদ্ধ হবে।

শুভ তীব্রজ্বালাভরা হাসি হাসে,—বোম্বায়ে কাপড়ের কলগুলি দেখে স্বপ্ন ভেঙে গেল শুভর। এত বিজ্ঞান চর্চা করেও গান্ধীজির চরকা আর খদ্দরের স্বপ্ন এখনও এমন ভোল বদলে মাথায় আসে! এদেশে কাপড়ের মিল গড়ার জন্যেই তো চরকার আন্দোলন। কারখানা গড়ার জন্য খানিক সুযোগ ও স্বাধীনতা আদায়ের উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ কামারশালা গড়ার আন্দোলন হয়তো একদিন চলত, সে দিনকালও আর নেই।

তোমার মনে হয়নি এ রকম কামারশালার মানে হয় না? দু-চারজন দা' কুড়ুল কাস্তে এসব বানায়, আশেপাশে বেচে পেট চালায়—আশেপাশের লোক লাঙলের ফলাটলা সারাই করতে আসে। তোমার ওই কামারশালায় এক জায়গায় সব তৈরি করলে চালান দিতে হবে—তার মানেই কারখানা দাঁড়িয়ে গেল। তাছাড়া চাষবাসের যন্ত্রপাতি সারাতে চাষী কি দুশো মাইল হেঁটে তোমার কামারশালায় পাড়ি দেবে?

শুভ বিরক্ত হয়ে বলে, আমি কি ছেলেমানুষ, এসব ভাবব না? আমার আসল কথাটাই তুমি ধরতে পারছ না। আমি কি সারাদেশের কুটিরশিল্প কুড়িয়ে এনে এক জায়গায় করার কথা ভাবছিলাম? চারিদিকে এসব যতটা দরকার ছড়িয়ে আছে এবং থাকবেও। আমি বলছিলাম বাড়তি যে ম্যান-পাওয়ার স্রেফ অপচয় হয়ে যাচ্ছে সেটাকে এই রকম প্রাথমিক শিল্প প্রচেষ্টায় সংঘবদ্ধ করা, কাজে লাগানো। বড় বড় মডার্ণ কারখানা না গড়লে এই লাখ লাখ লোকের বেকারত্ব ঘুচবে না, আমার মতে এটা ভুল ধারণা। এটা হচ্ছে পরের স্টেজ। মডার্ণ যন্ত্রপাতি নিয়ে মডার্ণ ইণ্ডাস্ট্রি, আমরা যখন এখনই

বাড়াতে পারছি না—কুটিরশিল্পের স্টেজের প্রাথমিক ইণ্ডাষ্ট্রি আমরা গড়তে পারি। ইওরোপ আমেরিকায় এটা হয় না, এদেশে সম্ভব।

কি করে?

তাই তো ভাবছি! সেই জন্যই তো তোমার সঙ্গে পরামর্শ করা।

নন্দ চিন্তিতভাবে বলে, তুমি পণ্ডিত হয়েছ পদার্থবিজ্ঞানে, আমি শিখেছি খানিকটা ডাক্তারি বিদ্যা। আমার মনে হয়, ভাল করে একনমি না পড়ে পলিটিক্‌স না ঘেঁটে আমরা দুজনে পরামর্শ করে কিছু ঠিক করতে পারব না। মার্কসবাদও ভাল করে জানা দরকার।

শুভ জোর দিয়ে বলে, কিছু কিছু সবই আমি পড়েছি। পুঁথির বিদ্যা দিয়ে কিছু হবে না। সায়ান্স আমাকে এটা শিখিয়েছে। বাস্তব অবস্থা জেনে বুঝে কাজ করতে হবে।

নন্দ বলে, কিন্তু বাস্তব অবস্থা জানবার বুঝবার জন্যই তো বিদ্যা দরকার। কিসে কি হয়, কেন হয়, না জানলে চলবে কেন? একটা আন্দোলন গড়তে হলে নিজেকে সব বুঝতে হবে, দশজনকে বুঝিয়ে দিতে হবে—

শুভ এবার বিরক্ত হয়ে বলে, আমার আসল কথাটা তুমি ধরছ না, অনেক কিছু সাপোজ করে নিচ্ছ। আমি কি ওরকম আন্দোলনের কথা বলছি? আমি যা করব নিজে করব, নিজের জন্য করব—নতুন রকম কিছু। আমার সাক্‌সেস দেখে দশজনে আমায় ফলো করবে। একেই আমি বলছি ইণ্ডাষ্ট্রিতে নতুন একটা আন্দোলন সৃষ্টি করা। এদেশের বিশেষ অবস্থায় যেটা উপযোগী হবে, দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। বুঝতে পারছ কথাটা? কোন কাজে আমাকে লাগতে হবেই। বাপের জমিদারি আছে বলে গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াতে পারব না। আমার চাকরি করার মানে হয় না। ওটা শুধু কাজ করা হবে—কোন পজিটিভ রেজাল্ট নেই। কোন ল্যাবরেটরিতে গিয়ে কিম্বা নিজে ল্যাবরেটরি দিয়ে রিসার্চ করতে পারি—

তাই কর না?

কিন্তু লাভ কি? জগতে রিসার্চ কম হয় নি, আবিষ্কারও কম হয়নি। তার

কতটুকু কাজে লাগছে এদেশে ? রিসার্চ করে আমি সায়ান্সকে এগিয়ে নিতে পারি, কিন্তু আমার দেশ কি তাতে এগোবে ? সায়ান্স যেখানে এগিয়েছে, দেশটা অন্তত তার খানিকটা নাগাল ধরুক।

এলোমেলোভাবে রোগী ও রোগিনীরা আসে যায়, তাদের আত্মীয়বন্ধু আসে যায়—অকারণে মানুষ ডাক দিয়ে দু-দণ্ড আড্ডা মেরে যায়। বেকার মানুষ। পেটের জন্যেও আয় করার উপায়হীন মানুষ। তা, ওরকম মানুষ অসংখ্য আছে দেশে। অনেকের আছে বছরে কিছু দিনের কাজ—বাকিটা কর্মহীন সময়ের বোঝা বয়ে বেড়ানো জীবন। নন্দ ভাবে, এটা না শোষিতের দেশ ? জীবিতের খাটুনি আর সময়রূপ জীবনটাই তো শোষণের আসল সামগ্রী ? এত মানুষ প্রাণপাত করে খেটে শোষিত হবার জন্য সারা দেশে চরে বেড়াচ্ছে অথচ তাদের ভালো রকম শোষণ করার চেষ্টা নেই,—এ কি রকম শোষণ ব্যবস্থা ?

কিন্তু শুভময়ের মনের কথাটা সে ধরতে পারে না।

সে রোগী দেখতে যায়। ফিরতে মোটামুটি কতক্ষণ লাগবে জেনে নিয়ে শুভ চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে বেরিয়ে পড়ে।

রাস্তার ধারে একখণ্ড ফাঁকা পরিষ্কার জমিতে সে গাড়ি রেখেছিল। নন্দর বাড়ি পর্যন্ত গাড়ি যাওয়ার রাস্তা নেই। মাঝের গাঁয়ের দিকে ঢুকে এসেছে কাঁচা শাখা রাস্তাটি—এখানে বেশ নির্জন। তার ওপর ফাঁকা জায়গাটুকুর তিন দিক গাছপালায় ঢাকা।

ইতিমধ্যে গাড়ির দুটি টায়ার ও কিছু আল্‌গা পার্টস চুরি হয়ে গিয়েছে।

লক্ষ্মী এগিয়ে এসে বলে, দুজন কি ঠুকঠাক করছিল, আমায় দেখে ছুটে পালিয়ে গেল।

চেনো ?

না, কি করে চিনব ?

গাঁয়ের লোককে চেনো না ?

গাঁয়ের লোক নয়। কিন্তু কিছু তো নিয়ে যেতে দেখলাম না। চাকা দুটো দেখা যেত!

তাহলে অন্য লোক আগে নিয়েছে—এরা দুজন কিছু বাগাতে পারেনি। কী আশ্চর্য ব্যাপার, গাঁয়েও মোটর পার্টস চুরি যায়! খুলল কি করে?

তার ভাব দেখে লক্ষ্মী সশব্দে হেসে ওঠে, আপনারা গাঁ বলতে কি বোঝেন! গাঁয়ে শুধু হাবাগোবা চাষী ভূত থাকে, মোটর দেখলে দশ হাত তফাত থেকে হাঁ করে চেয়ে থাকবে? কত রকমের কত লোক এদিক ওদিক যাতায়াত করছে তার ঠিক আছে কিছু! বুদ্ধি করে গাঁয়ের একজনকে ডেকে গাড়িটা দেখতে বলেও যেতে পারলেন না!

আমি কি জানি এমন হবে!

চার পাঁচ বছরের একটি উলঙ্গ মেয়ে এসে লক্ষ্মীর আঁচল ধরে টানে, রাস্তার অপর দিকে খানিক তফাতে ছোট কুঁড়েঘরটির দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দেয়। লক্ষ্মী তাকাতেই ঘোমটাটানা একটি বৌ হাতছানি দিয়ে তাকে কাছে ডাকে। বৌটির অর্ধেক শরীর জীর্ণ বেড়ার আড়ালে।

লক্ষ্মী এগিয়ে গিয়ে তার কথা শুনে আসে। শুভ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলার সময় বৌটির শাঁখাপরা হাত নাড়ার ভঙ্গি চেয়ে দেখে।

ফিরে এসে লক্ষ্মী শুভকে বলে, বৌটি দেখেছে, সাইকেল চেপে দুজন এসে চাকা-টাকা খুলে নিয়ে চলে গেছে। কে নাকি একজন হাঁক দিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল। ওরা বলছে, আপনি ওদের পাঠিয়েছেন, ওরা মিস্ত্রী।

কাছেই এক পাড়ায় রোগী দেখে এই পথেই নন্দকে আরেক পাড়ায় যেতে হবে। সাইকেল থেকে নেমে সব শুনে সে মুখ গম্ভীর করে থাকে।

শুভ বলে, থানায় খবর পাঠাব না?

নন্দ বলে, না।

লাভ নেই বলছ? অনর্থক হাঙ্গামা হবে?

হাঙ্গামা তো হবেই। সেজন্য বলছি না। আসলে এটা ঠিক চুরি নয়। এভাবে গাঁয়ের মধ্যে গাড়ি থেকে টায়ার-ফায়ার চুরি করার সাহস চোরের

হয় না। ঠিক আজ তুমি এখানে গাড়ি রাখলে আর আজকেই সাইকেল চেপে দুজন ওরকম চোর এখানে হাজির হল—নাঃ, এ অন্য ব্যাপার।

লক্ষ্মী মংশয়ভরে বলে, আমারও মনটা যেন বলছিল—

নন্দ বলে, সত্যি চুরি হলে এতক্ষণ ভিড় জমে যেত না ?

লক্ষ্মী বলে, তাই তো বটে ! এ যেন গাঁয়ে জনমনিষ্যি নেই !

শুভ বলে, কী ব্যাপার ? সব যে রহস্যময় ঠেকছে ?

নন্দ বলে, রহস্য কিছু নয়, সাদাসিধে ব্যাপার। তুমি বরং আমার ওখানে গিয়ে বসয়ে যাও। দেখি কি ব্যবস্থা করা যায়।

ব্যাপারটা শুনি না ?

ব্যাপার এই—তোমার সঙ্গে একটু তামাসা করেছে। তোমায় একটু জব্দ করতে চায়।

শুভ যেন আকাশ থেকে পড়ে, জব্দ করতে চায় ? আমাকে ? সবেমাত্র দেশে ফিরলাম, আমি তো কারো কিছু ক্ষতি করিনি !

নন্দ হেসে বলে, তুমি হয়তো করনি। যে বুদ্ধিমানের মগজে প্ল্যানটা গজিয়েছে তোমাদের জাতটার ওপরেই হয়তো তার রাগ। তোমার গাড়িটা রেখে যেতে দেখেই ভেবেছে, তামাসা করার বেশ সুযোগ মিলেছে !

কিন্তু এ তো একজনের কাজ নয় !

নন্দ মাথা নাড়ে।

গাঁসুদ্ধ লোক সায় দিল ?

শুভর গলার আওয়াজে বিস্ময় বা আপসোসের চেয়ে কাতরতা বেশী ফুটেছে খেয়াল করে লক্ষ্মী তাড়াতাড়ি বলে, না না, তাই কখনো দেয় ! দুচার জন কাজটা করেছে, অন্যেরা তফাত হয়ে থেকেছে এইমাত্র।

মাথা হেঁট করে শুভ নন্দর ডিসপেন্সারিতে ফিরে যায়। বিদেশে অনেক মাথা ঘামিয়ে গড়া পরিকল্পনা মাথার মধ্যে ভেঙে চুরমার হয়ে যাবার ব্যাপারটা তুচ্ছ হয়ে গেছে একেবারে। আজ এখন যেন সত্যি ভেঙে চুরমার হয়ে গেল তার সব কল্পনা আর স্বপ্নের ভিত্তি। প্রতি পদক্ষেপে তার মনে হয়, চারিপাশে

কাছে ও দূরের ঘরগুলির জানালা-দরজা দিয়ে উঁকি মেরে তার দিকে চেয়ে গাঁয়ের মেয়েপুরুষ নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করছে, ক্ষেতে আর মাঠে মানুষ তাকে দেখে তার দিকে পিছন ফিরছে, হাসি চেপে রেখে পথ দিয়ে লোক তার পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে।

এর চেয়ে টায়ার আর পার্টস কটা সত্যি সত্যিই চুরি যাওয়া অনেক ভালো ছিল। সম্পূর্ণ গাড়িটা চুরি গেলেও তার এতখানি দুঃখ হত না।

আধ ঘণ্টা পরে নন্দ ফিরে আসে। জানায় যে গাড়ির খুলে-নেওয়া অংশগুলি ফিট করা হচ্ছে।

তোমার কাছে ক্ষমা চেয়েছে ভাই। যদি তুমি চাও সামনে এসে মাপ চাইতেও রাজি আছে।

শুভ নীরবে মাথা নাড়ে।

নন্দ বলে, দুঃখ করো না। তোমার মনে কি আছে কেউ তো জানে না, তোমাকেও দলে ভিড়িয়ে দিয়েছে। লক্ষ্মী যা বলেছে কথাটা ঠিক, কাজটা আসলে দু-পাঁচজনের। আগে হলে হত কি, গাঁয়ের দশজন ওদের বাধা দিত। আজকাল সবার প্রাণে বড় জ্বালা।

তা হলে একলা পেয়ে আমাকে ওরা খুনও তো করতে পারে, দশজনে তাকিয়ে দেখবে?

অকারণে খুন কেউ করবেও না, দশজনে সইবেও না। সেজন্য আগে তোমাকে তাহলে একটা বড় রকম অপরাধ করতে হবে, দশজনে যাতে তোমার মরাই ভালো মনে করে। তখন কেউ এগিয়ে গিয়ে তোমায় মারলে সবাই চুপ করেই দেখবে। এখানে কেন, সব দেশেই এই নিয়ম।

নন্দ ভেবেছিল, শুভ বোধ হয় পরদিন আর আসবে না। পরদিন সকালে সেইখানে গাড়ি রেখে সে হেঁটে নন্দর ডিসপেন্সারিতে যায়। মাথা হেঁট করে নয়, মুখ তুলে এদিক ওদিক চেয়ে দেখতে দেখতে।

সেদিন ছিল ছুটি। কৈলাস একটু ওষুধের জন্য নন্দর কাছে এসেছিল। কাল রাত্রে এক ভক্তের বাড়ি মানত পূজার বলির মাংস খেয়ে এসে তার বাবা ত্রিভুবনের খুব পেট ব্যথা হয়েছে। আজকাল মাঝে মাঝে তার কলিক হয়। বয়স যে বসে নেই অন্যের বাড়ি খাওয়ার সময় এটা তার খেয়াল থাকে না।

ত্রিভুবন শ্যামাসঙ্গীতে বিখ্যাত গায়ক, নামকরা সাধকও বটে। তার মুখে শ্যামাসঙ্গীত শুনতে এককালে দশ গাঁয়ের লোক ভেঙ্গে পড়ত। আজকাল বয়স হওয়ায় গলার আর তেমন জোর নেই।

তবু এখানে ওখানে, বিশেষত ভক্তদের বাড়িতে, তার নিমন্ত্রণ জোটে প্রায়ই। তাকে খাইয়ে পুণ্যও আছে নামও আছে।

নন্দ পুরিয়া তৈরী করছিল, আগের দিনের হেঁটমাথা মনমরা শুভর ভাবান্তর দেখে জিজ্ঞেস করে, কি হল?

আমি সত্যি বোকা। কাল ধরে নিয়েছিলাম ওরা বিশেষভাবে আমাকেই জব্দ করতে চেয়েছে—রাগটা ওদের আমার ওপরেই। কিন্তু তা কেন হবে?

নন্দ আর কৈলাস আশ্চর্য হয়ে তার কথা শোনে। গরীবেরা সব বড়লোকের উপরেই চটা, জব্দ করার সুযোগ পেলে ছাড়ে না। বিশেষভাবে শুভর গাড়ি বলে নয়, অন্য কেউ ওভাবে গাড়ি চেপে গাঁয়ের মধ্যে ঢুকে গাড়ি ফেলে রেখে কোথাও গেলে তার গাড়ির পার্টস খুলে নিয়েও ওরকম তামাসা করত।

কাল রাত্রে হঠাৎ নাকি এটা তার খেয়াল হয়েছে।

কৈলাসের মুখে হাসি দেখা যায়, কিন্তু কথা সে বলে খুব কড়া।

আপনি যে গাঁয়ের লোককে একসাথে ছ্যাবলা আর বজ্জাত বানিয়ে দিচ্ছেন! গাড়ি চেপে যেই আসুক গাঁয়ের মানুষ তার সাথেই ইয়ার্কি জুড়বে তাকে জব্দ করার সুযোগ খুঁজবে?

বোঝা যায় গাঁয়ের লোকের মিথ্যে অপবাদে সে চটেছে।

কৈলাসকে তুমি বলবে না আপনি বলবে? শুভকে একটু ভাবতে হয়! নন্দ

তাকে তুমি বলে কিন্তু সেটা তাকে কৈলাসদা বলার জন্য। ত্রিভুবন দত্তের ছেলে হিসাবে এবং বয়সে বড় বলে তাকে আপনি বলা যায়। কিন্তু এদিকে আবার একজন কম্পোজিটরকে আপনি বলতে কেমন বাধ-বাধ ঠেকে!

তখন শুভর মনে পড়ে গাঁয়ের লোকের উপর কৈলাসের প্রভাবের কথা। কৈলাসের সম্পর্কে এ কথা সে ইতিমধ্যেই শুনেছে—স্বয়ং জগদীশের মুখে। ছেলেকে জমিদারির অবস্থা বুঝিয়ে দেবার সময় জগদীশ কৈলাসের প্রসঙ্গ তুলেছিল—প্রশংসা করতে নয়, গায়ের জ্বালায়। যাদের বুদ্ধি পরামর্শে প্রজারা বিগড়ে যাচ্ছে, হাঙ্গামা করছে, কৈলাস নাকি তাদের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি।

ভেবেচিন্তে অন্য সব বিচার বাদ দিয়ে গাঁয়ের লোকের সম্মানকে স্বীকৃতি দেওয়াই শুভ ভাল মনে করে!

বলে, আপনি কি বলতে চান আমার ওপর বিশেষ ভাবে রাগ আছে সকলের? নবশিল্প মন্দিরটা করে আমি অনেককে রোজগারের সুযোগ দিয়েছিলাম—

যেমনি আবার ছাঁটাইও করেছেন।

কারখানা না চললে আমার কি দোষ? কিছুকাল তো কিছু লোক পয়সা কামিয়েছে। তারপর আমি চলে গেলাম বিদেশে। বিশেষভাবে আমার ওপর লোকে চটবে কেন?

যার উপর বিশেষভাবে চটবার অনেক কারণ আছে, আপনি তার ছেলে বলে।

নন্দ বলে, থাক না কৈলাসদা।

শুভ কিন্তু গম্ভীর মুখে বলে, থাকবে কেন? এটা সম্ভব বৈকি। বাবা বুঝি খুব দাপট চালিয়েছেন? এসব কিছু এখনো শুনি নি, তাই এদিকটা আমার খেয়াল হয় নি।

কৈলাস মনে মনে বলে, খেয়াল হয় নি কেন? নিজের বাপটিকে তুমি চেনো না? ছেলেবেলা থেকে তোমার জন্য কতলোক বেত খেয়েছে, তুমি

দোষ করেছ কিন্তু অন্যের আঙুল কাটা গেছে, কতকাল ধরে তোমার বাবা লোকের মাথা ফাটিয়ে ঘরে আগুন দিয়ে আসছে—দুএকটা বছর বাইরে থাকার সময় বাপ আবার নতুন নতুন অত্যাচার চালিয়েছে না শুনলে বুঝি এসব খেয়াল হতে নেই !

কিন্তু মুখে সে কিছু বলে না। তার বাপের জন্য গাঁয়ের লোকের রাগ আর ঘৃণার ভাগ স্বাভাবিক নিয়মে সেও পাবে শুভ এটা মেনে নেবার পর আর কিছু বলা চলে না।

জমিদারের ছেলে হবার বদলে সে যে প্রাণপণে অন্যরকম কিছু হবার চেষ্টা করে আসছে অনেকদিন ধরে, এটাও মনে রাখতে হবে বৈকি !

৩

কৈলাস অ্যান্টনি অ্যাণ্ড কোম্পানির ছাপাখানায় কাজ করে। সকলের ধারণা পেটে তার ইংরাজি বিদ্যা বেশ খানিকটা আছে। শুধু সেকেণ্ড ক্লাশ পর্যন্ত স্কুলে পড়ার বিদ্যা নয়।

বিখ্যাত কালীভক্ত ত্রিভুবন দত্তের আশা ছিল ছেলে তার আপিসের চাকুরে হবে। যার দয়ায় একদিন হয়তো ছোট একটি বাড়িও করবে কলকাতার আশে-পাশে। শেষ জীবনটা ত্রিভুবন কাটাবে সেইখানে। সকাল-সন্ধ্যা মন্দিরের দ্বারে আর গঙ্গাতীরে বসে প্রাণভরে শ্যামাসঙ্গীত গাইবে।

তার গান শোনার জন্য ভিড় করবে শহরের হাজার হাজার শান্তিহীন দুঃখী নরনারী।

ত্রিভুবনের মুখে কালীসঙ্গীত গান শুনতে তখন দশ গাঁয়ের লোক ভেঙে পড়ত। আজকাল বুড়ো হয়ে গলা ভেঙে গেছে।

একটি আমের আঁটি মোড় ঘুরিয়ে দিল বাপের আশার আর ছেলের জীবনের।

সত্যিসত্যি অবশ্য আমের আঁটিটাই নয়।

রূপকথার মত মনে হবে সে কাহিনী। কিন্তু যুগযুগান্তের সংস্কার স্বৈরাচার আত্মধর্ষণের ইতিকথায় সে কাহিনী বাস্তব বৈকি। নবজন্মের সংগ্রাম যায় মধ্যে প্রচ্ছন্ন অন্ধ আবেগ।

শুভ তখন ছোট, বারতলা স্কুলের নীচের ক্লাশের শখের ছাত্র। খুশি হলে স্কুলে আসে, খুশি না হলে আসে না। টিফিনের সময় বোম্বাই আম চুষে আঁটিটা সে ছুঁড়ে মেরেছিল কৈলাসের গায়ে। বিশেষ ভাবে কৈলাস বলে নয়, কৈলাসের উপর তার কোন রাগ ছিল না। কৈলাস কাছে দাঁড়িয়ে তার দুধ সন্দেশ আম ইত্যাদি দিয়ে টিফিন করাটা বেশ খানিকটা কৌতূহলের সঙ্গে চেয়ে দেখছিল বলে। অতটুকু ছেলে, কী কচি আর কোমল মুখখানা, এই সামান্য অপরাধে তার কান মলে লাল করে দেওয়া কী ভীষণ নিষ্ঠুরতা উঁচু ক্লাশের বয়সে বড় ছেলের! কী ভয়ানক অপরাধ।

ঢিল ছুঁড়লে পুলিসের গুলি চালাবার তবু একটা যুক্তি আছে। ঢিল লাগুক না লাগুক, প্রজা ঢিল ছুঁড়লেই পুলিসের প্রেস্টিজ ধূলিসাৎ হয়ে যায়। কিন্তু জমিদারের বাচ্চা ছেলে প্রজার বয়সে-বড় গায়ে-জোরওয়ালা ছেলের গায়ে একটা আমের আঁটি ছুঁড়লে তার গায়ে হাত তোলার কোন যুক্তি বা সমর্থন নেই। অতটুকু কোমল ছেলের গায়ে কতটুকুই বা জোর, দামী খাস বোম্বাই আমের আঁটিই বা হয় কতটুকু!

হেডমাস্টার বীরেন চাটুয্যে কৈলাসকে কয়েকটা বেত মারলেই বোধ হয় ব্যাপারটা চুকে যেত। কিন্তু মানুষটা ছিল কংগ্রেসের সভ্য, ব্রিটিশ রাজের পাহাড়প্রমাণ বীভৎস অন্যায়ের অহিংস প্রতিবাদী। সেই অপরাধেই মাথার উপর তার বরখাস্তের খড়্গ ঝুলছিল।

এদিকে সেই খড়্গটাই আবার ঠেকিয়ে রেখেছিল জগদীশ!

ঠিক একই অবস্থায় তার নিজের ছেলের কান মলে দিলে কৈলাসকে শাস্তি দেবার কথা বীরেন ভাবতেও পারত না, কিন্তু জগদীশের ছেলে শুভর কান মলে রাঙা করে দিয়ে একেবারে রেহাই পাবে কৈলাস, এটাও ভাবা সম্ভব ছিল না।

কিন্তু বেত মারা? না, বেত মারা যায় না। বীরেন ছুটি পর্যন্ত কৈলাসকে বেঞ্চের উপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল।

বেত মারেন নি কেন? আপনাকে লিখিনি অন্য ছেলেদের সামনে বেত মারাই এসব গুণ্ডা ছেলের উপযুক্ত শাস্তি?

আজ্ঞে আমের আঁটি গায়ে ছুঁড়ে মারলে রাগ হওয়াটা স্বাভাবিক।

অগত্যা জগদীশের পক্ষ থেকেই কৈলাসের শাস্তির ব্যবস্থা হয়েছিল। এবং বীরেনকে শায়েস্তা করারও।

কৈলাসের শাস্তির ব্যবস্থা করেছিল নায়েব কালীচরণ। বীরেনের দায়টা নিয়েছিল জগদীশ স্বয়ং।

রক্তবমি করে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল কৈলাস।

দশজন ছেলের সামনে কৈলাস জগদীশের ছেলের গায়ে হাত তুলতে সাহস করেছে, ছেলেদের সামনেই তার শাস্তি পাওয়া উচিত।

পরদিন টিফিনের সময় কালীচরণ স্কুলে গিয়ে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে শাস্তি দিয়েছিল।

খবর পেয়ে ত্রিভুবন ছুটে যায়। যেতে যেতেই সব ব্যাপার শোনে। স্কুলে গিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছেলের নিস্পন্দ দেহের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে শ্যামাসঙ্গীত ধরে দেয়।

গান গাইতে গাইতে দু-চোখ দিয়ে জল পড়ে, কিন্তু গলা কী ত্রিভুবন দত্তের! হঠাৎ গান থামিয়ে ছেলের দেহটা দু-হাতে বুকে জড়িয়ে ধরে সে হাঁক ছাড়ে, জয় মা চামুণ্ডে! জয় মুণ্ডমালিনী!

ছেলেকে বুকে করে দৃঢ়পদে সে গিয়ে হাজির হয় স্বয়ং জগদীশের বাড়ির লাগাও তারই বাপের প্রতিষ্ঠিত কালীমন্দিরের চত্বরে। মন্দিরের দরজার সামনে ছেলেকে শুইয়ে দিয়ে যোগাসন করে বসে গান ধরে দেয়।

সব বাছা বাছা কালীসঙ্গীত একে একে গেয়ে চলে।

প্রথম গানটাই ধরে কালী মির্জার—

প্রসীদ পরমেশ্বরি, অধীন দীনে।
ঘুচাও দুর্গতি সতি গতিবিহীনে॥
কংসারে নিশুম্ভারে, বারণারে ত্রিপুরারে,
এ-দুস্তরে কে নিস্তারে মা তোমা বিনে॥
তুমি পুরুষ প্রকৃতি, তুমি সৃষ্টি, তুমি স্থিতি,
হয়, লয় হয় তব কটাক্ষেরি কোণে;
ও পদ আপদ পদ, আমার ঘোর আপদ,
কালিকে রাখ চরণে॥

সে তো গান করা নয়, সোজাসুজি প্রার্থনা জানানো যে, তুমি কত দৈত্যদানব বধ করেছ—আরেক দানবকে শাস্তি দাও!

মন্দিরের বুড়ো পুরোহিত বলে, একি করছ দত্ত?

ত্রিভুবন বলে, এই ধন্না দিলাম। এ-অন্যায়ের প্রতিকার না হলে বাপ-ব্যাটায় এইখানে দেহত্যাগ করব।

দেখতে দেখতে লোকারণ্য হয়ে যায় মন্দির-প্রাঙ্গণ। শুভর মার বুক ঢিপ ঢিপ করে। জগদীশেরও বুক কাঁপে।

খবর পেয়ে আসে তান্ত্রিক ভট্টাচায। বলে, ছি, ত্রিভুবন, একি ছেলেখেলা শুরু করেছ? মায়ের কাছে প্রতিহিংসা চেয়ে এত দিনের সাধনা নষ্ট করবে? তুমি তো আসলে ভক্ত নও মায়ের! তুমি বলে দেবে তবে মা ন্যায়অন্যায়ের বিচার করবেন? মার নিজের বিচার নেই?

আবার বলে, তোমার ছেলে অপরাধ করেছে, শাস্তি পেয়েছে। সেটা যদি কারো অপরাধ হয়, মহামায়া নিজেই বিচার করবেন। তুমি কেন মহাপাপ করবে? যাও ছেলেকে নিয়ে বাড়ি যাও। আমি বলে দিচ্ছি, জগদীশের গাড়ি তোমাদের দিয়ে আসবে।

কিন্তু আর কি তখন পিছোবার উপায় আছে! মানুষের ভিড় জমে গেছে চারিদিকে তাদের ঘিরে, উৎসুক উত্তেজিত নরনারী জেনে গিয়েছে সে কি পণ

করে ধন্না দিয়েছে মায়ের দুয়ারে। মনে খটকা লাগলেও তর্কে আর পরাজয় মানা যায় না।

ছেলেমানুষ শুভ এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করে। তারও কৌতূহলের সীমা নেই। ব্যাপারটা পরিষ্কার ধারণা করতে না পারলেও সে বুঝেছে এ-ব্যাপারে সেও জড়িত।

হঠাৎ জনতার কলরবকে ছাপিয়ে ওঠে তারই গলার তীক্ষ্ণ আর্তনাদ। ভিড়ের মধ্যে টেনে নিয়ে কে একজন তার বাঁ হাতটা এক মোচড়েই ভেঙ্গে দিয়েছে।

জগদীশ তখন বাড়িটা সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা নিয়ে ব্যস্ত হয়েছিল। শুভর মা ইতস্তত করছিল, নিজে এসে ত্রিভুবনের পায়ে ধরে অনুনয়-বিনয় করে তাকে শান্ত করবে কিনা। ভক্তের কাতর আবেদন মা-র কতক্ষণ সহ্য হবে? মা ক্রুদ্ধ হলে কি সর্বনাশ হবে কে জানে! তার চেয়ে মানসম্ভ্রম বিসর্জন দিয়ে—

এমনি সময় চাকরের কোলে চেপে ভাঙ্গা হাতের যাতনায় চিৎকার করতে করতে শুভ অন্দরে এল।

সর্বনাশ! মা তবে রেগেছেন! ভক্তের মান রাখতে সক্রিয় হয়েছেন! শুভর মা আর দ্বিধা করে না, কোন দিকে না তাকিয়ে ছেলেকে কোলে নিয়ে পাগলিনীর মত মন্দিরে ছুটে যায়।

ভিড়ের মধ্যে তার জন্য পথ হয়ে যায় আপনা থেকেই। ত্রিভুবনের পায়ের কাছে ছেলেকে নামিয়ে দিয়ে শুভর মা আর্তকণ্ঠে বলে, রক্ষা কর বাবা, ছেলের আমার একটা হাত গেছে, এতেই সন্তুষ্ট হও।

শুভর মুচড়ে বাঁকানো হাতটা কালচে মেরে এসে ফুলে উঠেছিল। ত্রিভুবন বিস্ফারিত চোখে সেদিকে তাকিয়ে থাকে। মুখ তার এমন বিবর্ণ হয়ে যায় যেন কেউ কালি মাখিয়ে দিয়েছে।

এ প্রতিকার তো সে কামনা করেনি। এতটুকু ছেলের এই শাস্তি সে তো চায়নি। ত্রিভুবন যেন ঝিমিয়ে নিতে যায়, ভীত হয়ে ওঠে। নিজের কাছে নিজে সে অপরাধী পাষণ্ড হয়ে যায়।

তাকেই যেন শাস্তি দেওয়া হয়েছে তার প্রার্থনা পূর্ণ করে!

দেবেন বলে, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে ত্রিভুবন?

মন্দিরের ভিতরে মূর্তির দিকে চেয়ে ত্রিভুবন আর্তকণ্ঠে বলে, আমায় ভুল বুঝলি মা?

কৈলাসের তখন একটু একটু জ্ঞান ফিরে আসছে। এত বড় ছেলেকে ত্রিভুবন অনায়াসে বুকে করে বয়ে এনেছিল, এবার যেন তাকে কোলে তুলবার শক্তি সে দেহে খুঁজে পায় না।

কৈলাসকে শাস্তি দেবার প্রত্যক্ষ ব্যবস্থাটা করেছিল নায়েব কালীচরণ। গোরুর গাড়িতে কৈলাসকে নিয়ে ত্রিভুবনের বাড়ি ফেরার ব্যবস্থাও সেই করে দেয়।

ততক্ষণে প্রাথমিক একটু চিকিৎসার পর ছেলেকে নিয়ে মোটরগাড়িতে জগদীশ কলকাতা রওনা হয়ে গেছে।

স্থানীয় দুই কুঠরির হাসপাতাল নামেই আছে। অসংখ্য স্থানীয় রোগী আর দেশের বিরাট ব্যাপক মুক্তি আন্দোলনকে ভাঁওতা দেবার জন্য নামমাত্র সরকারী ব্যবস্থা। ভাঙ্গা হাড় জোড়া লাগাতে এক; এদিক-ওদিক হলে ছেলে তার সারা জীবন তাই নিয়ে ভুগবে।

কিন্তু শুভর হাতটা এমনভাবে মুচড়ে দিল কে?

শুভ বলে, একজন কালো ধুম্‌সোপানা লোক!

অনেক খোঁজা-খুঁজি করেও কালো ধুমসো-পানা লোকটির পাত্তা মেলে নি। হয়তো এইজন্যই মেলে নি যে শুভর চোখে কালো ধুম্‌সো-পানা দেখাবে এরকম ঢের লোক বারতলাতেই আছে।

দেবেন বলেছিল, কার খোঁজ করছ। সে কি এই পৃথিবীর মানুষ? দেবীর আজ্ঞা পালন করতে দেহধারণ করেছিল, আবার কোন্ শূন্যে মিশে গেছে…।

শুনে কালীচরণ আর দেরি করে নি। তার মুখেও কে যেন কালী মাখিয়ে

দিয়েছিল, ভয়ার্ত চোখ দুটি পিটপিট করছিল। জাতে সে ব্রাহ্মণ বলেই এতক্ষণ কোনরকমে নিজেকে সামলে রেখেছিল। এবার সোজা ত্রিভুবনের বাড়ি গিয়ে তার পা চেপে ধরে বলেছিল, আমায় মাপ করুন দত্ত মশাই!

সেইখানেই ইতি হয় নি ঘটনার।

মাটির পৃথিবীর বাস্তবজীবনে যুগ-যুগান্তের বিশ্বাস ও সংস্কারের জের টানা যে ঘটনায়, এত সহজেই কি তার সমাপ্তি ঘটে।

বাস্তব জগৎ আর জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন পৃথক তো নয় হৃদয় আর মগজের কোষে কোষে জড়ানো জীবনে শিকড় গাড়া বিশ্বাস আর ধারণা।

শুভর কচি হাড় সহজেই জোড়া লেগেছিল। হাতটা শুধু তার একটু বাঁকা হয়ে আছে। এ হাতে জোরও পায় কম।

ত্রিভুবনের প্রাণে বিঁধেছিল শেল। আজও তার জের চলছে অন্য ভাবে। কৈলাসের জীবনের গতিই ঘুরে গিয়েছে অন্য দিকে।

অশান্ত উন্মনা হয়ে থাকে ত্রিভুবন। শ্যামাসঙ্গীত ধরতে গেলে কে যেন তার গলা চেপে ধরে। গলা দিয়ে অন্নজল নামতে চায় না। রাত্রে ঘুম হয় না।

কৈলাস সুস্থ হয়ে উঠেছে। কিন্তু কী এক সংশয় আর আতঙ্কে যেন অস্থির উন্মাদ হয়ে উঠেছে ত্রিভুবন। ছেলের দিকেও সে ফিরে তাকায় না।

একদিন সে দেবেনের কাছে ছুটে যায়।

দেবেন বলে, তখনি তোমায় বলেছিলাম ত্রিভুবন!

মায়ের সে ভক্ত তাতে সন্দেহ কি! মা সঙ্গে সঙ্গে অমনভাবে সাড়া দিলেন সেটাই তো সবচেয়ে বড় প্রমাণ যে সে মায়ের ভক্ত! প্রাণের জ্বালায় গিয়ে ধন্না দিল, সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হাত মুচড়ে ভেঙে দিল তার ছেলেকে যে প্রহার করেছিল তার ছেলের হাত।

কিন্তু ভক্ত কি এরকম কাজে লাগায় মায়ের উপর তার ভক্তির দাবি? ভক্তি দিয়ে কি মায়ের সাথে ব্যবসা করে ভক্ত?

যাক্, প্রায়শ্চিত্ত কর। মা আবার প্রসন্ন হয়েছেন।

প্রায়শ্চিত্তের বিধানও দেবেন দিয়েছিল। অর্থাৎ দেবেন তাকে দিয়ে যথাবিধি তার প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে দেবে।

কিন্তু আনুষ্ঠানিক প্রায়শ্চিত্তে ত্রিভুবনের মন ওঠেনি। সে তো যোগী নয়, সন্ন্যাসী নয়, পূজা-অর্চনা-সাধনার এক নিয়ম ভঙ্গ করে সে তো মাকে বিদ্রূপ করেনি যে আরেক নিয়মে প্রায়শ্চিত্ত করলেই তার প্রতিকার হবে।

তারপর নাকি স্বপ্নে প্রায়শ্চিত্তের নির্দেশ এসেছিল।

এক বছর ত্রিভুবন কৈলাসের মুখ দেখবে না। জীবনে কোনদিন ছেলের রোজগার ভোগ করতে পারবে না।

ঠিক। শাস্তি বললে শাস্তি, পুরস্কার বললে পুরস্কার। এই তো দরকার ছিল তার। বড় বেশী মায়া জন্মেছিল ছেলের উপর, বড় বেশী আশা করছিল ছেলেকে মানুষ করে তার রোজগার ভোগ করে সুখ পাবার!

পুরো এক বছর কৈলাস মামারবাড়ি ছিল। তারপর এলোমেলো উল্টো-পাল্টা জীবন। শেষে কম্পোজিটারি শিখে এই কাজে ঢুকেছিল।

আজও ত্রিভুবন তার উপার্জনের একটি পয়সা ছোঁয় না, তার কেনা কোন জিনিস ব্যবহার করে না, ফলটুকু পর্যন্ত খায় না; তার পয়সায় কেনা খড়ে ছাওয়ানো চালের ঘরে বাস পর্যন্ত করে না। নিজের জন্য একটি পৃথক ছোট ঘর সে করে নিয়েছে।

মা আছে, ভাইবোন আছে কৈলাসের। বিয়ে করেছিল,—লক্ষ্মীর চেষ্টায় লক্ষ্মীরই একটি খুড়তুতো সম্পর্কের বোনকে।

সুন্দর টুকটুকে পুতুলের মত ছিল মেয়েটি—কার সাধ্য আছে মায়া না করে পারে? বিয়ের ছমাসের মধ্যে সাপের কামড়ে কৈলাসের কচি বৌটি মারা যায়।

তারই বাপের বাড়ির অনেক দিনের জানাচেনা এক রকম পোষা বাস্তু সাপ! পায়ের পাশ দিয়ে হেঁটে গেলেও কামড়ায় না।

কিন্তু অসাবধানে লেজ মাড়িয়ে দিলে যদি ছোবল দেয়, পোষা সাপের কি দোষ?

শুধু ওঝা নয়, ওঝা ডাকা হয়েছিল শুধু নিয়ম রক্ষার জন্য, পাশকরা ডাক্তার আনিয়েই চিকিৎসা করানো হয়েছিল। কিন্তু দূর থেকে তাড়াহুড়ো করেও ডাক্তার আনতে যত সময় লাগে এ সাপের বিষ তার মধ্যেই বাগিয়ে নেয় মানুষকে।

বৌকে পুড়িয়ে ফিরবার আগে কৈলাস সেই অপরাধী সাপটি এবং তার সঙ্গে আরও একটি সাপকে মেরে এসেছিল।

কেউ আপত্তি করেনি!

একটু উদাসীন নিস্পৃহ মনে হয় মানুষটাকে। গা-ছাড়া ভাব নয়, একটু বেপরোয়া রকমের নির্বিকার ভাব—কিছুতেই যেন কিছু আসে যায় না। মনে হয়, মানুষটা বুঝি কথাও কম কয়। চুপচাপ গম্ভীর হয়ে থাকে না, দশজনের সঙ্গে হাসি-গল্পে মেতে যেতে তার কিছুমাত্র কার্পণ্য নেই। তবু অনেক হাসি কথা আলাপ আলোচনার পর রীতিমত অস্বস্তির সঙ্গে মনে হয় নিজেকে সে যেন একেবারে চেপে গিয়েছে, কমবেশী সকলেই নিজেকে প্রকাশ করেছে, তার আসল স্বরূপটির এতটুকু হদিস মেলেনি।

সাধারণ মানুষ, সাধারণ চালচলন, সাধারণ কথাবার্তা—তার আবার স্বতন্ত্র আসল স্বরূপ কি থাকতে পারে? রহস্যময় গোপন জীবনও তার নেই। কলকাতায় তার ঠিকানা অনেকেই জানে। গলির মধ্যে পাকা ভিতের উপর লম্বা একটা দোতলা কাঠের বাড়ি, চাল টিনের। দোতলায় পাশাপাশি ছোট ছোট খোপের মত অনেকগুলি ঘর, সামনে সরু লম্বা রেলিং-দেওয়া বারান্দা। ওরই একটা ঘরে সে থাকে; নিজে রান্না করে খায়। নীচে সামনের দিকে গোটা তিনেক ছোট দোকান আর বিড়ির পাতা ও সুখা তামাকের গুদাম আছে। ভিতরে বহু পুরানো একটি ট্রেডল মেশিন নিয়ে ছোট একটি ছাপাখানা।

আসলে, পাঁচজনের কাছে কৈলাসের দাবিদাওয়া বড়ই কম, এক রকম নেই বললেই হয়! সংসারে বন্ধুও বন্ধুত্ব চায়, আদায় করে চলে। পাঁচজনের খাতির ভালবাসাটা মানুষ সুখের ভাবে। যাকে অপছন্দ হয়, যে আঘাত করে, তাকে হিংসা করার তুচ্ছ করার একটা আনন্দ আছে। সংঘাত আর আত্মীয়তা, বিরোধ আর ভালোবাসা, এই নিয়ে তো সম্পর্ক সংসারে। নিজের নিজের স্বার্থ আর স্বভাব অনুসারে মানুষ এই সম্পর্ক ভেঙেগড়ে উল্টেপাল্টে নিজের মনের মতো করে নেবার অক্লান্ত চেষ্টায় মেতে থাকে—নানা মানুষের সাথে নানা সম্পর্কের জটিল বিচিত্র জীবন মসৃণ হোক, সুন্দর হোক, আনন্দময় হোক।

এ কোন কঠিন বা জটিল জীবনদর্শন নয়। মূর্খ চাষাও মুখে প্রকাশ করতে না পারুক বেঁচে থাকার এই ধর্মটা অনুভব করে। ভাই বল বন্ধু বল মা বোন মাগ বল আর দোকানী মহাজন পুলিস পেয়াদা জমিদার বল সবার সাথে যার যেমন তার তেমন কারবার করে চলাই তো সম্পর্কের টানাপোড়েন।

এক হাতে তালি বাজে না গো। না পীরিতের তালি, না লাথি মারার।

লক্ষ্মী কিছু কিছু বুঝতে পারে কৈলাসের ব্যাপার। বুঝতে পারে, শত্রু-মিত্র কারো সঙ্গেই নিজেই দরকারমত সম্পর্ক গড়বার এই চেষ্টাটুকু তার নেই। সে বন্ধুর কাছেও প্রত্যাশা করে না আরেকটু ঘনিষ্ঠতা, শত্রুর কাছেও আশা করে না একটু কম শত্রুতা।

তাই, সেদিন কুয়াসার রাত্রে তার সঙ্গে নিরিবিলি কথা বলার সুযোগ পাওয়ার হিসাবে রাস্তার ধারে তার জন্য কৈলাসের দাঁড়িয়ে থাকা লক্ষ্মীর কাছে এক মহাবিস্ময়কর ব্যাপার।

দেখা হয়, কথা হয়। দেশ-গাঁর বিপদের কথা এত প্রাণ খুলে এমন আগ্রহের সঙ্গে আর কারো সঙ্গেই হয় না, তাদের দুজনার যেমন হয়। সুখ-দুঃখ ঘর-কন্নার কথাটা যতটা আপন হয়েছে জানান দেয় তার বেশী কখনো কোনদিন জানতে চায় না কৈলাস।

মন জানাজানি হতে কি আর দেরি হয়েছিল তাদের? কোনদিন কোন

ছলে কখনো কৈলাস দাবি করেনি যে ও রকম জানাজানি নয়, সোজাসুজি একটু স্পষ্টাস্পষ্টি জানাজানি হোক।

বরং মাঝে মাঝে ধানের শীষের দুধটুকুকে ঘন ফসলের দানা বাঁধতে দেবার অবসর সময়ে অলস দুপুরে চাষীর মেয়ে লক্ষ্মীর মনটা জ্বালা করেছে যে, মানুষটা কি! একদিন হাতটাও চেপে ধরতে পারে না আপন ভুলে? বলতে পারে না, আমি তোমায় চাই?

কয়েক মুহূর্তের দিবাস্বপ্নের ঘোর কেটে যেতে নিজেই আবার লজ্জাবোধ করেছে লক্ষ্মী। তার স্থায়ী আতঙ্ক মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।

হাত ধরে কোন লাভ নেই, আবেগভরে আমি তোমায় চাই বলে কোন লাভ নেই, এটা জেনেই তো কৈলাস চুপচাপ আছে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস।

তাই না তার এত স্বস্তি। তাই না তার এত ভাল লাগে মানুষটাকে, এত মায়া হয়।

সে জানত কেন ভয়ে তার মন শক্ত হয়ে যায় কৈলাস নিশ্চয় সেটা আন্দাজ করেছে। কৈলাসের নিজেরও হয়তো ওই একই আতঙ্ক হয়।

একটু ঢিল দিলেই তারা আর সামলাতে পারবে না।

একদিন সংযম হারালেই ভেঙ্গে যাবে হৃদয়মনের সমস্ত বাঁধ। সমাজসংসার তুচ্ছ হয়ে যাবে তাদের কাছে। অন্য সমস্ত কিছু বিসর্জন দিয়ে জগৎ-সংসার ভুলে গিয়ে তারা শুধু মেতে থাকবে পরস্পরকে নিয়ে, মশগুল হয়ে থাকবে।

আশেপাশের কয়েক জোড়া মেয়েপুরুষের বেলা যেমন হয়েছে তার চেয়েও জোরালো হবে। কারণ, তারা বহুদিন প্রাণপণে চেপে আসছে কামনা আর উন্মাদনা।

কল্পনা করলেও রোমাঞ্চ হয়, সর্বাঙ্গেই শিহরণ বয়ে যায়।

কিন্তু রোমাঞ্চ আর শিহরণ হলেই তো হয় না। ও তো ফুরিয়ে যায় চোখের পলকে।

কদিন তারা মেতে থাকতে পারবে ওভাবে পরস্পরকে নিয়ে? কতদিন

স্থায়ী হবে তাদের দুর্দান্ত উন্মাদনা? কদিন টিঁকবে তাদের শুধু পরস্পরকে নিয়ে মেতে থাকার সুখ?

ঘরের কোণের লাজুক মেয়ে বৌ সরল পাগল প্রেমিকের সঙ্গে সব তুচ্ছ করে বেরিয়ে গিয়ে ঘরই তো বাঁধতে চায় এই বিরাট সংসারের অন্য আরেকটা কোণ খুঁজে নিয়ে।

সংসারের বাস্তবতা দুদিনে শুকিয়ে দেয় তাদের ভালবাসা, চুরমার করে ভেঙে দেয় তাদের স্বপ্নের মত ক্ষণস্থায়ী সুখের জীবন।

তারা তো দুজনেই ঘা-খাওয়া পোড়-খাওয়া ঘাগী মানুষ সংসারের। কদিন টিঁকবে তাদের বেহিসেবী প্রেম?

কল্পনা করেও লক্ষ্মী শিউরে ওঠে!

সে জানত কৈলাস এটা জানে, কৈলাস বোঝে যে বাঁচতে হবে অনেকদিন, দুদিনের জন্য পাগল হবার উগ্র আনন্দের জন্য সমস্ত জীবনটা নষ্ট করা বিষাক্ত করা শুধু ছেলেমানুষি নয়, বোকামিও বটে।

তাই সেদিন রাত্রে কৈলাসের অধীরতার মানেই বুঝতে পারে না লক্ষ্মী। একা সে লোচনের বাড়িতে রয়ে গেছে শুধু এইটুকু জেনে যদি সে একাই ঘরে ফেরে এই আশায় তার জন্যে অপেক্ষা করা!

এত অন্যায় জগতে, তার মধ্যে কেবল তারা কেন মিলতে পারবে না এই অন্যায়টুকুকে সবচেয়ে বড় করে তুলে জগৎসংসার তুচ্ছ করে তার হাত চেপে ধরা!

মানুষটা নিজেকে সামলে নিয়েছিল অনায়াসেই। সেটা অদ্ভুত ব্যাপার কিছু নয়। গভীর রাত্রে নির্জনে তাকে একা পাকড়াও করতে পেরেছে বলেই তার বিনা অনুমতিতে হাত ধরার বেশী কি এগোতে পারে কৈলাস!

কিন্তু মনটা খুশী নয় লক্ষ্মীর।

কে জানে কি নিয়ম জীবন আর জগতের। কুয়াশা কেটে চাঁদ উঠেছিল। অনেক কথা বলার পর সে গলা জড়িয়ে বুকে মাথা রেখেছিল কৈলাসের।

তারপর অবশ্য জীবনের সন্ধানে পুলিশ গ্রাম ঘিরে ফেলতে যাওয়ায় নিজেদের ছিনিয়ে তারা ঘরে ফিরেছিল।

জীবনের খোঁজে পুলিস না এলে সে রাত্রে কি ঘটত ?

যেদিন লোচনের পা খোঁড়া হয়েছিল গুলিতে, সেইদিন জমিদার গণেশ সর্বনাশ করেছিল লক্ষ্মীর। মাথায় রিভলবার ঠুকে তাকে অজ্ঞান করে।

সেদিন পর্যন্ত লক্ষ্মীর ধারণা ছিল না যে কোন মেয়েমানুষ সায় না দিলে কোন পুরুষ তাকে ভোগ করতে পারে।

কৈলাস যদি না দীর্ঘ দিন ধরে প্রমাণ দিত যে পুরুষমানুষও মানুষ হয়, প্রাণের জ্বালায় নিষ্ফল আক্রোশে বিকারের তীব্রতায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত লক্ষ্মীর জীবন—তাকে নিয়ে হয়তো ছিনিমিনি খেলত কয়েকটি মানুষ।

কৈলাস তার মনুষ্যত্বে বিশ্বাস ফিরিয়ে এনেছে।

বড়ই মায়া হত লক্ষ্মীর। সারা দেশের হর্তাকর্তাবিধাতাদের পোষা একটা পশু ইচ্ছা জাগা মাত্র বন্দুকধারী পাহারা দাঁড় করিয়ে নরকের বাসর রচনা করে অনায়াসে তাকে ভোগ করল—আর এ বেচারী স্রেফ মনুষ্যত্বের খাতিরে তার মানসিক সায় পেয়েও হাতটা চেপে ধরে তাকে বিব্রত করে না।

লক্ষ্মী নিজেই উদ্যোগী হয়ে সুন্দরীর সঙ্গে কৈলাসের বিয়ে দিয়েছিল।

কৈলাস শুধু বলেছিল, বিয়েটিয়ে করে সুখ পাব কি ?

লক্ষ্মী বলেছিল, কেন পাবে না ? সুখ কি বাজারে সের দরে বিক্রি হয় ? দশজনে করছে তুমিও সংসার করো। সংসার ছাড়া ছিষ্টিছাড়া সুখ খুঁজো না।

এতকাল পরে সেই সুখ কি খুঁজেছিল কৈলাস কুয়াশার রাতে ?

একটা কথা বলা দরকার ভেবে পরের রবিবার সকালবেলাই লক্ষ্মী তার খোঁজে যায়। তামাক পাতা এবার ভাই-এর মারফত পাঠিয়েছে কেন সেটাও জিজ্ঞাস্য ছিল।

বাড়ির লাগাও তরকারির ক্ষেতে কৈলাস কাজ করছিল। সপ্তাহে একদিন

মাত্র সে তরকারি-ক্ষেতের যত্ন নেয়। কিন্তু তা নেয় বলেই সারা সপ্তাহ ধরে বাড়ির লোকের যত্ন নেবার উৎসাহ বজায় থাকে। অযত্ন দেখে যদি রাগ করে কৈলাস!

গেলে না যে কাল?

কি হবে গিয়ে?

বেশ তো! শেষে এই বুদ্ধি হল?

কৈলাস হাসে! গোড়া খুঁড়ে কটা মুলো তুলতে তুলতে বলে, তোমার যন্ত্রনা বাড়িয়ে লাভ কি?

ও, দরদ বেড়েছে! সেদিন রাতে তোমার কী হয়েছিল সত্যি বলবে?

মনটা বড় খারাপ ছিল।

জিজ্ঞাসা করতেই জবাব। টালবাহানা নেই, একথা সেকথা নেই? লক্ষ্মী ঠোঁট কামড়ায়। এ মানুষটার মন খারাপ হতে পারে এসব যেন তারও হিসেবের বাইরে ছিল।

ঠিক সিঁথির নীচে কপালে লক্ষ্মী একটা আঙ্গুল ঘষে। ওইখানে রিভলভারের বাঁট ঠুকে গণেশ তাকে অজ্ঞান করেছিল। আজও মাঝে মাঝে ওখানটা টনটনিয়ে ওঠে।

কৈলাস মুলো কটা বাড়িয়ে দিলে সে পাতাগুলি মুঠো করে ধরে বলে, এমনি মন খারাপ? না, বিশেষ কিছুর জন্যে?

কৈলাস ধীরে ধীরে বলে, সেই জন্যে, আবার কিসের জন্যে। আজও কিছু ঠাহর পেলাম না তো আর কবে পাব। এটায় হবে না ওটায় হবে না করেই দিন গেল,—হবে কিসে জানতে জানতে কি চিতেয় উঠব শেষে?

শুনলে মনে হবে, কৈলাস বুঝি আপসোস করছে যে তার আর লক্ষ্মীর কোন উপায় হল না, দিন গড়িয়ে গড়িয়ে জীবন ফুরিয়ে এল। লক্ষ্মীর ভুল হয় না। সে এই আপসোসের ইতিহাসও জানে, মানেও বোঝে। সবটা বোঝে না, খানিক খানিক।

শহর আর গাঁয়ের নানা আন্দোলনে সে যোগ দেয় প্রাণের তাগিদেই কিন্তু

দোমনা ভাবটা নাকি তার ঘোচে না। সে বুঝে উঠতে পারে না কিসে আর কিভাবে কি হবে। উৎসাহ তার ঝিমিয়ে আসে—মনটা বড়ই ব্যাকুল হয়ে পড়ে। নানা কথা নানা মত শুনতে শুনতে বিহ্বল হয়ে যায়। না জেনে না বুঝে অন্ধের মতো কাজ করতে পারে কেউ? শুধু বুকের জ্বালা সম্বল করে? আর পাঁচজন লড়ছে,—শুধু এই উৎসাহ নিয়ে? কেউ যদি সহজ সরল ভাবে তার বোধগম্য করে দিত ঠিক কিভাবে শতরকমের দুর্দশা ঘুচবে মানুষের? কিন্তু কে কার কৈফিয়ত চায়, কে বুঝতে চায় কার মন! ওজনওয়ালা মানুষ, দশজনের বিশ্বাসওলা প্রভাবশালী কত মানুষ প্রাণটা আকুল করে শত প্রশ্ন আর খটকা তুলে সরে গেল, ফিরে চাওয়াও দরকার মনে করে না কেউ—তুচ্ছ সাধারণ কৈলাসের জন্য কে মাথা ঘামায়।

লক্ষ্মী ছাড়া চেনা জানা কেউ একজন একদিন একটু কৌতূহলের বশে শেষ পর্যন্ত জানতে চায়নি, কি ভাবছে কৈলাস, প্রাণটা তার কেন আর কিসে টনটন করছে!

নন্দ পর্যন্ত নয়!

লক্ষ্মী বলে কি ভাবছ? নতুন কথা কিছু ভাবছ না কি?

কৈলাস বলে, হাঃ, নতুন কথা ভাবতে পারলে আর ভাবনা ছিল? ওই তো মন্দ কপাল। মরে আছি তো ওই জন্যে। আমি শালার সাধ্য আছে ভেবে ভেবে ভাবনার কূলকিনারা পাই? কূল মেলাবার মানুষ মিলল না একজন!

লক্ষ্মীও নিশ্বাস ফেলে। কিন্তু আশ্বাস দিয়ে বলে, মিলবে। না মিলে কি যায়? একলাটি তোমার তো নয়, এত মনিষ্যির প্রাণ চাইছে সে কি আর মিছে হবে? দশজনার প্রাণের টানে ভগবানকে পর্যন্ত নামতে হয় না পৃথিবীতে?

একটু থেমেই বলে, কাজ কর না একটা? জীবনবাবু মিটিং করতে চাইছে সেই থেকে, মোদের ডাক্তারকে ধরেছে চেপে। ডাক্তারের বুঝি মন নেই,

এড়িয়ে যাচ্ছে কথাটা। গা লাগিয়ে কর্‌লাও না মিটিংটা আর রোববার? কলকাতা থেকে দু-চারজনকে নিয়ে এস?

মিটিং? তা মিটিং একটা হলে ক্ষতি নেই। মিটিং-এর অভাব অবশ্য কৈলাস বোধ করে না, সে কলকাতায় থাকে। তার আসল অভাব মেটে না ওসব মিটিং-এ, তার ভাবনার একটা কিনারা মেলে না,—তার পথ কি, তার কি করা উচিত। বলছে অনেকে অনেক কথা, প্রাণে লাগছে কৈ—একেবারে মর্মে মর্মে জানছে কৈ যে হ্যাঁ, ঠিক, এই তো আসল কথা!

অনেক দিন আগে ওই জীবনের বক্তৃতা শুনে যেমন জলের মতো সোজা হয়ে যেত স্বাধীনতা আদায় করার কথা, প্রাণটা সায় দিয়ে লাফিয়ে উঠত।

তবে এটা হবে গাঁয়ের মিটিং। হয়তো এখানে বক্তৃতা হবে ভিন্ন রকম। দশবার শোনা কথা জানা কথা আরও একবার জটিল করে না বলে সহজ করে আসল কথা বুঝিয়ে দেওয়া হবে।

হয়তো তারও এই যন্ত্রণাদায়ক অবস্থার অবসান হয়ে যাবে।

নন্দ বলে, মিটিং? তুমি তো হালচাল জানো ভাই। মিটিং ডাকার কথা হয়েছে। জীবনবাবু চাইছেন, ওঁর জন্যেই একটা মিটিং ডাকা হোক। তিনি সব সমস্যা নিয়ে তাঁর মত বলবেন। শুভ বলছে, জীবনবাবুকে সভাপতি করে একটা মিটিং ডাকা হোক, আলোচনার বিষয় হোক আমাদের পররাষ্ট্র-নীতি কি ভাবে শিল্পোন্নতি ঠেকাচ্ছে। লোচনেরা বলছে, ফসল কাটার বেশী দেরি নেই, ধানের দর ঠিক করা, গায়ের জোরে ধান সীজ করা এ সব বিষয়ে চাষীরা কি করবে তাই নিয়ে মিটিং হোক। জীবনবাবু সভাপতি হলে আপত্তি নেই। গজেনেরা বলছে, বিষ্ণুদাকে অভ্যর্থনা জানানোর মিটিং হোক—সেখানে যার যে বিষয়ে খুশি বলবেন। জীবনবাবু যদি রাজী হন, তিনিই সভাপতি হবেন, বিষ্ণুদা হবেন প্রধান অতিথি।

বিষ্ণুদা ছাড়া পেয়েছেন? এদিকে আসবেন কবে?

দু-একদিনের মধ্যেই।

কৈলাস খানিক চুপ করে থেকে বলে, তা ডাক্তার, তুমি নিজে কোন্ মিটিং ডাকতে চাইছ?

নন্দ হেসে বলে, আমি ভাবছিলাম আরেকটা শাস্তির মিটিং ডাকলে ভালো হয়। গতবারের সভা খুব জমেছিল।

শুভ সিগারেট কেস ফেলে গিয়েছিল। তা থেকে নন্দ কৈলাসকে একটা সিগারেট দেয়। সিগারেট টানতে টানতে কৈলাস বাইরে চেয়ে থাকে।

গাঁয়েরও ছুটির চেহারা আছে রবিবারের। স্কুল বন্ধ, পোস্টাপিস বন্ধ, সদরের আপিস-আদালত বন্ধ। কৈলাসের মতই যারা দু-পাঁচজন পেটের ধান্দায় সারা সপ্তাহ বাইরে থাকে, তারা গাঁয়ে এসেছে। তক্তাকাটা ব্যাট আর রবারের বল দিয়ে স্কুলের কয়েকজন ছেলে মাঠে ক্রিকেট খেলছে। চক্রবর্তীর দাওয়ায় তাসের আসরটা বেশ জমাট। কিছু তফাতে নারান পোদ্দারের দালান বাড়ির ঘর থেকে ভেসে আসছে রেডিওতে ছুটির দিনের একপেশে খবর আর গান। এ রেডিও রোজই বাজে। ডোবায় মেয়ে-বৌ বাসন মেজে অর্ধ উলঙ্গ হয়ে নাইতে নাইতে একপেশে একঘেয়ে বক্তৃতা আর হরেক রকম সুন্দর মার্জিত গান শোনে।

কৈলাস বলে, ডাক্তার, সব রোগ সারিয়ে দেয় এমন ওষুধ আছে তোমাদের?

নন্দ বলে, আছে। একটা কেন অনেক আছে। এক ডোজে ভব-যন্ত্রণা ঘুচে যায়! সায়ানাইড, স্ট্রীকনিন, মরফিয়া—

কৈলাস উৎসাহের সঙ্গে বলে, তাই করা যাক।

নন্দ আশ্চর্য হয়ে বলে, কী ব্যাপার কৈলাসদা? কী বলছ তুমি?

কৈলাস হেসে বলে, না না, ও কথা নয়। একটা কথা ভাবছিলাম। এমনি মিটিংটা আগে না ডেকে, যারা পাঁচ রকম মিটিং চাইছে তাদের একটা মিটিং করা যাক। কিসের মিটিং করা উচিত, তাই নিয়ে মিটিং। চাষীদের অবস্থা সত্যি বড় কাহিল দাঁড়িয়েছে। ফসল তোলা তক্ একটু সামাল না দিলে বেশ

কয়েকটা নিকেশ হবে। ধরণী একধার থেকে গলা কাটছে। জীবনবাবুদের বলেকয়ে যদি রাজী করানো যায়—

নন্দ মাথা নাড়ে, সভায় শুধু গবর্নমেন্টকে গাল দেওয়া হবে গ্যারান্টি দিলে হয়তো রাজী হতে পারেন। জগদীশের নামে কিছু বলা হলে ওনার অসুবিধা আছে। কিন্তু তা তো আর ঠেকানো যাবে না? অন্যেরা ধরণী-জগদীশদেরও শ্রাদ্ধ করবে। শুভও এরকম সভায় যেতে পারবে না। কাজেই বুঝতে পারছো তো, এদের নিয়ে কিসের মিটিং করা উচিত ঠিক করতে মিটিং ডেকে তোমার সুবিধা হবে না কৈলাসদা।

শুভ ভিতরে ঢুকে বলে, বাইরে দাঁড়িয়ে চুপি চুপি তোমাদের কথা শুনছিলাম, কিছু মনে কোরো না। চাষীদের জন্য মিটিং করলেই বাবাকে গাল দেওয়া হয়? বাবার জন্যই চাষীদের অবস্থা কাহিল হয়েছে?

কৈলাস নীরবে একটা বিড়ি ধরায়।

নন্দ যেন তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যই বলে, একা তোমার বাবার জন্য নয়। আরও কতজনে কতভাবে গরীব চাষীর দফা নিকেশ করছে! ধরণী মোটর চাপে না, সেকেলে চালচলন, খুব ধার্মিক লোক। পারলে ওকে কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ফেললেও বোধ হয় চাষীদের গায়ের জ্বালা মিটবে না।

একটু ভেবেই নন্দ যোগ দেয়, একদিন সকালের দিকে ধরণীর বাড়ির দিকে যাও না বেড়াতে বেড়াতে? কারো ঘরে ধান নেই, ঘাড় মটকাতে দেবার জন্য কিভাবে লোকে ভিড় করে গিয়ে ধন্না দেয় দেখতে পাবে। খানিকটা টেরও পাবে লোকের প্রাণে এত জ্বালা কেন।

কৈলাস মাথা নেড়ে বলে, তুমি তো বেশ পরামর্শ দিলে ডাক্তার! উনি গেলে কি আর টের পাবেন? ওরা সব চুপ করে যাবে, ধরণী ওনাকে সম্মান করতে ব্যস্ত হবে। একটু বেশীক্ষণ বসলে সেদিনকার মতো হয়তো খেদিয়েই দেবে সকলকে। কর্জ না পেয়ে সবাই ওনার ওপর চটে যাবে।

নন্দ বলে, তা বটে।

শুভ গম্ভীর মুখে আপসোস করে বলে, ওই তো হয়েছে মুশকিল। নিজে দেখেশুনে সব জানতে আমার এত ইচ্ছে, কিন্তু কাছে ঘেঁষবার উপায় নেই। শামুকের মতো খোলার মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নেবে। একেবারে ছাপ-মারা হয়ে গেছি।

কৈলাস মনে মনে ভাবে, কেন বাংলা দেশে আর গাঁ নেই, তোমায় যেখানে কেউ চেনে না? গরীব সেজে ঘুরে এসো না দুটো দিন, এতই যদি জানবার ইচ্ছে। যেটুকু দেখবে শুনবে তাতেই চোখ ছানাবড়া হয়ে যাবে না তোমার!

তবু তার জানবার বুঝবার ইচ্ছাটাকে স্বীকার না করে কৈলাস পারে না। শখের কৌতূহল হতে পারে। তা হোক। সেটুকুই বা কজনের আছে শুভর মতো মানুষের!

খানিক চুপচাপ থেকে সে হঠাৎ প্রশ্ন করে, এক কাজ করবেন? চাষীরা নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি করে আপনাকে শোনাতে পারি।

কৈলাসের বুদ্ধিটা সহজ। মানুষের দাঁড়িয়েছে একান্ত কাহিল অবস্থা, ঘরে ঘরে ধান নেই, ধরণী সুদ বাড়িয়েই যাচ্ছে। লোচনের বাড়িতে আশেপাশের দুঃস্থ চাষীদের একটা বৈঠক হবে পরামর্শ করার জন্য—ধরণীর সুদের বাড়টা ঠেকাবার কোন উপায় যদি খুঁজে পাওয়া যায়।

তা, শুভ ইচ্ছা করলে বৈঠকটা কৈলাস-লোচনের বাড়ির বদলে নন্দর ডিসপেন্সারির দাওয়ায় বসাবার ব্যবস্থা করতে পারে। শুভ আগে থেকে এসে ভেতরে বসে থাকবে। দাওয়ার কথাবার্তা ভেতর থেকে অনায়াসে শুনতে পাবে।

কিন্তু একটু সাবধান থাকতে হবে আপনাকে। কেউ না টের পায়। বৈঠকটা পণ্ড হয়ে যাবে।

শুভর মুখ লাল হয়ে উঠেছে দেখে নন্দ তাড়াতাড়ি বলে, কি ছেলেমানুষের মতো কথা বলছ কৈলাসদা!

শুভ বলে, চোরের মতো লুকিয়ে কথা শুনতে হবে? স্পাইএর মতো? আপনার গেঁয়ো মাথায় বুদ্ধি এসেছে ভাল!

সে আপনার বিবেচনা। চাষীরা প্রাণ খুলে কথা কইবে আর আপনি শুনবেন—এভাবে ছাড়া তা হয় না।

মনে মনে কৈলাস যোগ দেয়, কস্মিনকালে হবেও না!

ডেকে বসালে নিজেদের বৈঠকেও চাষীরা একেবারে প্রাণ খুলে সহজভাবে কথা বলতে পারে না, গুরুতর বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ হচ্ছে, হাল্কা কথা বাজে কথা বলে ফেলাটা মোটেই সঙ্গত হবে না এই ভাবনাতেই বাধ' বাধ' বোধ করে। তবু অভিমান না করে কৈলাসের পরামর্শ শুনলে শুভর একটা নতুন অভিজ্ঞতা হত সন্দেহ নেই।

সেটা স্বীকার করেও নন্দ কিন্তু পরে কৈলাসকে অনুযোগ দেয়, তুমি কি করছিলে বল তো? বৈঠকে কি সবাই শুধু ধরণীর মুণ্ডপাত করত? ওর বাপের নামেও যা-তা বলত না?

সব শুনত। বুঝত চাষাভূষো ওদের কত ভক্তি করে ভালবাসে।

সেটা খানিক বোঝে।

খানিক বোঝার চেয়ে একদম না বোঝা ভালো। ফাঁকা দরদ দেখাবার সাধ হয় না।

আজকাল ভোরবেলা চারিদিক ঘন কুয়াশায় ঢেকে যায়। অল্প দূরেও নজর চলে না। কুয়াশায় রাত্রি শেষ হয়, আবার হিম-হিম কুয়াশার যেন আভাস মেলে সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে। কুয়াশা কাটতে বেলা হবে, তখন দেখা যাবে ক্ষেত ঢেকে গেছে আগামী ফসলের বাড়ন্ত সবুজ চারায়। ছড়ানো বীজ থেকে এলোমেলো ভাবে ছড়িয়ে জন্মেছিল শিশু, গোছায় গোছায় সাজিয়ে রোপণ করেছে চাষী। সারা দিন কাঁচা সবুজ শীষগুলি বাতাসে দোলে। নবাগত উত্তুরে বাতাস এখনো খেয়ালী, চপল। থেকে থেকে হঠাৎ থেমে যায়, বায়ু বয় পূব থেকে, তা ও আবার হঠাৎ দিক পরিবর্তন করে বইতে শুরু করে দখিনা

হয়ে। ধানের শীষ এখনো দানা বাঁধেনি, টিপলে এখনও গাঢ় আঠার মত দুধ বেরোয়, মার স্তনের দুধের চেয়ে বুঝি মিষ্টি। চাষীরা বলে যে তা হবে না কেন, মানুষ-মায়ের বুকে দুধ তো আসে মাটি-মায়ের দানা-বাঁধা এই দুধ খেয়েই।

লোচনের দাওয়ায় এত ভোরেই কয়েকজন চাষী জড়ো হয়েছে। ডেকে বসানো বৈঠক নয়, কেউ কাউকে ডেকে আনেনি। ধরণীর কাছে কর্জার জন্য ধন্না দিতে যাওয়ার আগে এরা কয়েকজন একে দুয়ে নিজেরাই এসে এখানে জমেছে। কি ভাবে যেন তারা টের পেয়ে গিয়েছে যে ধরণীর দরজায় হাজির হবার আগে জনকয়েক একসাথে বসে খানিকক্ষণ এলোমেলো কথা বলে গেলেও যেন বুকে বল পাওয়া যায়, ধরণী কারো উপর বেশীরকম অন্যায় করতে চাইলে সে বেচারার পক্ষে কথা বলার দুচারজন লোক মেলে।

কুয়াশা বটে! ভুঁই ফুঁড়ে মেঘ উঠছে মন করে যেন।

ভূষণ বলে, রসিক আর তোরাব আলিকে। দাওয়ায় বসে চেনা যাচ্ছে না কয়েক হাত দূরে মাটির রাস্তায় কে হেঁটে যাচ্ছে।

কৈলাস এসে তাদের বলে, চলো দিকি সবাই মিলে মোদের ডাক্তারের ওখানে গিয়ে বসি। আরও ক'জনা আসবে। কম সুদে ধান কর্জ মেলে নাকি একটু সলা হোক।

শুভ রাতারাতি মত পালটে রাত থাকতে নন্দর কাছে এসেছিল। আড়াল থেকেই সে চাষীদের আলাপ-আলোচনা শুনবে। এ বাস্তব সত্যকে তো আর স্বীকার করা যাবে না যে চাষীরা তাকে আপন ভাবে না, ভাবতে পারে না, সে হাজির আছে টের পেলেই তারা মুখ খুললেও প্রাণ খুলবে না। তার উদ্দেশ্যও যখন খারাপ নয়, লুকিয়ে ওদের কথা শুনলে দোষ কি?

নন্দ গিয়ে কৈলাসকে ডেকে তুলে বলেছিল, আমার ওখানেই বৈঠকটা বসাও কৈলাসদা। বাবু শেষ রাত্রে হাঁটতে হাঁটতে এসে হাজির হয়েছে।

কৈলাস বলেছিল, সে বৈঠক তো আজ নয়? আমি আজ সকাল সকাল কলকাতা রওনা দেব। বৈঠক হবে রোববার।

খাঃ, বেচারা মিছিমিছি এত কষ্ট করে এল। খুব আগ্রহ নিয়ে এসেছে। রোববার আসতে বলব?

কৈলাস একটু ভেবে বলেছিল, আচ্ছা বসতে বলবে যাও, আজকেই চাষীদের কথাবার্তা শুনিয়ে দিচ্ছি। ছোট ছোট বৈঠক এখানে ওখানে রোজ বসছে দুবেলা, ক'জনে জড়ো হয়ে বসে মন্দ কপালের নিন্দা করতেও ভাল লাগে।

রসিক বলে, ধরণী ব্যাটা ঘুমোবে বেলা তক্। একটু দেরি করেই রওনা দেব মোরা, না কি বল মিঞা?

রসিক লোচনের বোনাই, বারতলার দিকে এগিয়ে সোনামাটিতে তার ঘর। তোরাব একরকম প্রতিবেশী রসিকের, দুজনের বাড়ির মধ্যে ব্যবধান শুধু একটা বাঁশ-ঝাড় আর কয়েকটা কুলগাছের।

দেরি হয়ে যাবে না? ছুতা করে আজ যদি কর্জ না দেয়।

তোরাব বেশ একটু উদ্বেগের সঙ্গেই বলে। ধরণী তরফদার ধান কর্জ না দিলে কাল-পরশু ওদের দুজনের ঘরেও উপোস শুরু হয়ে যাবে, কিন্তু তোরাবের ঘরে কাল থেকে এক দানা চাল নেই।

কৈলাস বলে, দেবার মতলব না থাকলে রাত থাকতে গিয়ে ধন্না দিলেও দেবে না। মতলব থাকলে যখনি যাও মিলবে।

সে কথা ঠিক। আগেকার দিনে ধরণীর কাছে কর্জ চাইতে যেতে হলে এরাই হয়তো একজন চুপি-চুপি আরেক জনের আগে গিয়ে নিজের জন্য কর্জটা আগেভাগে বাগিয়ে নেবার চেষ্টা করত। কিন্তু আজ চাষীরা প্রায় সকলেই টের পেয়েছে ওতে কোন ফল নেই, কে আগে এল, তোশামুদে কথা কইল বা কান্নাকাটি করল সে সব বিচার করে না ধরণী! যাকে না দেবার তাকে কিছুতে দেয় না, যাকে দেবার তাকে দেয়, সকলকে সমান বাঁধনে বাঁধে। ভাণ্ডারও তার তাদের শুষে শুষে হয়ে আছে অফুরন্ত, মন্বন্তরের রিলিফখানার খয়রাত নয়

যে, আগে গিয়ে মারামারি কামড়াকামড়ি না করলে ফুরিয়ে যাবার ভয়। তবে কি না বুঝেও মনটা যেন বুঝতে চায় না, আজও না খেয়ে থাকতে হলে মুশকিল, বৌটা তোরাবের আসন্ন-প্রসবা, বড় কমজোরী হয়ে পড়ছে শরীরটা তার এমনিতেই।

এরা আজ এবেলাই ধরণীর কাছে কর্জের জন্য যাবে। নন্দর বাড়ির দিকে চলতে চলতে কৈলাস আরও কয়েকজনকে ডেকে সঙ্গে নেয়। শুভর সাধ মেটানোটাই তার উদ্দেশ্য নয়। এদের কথাবার্তা শুনে শুভ যদি বুঝতে পারে কিভাবে ধরণী শোষণ চালাচ্ছে ফসল তোলার আগে, এদের দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে চাপ দিয়ে ধরণীর বাড়াবাড়িটা ঠেকাবার চেষ্টা একটু হয়তো সে করতেও পারে—এটুকু আশা করতে দোষটা কি ?

নন্দর ডিসপেন্সারির দাওয়ায় তারা বসে। যারা কর্জের আশায় যাবে তাদের মনে ওই এক চিন্তা—আজও যদি ধরণী ফিরিয়ে দেয়! তিন-চার দিন নানা ছুতায় সে কর্জ দেওয়া বন্ধ রেখেছে।

গদিতেই আসে দুতিন ঘণ্টা দেরি করে।

নারান বলে, দেড়ভাগি চাপাবে ঠিক। না তো দেবে না মন করে।

তা মানবো না মোরা।

না, তা মানবো না, আল্লার কিরে।

এক মুহূর্তে তোরাব যেন ভয়-ভাবনা-উদ্বেগ ভুলে যায়, হাঁটুতে জোরে চাপড় মেরে বলে, পোয়া সুদের এক কুণো বাড়তি মানব না, না দেয় কর্জ না দেবে।

গত বছর ফসল কাটার দশ-বার দিন আগে বিপদে পড়ে দেড়ভাগি শর্তে ধান নিতে হয়েছিল তোরাবকে ফজলু মিঞার কাছে, সে জ্বালা আজও সে ভোলেনি। মাঠে যখন লাঙলও পড়েনি, বীজধান কার কী আছে কেউ জানে না. বৃষ্টি হবে, না ধানের চারা মাঠে শুকিয়ে যাবে অথবা বন্যায় শেষ করে দিয়ে যাবে কি যাবে না অতি বৃষ্টিতে মাঠভরা তেজী ধানগাছগুলিকে তাও যখন কেউ বলতে পারে না—তখন মহাজন দুমণ ধান দিয়ে ফসল উঠলে তিন মণ আদায় করুক, বলার কিছু নেই। নাঃ, কিছুই বলার নেই। চাষীটাই টিঁকবে কিনা,

দুমণ ধান সমস্তটাই বরবাদ হয়ে যাবে কিনা জানা নেই, দুদশবার এরকম লোকসান যখন সইতে হয়েছে মহাজনকে—ও অবস্থায় সে দেড়ভাগিই চালাক। যেমন দুরবস্থা তাদের তেমনি অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। কিন্তু ফসলের দুধ যখন ঘন হয়ে দানা বাঁধতে শুরু করেছে মাঠে, অনাবৃষ্টি আর বন্যা দুটোকেই ডিঙিয়ে চাষী ফসল তোলার দিন গুনছে, তখন দেড়ভাগি সুদ চাপানো!

দেখাই যাক অদেষ্টে কি আছে। গরজ তো মোদের, ও ব্যাটার কি?

রসিক বলে কলকেতে সুপারির মত একগুলি তামাক দিয়ে হাতের তালুতে নারকেল ছোবড়া পাকাতে পাকাতে।

বটে না কি? কৈলাস বলে ব্যঙ্গের সুরে, ও ব্যাটার কি? কর্জ না দিলে তো ঘরের ধান ঘরে রইবে, বাড়বে এক দানা? ওর কারবার এই, কর্জ দেবার গরজ কিছু কম নয়।

ঘনরাম বলে, ঠিক, ঘুপটি মেরে বসে থাকে মোদের খেলাতে, মোরা হার মানি, নয় তো—

কুয়াশা নড়ে না, হাল্কা হয় না। চালা থেকে টপ-টপ জল পড়ছে। হাত বদল করে তারা কল্কেতে কয়েকটা ছোট-ছোট আর একটা বড় টান দিয়ে তামাক খায়, চিন্তিতভাবে তাকিয়ে থাকে বাইরের দিকে। ঘনরামের ছেলেটার জ্বর এসেছিল পরশু, কাল রাত্রে খুব ঘাম দিয়ে তাড়াতাড়ি জ্বরটা ছেড়ে গিয়েছে, ছেলেটা ছটফট করেছে গোঙিয়ে গোঙিয়ে।

হাসপাতালে যাবে না একবার? তার বৌ শুধিয়েছিল আসবার আগে, বাসন ঠোকার আওয়াজে তাকে ভিতরে ডেকে।

হাঁ, হাসপাতাল হয়ে ফিরব।

লোচন কাল সদরে গিয়েছে একটা মামলার ব্যাপারে, আজ শুনানী হবে, এই মামলার জন্যই ঘনরাম টাকা ধার করতে চলেছে ধরণীর কাছে। কাল গিয়েছিল, সুবিধা হয়নি। আজ টাকা যোগাড় করে তাকে সদরে পৌঁছতেই হবে।

কৈলাস জানে এদের এই এলোমেলো আলোচনা থেকে শুভ ধরতেও পারবে

না ধরণীর কাছে ঋণের ফাঁস গলায় পরতে যেতে এদের এত গরজ কেন, কিসের দায়। সে তাই থেকে থেকে একে ওকে ঘরের খবর জিজ্ঞাসা করে, ধান বা টাকা কিসের কর্জ দরকার জানতে চায়।

কান পেতে নিজের কানে শুনে শুনুক এসব কাহিনী। বুঝুক কি অবস্থায় মানুষকে জবাই করে ধরণী।

পিনাক সামন্তকে যেতে দেখে সে ডেকে আনে। শুধু জমিহীন গরীব চাষীই নয়, মধ্যবিত্ত চাষীকেও কেন ধরণীর কাছে হত্যা দিতে যেতে হয় তাও জানুক।

সব জেনেশুনেও পিনাককে জিজ্ঞাসা করে, কোথায় চলেছ সামন্ত খুড়ো?

আর কোথা যাব বল? চলেছি ধরণী ব্যাটার কাছে। ব্যাটার ওলাউঠা হয় না, শকুনে ছিঁড়ে খায় না ব্যাটাকে।

ভূষণ বলে, যা বলেছ দাদা। মানুষকে এমন ডাহা মিথ্যে মামলায় জড়াতে ধরণী ছাড়া কেউ পারবে না।

পারবে না? খোদ বড় কত্তা নিজে গনশার চালায় আগুন দিয়ে রাজেন দাসদের জেল খাটালে না? সব এক ঘাটের কুমীর। ধরণী বলে আমায় ছাখ, জগদীশ বলে আমায় ছাখ। কুষ্ঠও হয় না ব্যাটাদের, আশ্চর্যি।

এই গাঁয়েরই শেষপ্রান্তে পিনাক সামন্তের টিনের আর খড়ের কোঠায় মেশান বাড়ি, নন্দের বাড়ি থেকে পোয়াটেক মাইল দূর। মানুষটার বয়স খুব বেশী হয়নি, অকালে বুড়িয়ে জীর্ণ আর বাঁকা হয়ে গেছে সত্তর বছরের বুড়োর মতো। তরফদারের কাছে তার প্রয়োজন ধানের কর্জ নয়, বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতো এক চোরাগোপ্তা একতরফা মামলায় জমি নীলামের নোটিশের প্রতিবাদে কাকুতি-মিনতি করা। তার ছেলে গেছে বিদেশে খাটতে, ফসল কাটার সময় আরও নিকট হলে ফিরবে। কি করবে ভেবে একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েছে পিনাক।

বলে, মরণ হলে হাড় জুড়াত, অদেষ্টে মরণ নাই। সেই যে গোল বাধালে ছেলেটা নাথুর হয়ে সাক্ষী দিলে ফৌজদারী মামলায়, ধরণীর জরি-

মানা হল, সে রাগটা ঝাড়লে তরফদার। মরণ হলে হাড় জুড়োত, অদেষ্টে মরণ নাই !

সবাই জানে সব, বোঝেও সব। গিয়ে ধরে পড়লে যে কিছু হবে না এও সকলের জানা কথা। ভাঙা জীর্ণ শরীর নিয়ে ছুটোছুটি করে পিনাককেই ঠেকাতে হবে নীলাম, লড়তে হবে মিথ্যে মামলা ফাঁস করতে, অবশ্য যদি লড়তে পারে। তার ছেলে দুখীরাম এসে কেঁদেকেটে মাপ চেয়ে নাকে খত দিলে বড় জোর আপোস হবে একটা, দয়া করে কিছু কমে-সমে রেহাই দেবে ধরণী। নয় তো যাবে জমি নীলাম হয়ে।

ঘনরাম শুধায়, দুখীর শ্বশুর না মর-মর হয়েছিল ?

মরল কৈ ?

পিনাক বলে দারুণ হতাশে, যে মরলে ভাল সে কি মরে ? উয়ার মরণ নাই, মোর মরণ নাই, মোরা চিরজীবী হয়ে রইব। ধরণীটাও মরবে না !

ভূষণের শ্বশুরের দুটি মাত্র মেয়ে, সে মরলে তার জমি-জমা ঘর-দুয়ার ভাগা-ভাগি করে মেয়েরা পাবে। তার অসুখ-বিসুখের খবর পেলেই জামাই দুজন ছুটে যায় দেখতে, এমনিও যখন তখন যায় ! পূজার পর কঠিন রোগে পেড়ে ফেলেছিল, কিন্তু বুড়ো আবার বেঁচে উঠেছে।

এরাও অনেকে ধরণীর কাছে যাবে শুনে পিনাক বসে।

ডিসপেন্সারির দরজা বন্ধ। কৈলাস ভাবে, কে জানে ঘরের ভিতরে বসে ধরণীর সঙ্গে তার বাপের মরণ কামনার ফোঁড়ন দেওয়া কাহিনী শুনতে শুনতে কি মনে হচ্ছে শুভর।

তখন নাকে তার ভেসে আসে দামী সিগারেটের গন্ধ !

গরীব বিপন্ন চাষীদের কথা শুনতে শুনতে মশগুল হয়েই কি শুভ সিগারেট ধরিয়েছে ? অথবা এমনিই তার খেয়াল নেই যে এ সিগারেটের গন্ধ শোঁকা চাষাভূষোদের অভ্যাস নেই ?

সে ডাক দিয়ে বলে, ও ডাক্তার, ঘরে সিগ্রেট না টেনে বাইরে এসো না, এদের একটু বুদ্ধি পরামর্শ দাও ?

সে জানত নন্দ ঘরে নেই। তার বাড়িতে শুভর আসবার খবর দিয়ে সে ফেরেনি, জরুরী ডাকে চলে গেছে। রোগীর অবস্থা তার নিশ্চয় কাহিল, নইলে এতক্ষণে ফিরে আসত।

কাল্লু নীচু গলায় কৈলাসকে বলে, ছোটবাবুর সাথে নাকি মোদের ডাক্তার-বাবুর খুব খাতির হয়েছে? হরদম আসেন যান?

কথাটা শুনতে পেয়ে বিপিন বলে, কোন মতলব আছে মন করে। মোদের ডাক্তারকে সাবধান করে দেয়া উচিত।

কৈলাস জোর দিয়ে বলে, না না, ওসব ভেবো না। কারখানা-টারখানা করার মতলব আছে ছোটবাবুর, খারাপ মতলব নেই। জ্ঞানী গুণী লোক, লেখাপড়া শিখে মানুষটা খাঁটি হয়েছে।

পিনাক বলে, তুমি জানলে কি করে মানুষটা খাঁটি হয়েছে?

রকম দেখে জানা যায়। নেশা নেই, বদখেয়াল নেই, লেখাপড়া আর কাজ ছাড়া কোন দিকে মন নেই। দেশের জন্য দরদ আছে—

ঘনরাম হেসে বলে, তুমি যে ছোটবাবুর হয়ে ওকালতি শুরু করলে কৈলাস!

কৈলাস বলে, সত্যি কথা বলব না? বাপকে দিয়ে ছেলের বিচার করতে যাব কেন? নিজে মন্দ কাজ করলে নিন্দা করব।

শুভ ঘরের ভিতর থেকে শুনছে জেনে অবস্থাটা কৈলাসের বেশ নাটকীয় মনে হয়।

কিন্তু নাটক যে তখন পর্যন্ত শুরু হয় নি এটা সে টের পায় বিপিনের মন্তব্য শুনে।

বিপিন তীব্র ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, যা বললে দাদা, মন্দ কাজ করে নি, হাঃ! বাপ মোদের রক্ত শুষছে, সে টাকায় মোটর চাপছে আরাম করছে—এটা খুব ভাল কাজ, না?

কৈলাসকে বলতে হয়, যাক গে যাক, কাজের কথা বল। দেড়ভাগি কর্জ তোমরা ছোঁবে না ঠিক করলে তো?

ফকির বলে, ইচ্ছা তো তাই। তবে কিনা পাঁচজনে আনলে না ছুঁয়ে উপায় থাকবে কি।

ঘনরাম প্রশ্ন করে, ডাক্তার তো বার হল না? এ কি রকম ব্যাপার?

ভিতরে ব্যস্ত আছে। এবার তবে রওনা দাও, বেলা হয়ে যাবে।

পিনাকের সঙ্গে হেঁটে দীঘিপাড়ায় পৌঁছতে পৌঁছতে কুয়াশা খানিকটা হাল্‌কা হয়ে আসে, এবার তাড়াতাড়ি কেটে যাবে। দীঘিপাড়ায় ঘন বসতি, খড়ের চালার ঘরই বেশী, দালানও আছে কয়েকটা। সোনামাটির এই দীঘিপাড়া ও কুয়াতলাতেই গাঁয়ের যে কজন স্বচ্ছল, সম্পন্ন এবং গরীব ভদ্র গৃহস্থের বাস।

ধরণী এখনো দর্শন দান করেনি, তবে আর খুব বেশী দেরি যে তার হবে না অন্দর থেকে সদরে আসতে তার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। তক্তপোষের ফরাস ঝেড়ে বাঁধানো হুঁকোটা রেখে গেছে কানাই, বুড়ো ইন্দ্র সরকার চোখে চশমা এঁটে খেরো-বাঁধানো খাতা খুলে বসেছে, ধরণীর ভাগ্নে আচমকা এসে উঁকি দিয়ে দেখে গেছে।

তারা ছাড়াও অনেকে মেঝেতে উবু হয়ে বসে আগে থেকে অপেক্ষা করছিল, তারা বসতে বসতে আরও দুজন এল। রাজেন দাসকে দেখে একটু অবাক্ লাগে সকলের, তার অবস্থা ভাল বলেই জানত সকলে, বছরের কোন সময়ে ভাতের অভাব হয় না। ধান কর্জ চাইতে এসেছে রাজেন দাস, না টাকা? অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে? যেমন বিপন্ন ভাব তার, কারো দিকে না তাকিয়ে যেভাবে এক পাশে দাঁড়িয়ে চোখ পেতে রেখেছে কদম গাছটায়, তাতে মনে হয় অনুগ্রহই বুঝি চাইতে এসেছে ধরণীর কাছে—যে কাজটা করা তার অভ্যাস নয়। সোনামুদ্দি আর তিনকড়িই বা কেন এসেছে কে জানে? নিঃস্ব পথের ভিখারী হয়ে গেছে দুজনেই ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হয়ে, এক কাহন খড়ও নেই ওদের যে ধরণীর কাছে কোন দয়া প্রত্যাশা করতে পারে।

পরস্পরের মধ্যে কথা চলতে থাকে ধীরে ধীরে, নতুন কিছু জানার বা বলার থাকলে জিজ্ঞাসা ও জবাব, দুএকটি শব্দে আপসোস বা সমবেদনা

প্রকাশ! চিরকালের স্থায়ী দুঃখ-দুর্দশার কথা কেউ বলাবলি করে না, কারো অজানা নেই কার কি দায় বা দুর্ভোগের জের চলছে তো চলছেই, সে হিসাবে সবাই তারা সমান দুর্ভাগা, কম-বেশী যদি হয়তো সেটা সাময়িক, জোয়ার-ভাঁটার খেলা মাত্র। রাজেন দাস পোড় খায়নি, তার লজ্জা করতে পারে, ঘরে অন্ন না থাকাটা দশ জনের জেনে ফেলার মধ্যে তার লজ্জার কিছু থাকতে পারে, কিন্তু এটা যে অপৌরুষের বা অপদার্থতার প্রমাণ সেটা অন্যেরা বহুকাল আগেই ভুলে গেছে।

ভূষণের জিজ্ঞাসার জবাবে রাজেন দাস একটু কাঁচু-মাচু হয়েই বলে, একটু কাজে এয়েছি। দরকার আছে একটা।

শ্রীনাথ মাইতি বলে, আর দাদা, কপাল। ফের মলজোড়া বাঁধা দিতে এয়েছি, ঘরে হাঁড়ি চড়া বন্ধ।

বলাবলি যা হয় সব চাষাড়ে কথা। হাটে-হাটে ধান-চালের লাটসাহেবী দর, কেমন হবে এবারেও ফসল, ভাগ, আবোয়াব আদায়, জুলুম ইত্যাদির কথা। আর সেদিন রামপুরে পত্তনিদার মদন শাসমলের লোকের সঙ্গে চাষীদের যে মারামারিটা হয়ে গেল সেই আলোচনা। রাখাল একটা নতুন খবর এনেছে আজ, মদন শাসমলের ভাইপো না কি জখম হয়েছিল দাঙ্গায়, হাসপাতালে মারা গেছে। তার চেয়েও জবর একটা খবর শুনে এসেছে তিনু, সত্য কি মিথ্যা জানে না। হাঙ্গামার পর পুলিস এসে রামপুরে ধর-পাকড়-জুলুম চালাচ্ছিল, হঠাৎ না কি পুলিস চলে গেছে গাঁ ছেড়ে। একেবারে হঠাৎ, সকালেও দলকে দল পুলিস হাজির ছিল, বেলা খানিক বাড়তে না বাড়তে মার্চ করে চলে গেল স্টেশন রোড়ের দিকে। তিনু এসেছে সকলের পরে এই অদ্ভুত কাহিনী নিয়ে, কিন্তু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সবাই যে জিজ্ঞেস করবে এক কথা দশবার করে ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করার দারুণ আগ্রহে, তার সময়ও বেশী পাওয়া গেল না। ধরণী এল বৈঠকখানায়।

বলল, বেশ, বেশ। তোমরা এয়েছ দেখছি। তা বেশ, তা বেশ; জয় দুর্গা শ্রীহরি। তামাক আনতে বুড়ো হলি শালার ব্যাটা?

ঘরের মধ্যেই ভেতরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কানাই কল্কেতে ফুঁ দিচ্ছিল, নজর পড়ায় ধরণী বলল, এই যে এনেছিস।

একেবারে যে মোটা গোল-গাল তা নয়, নাদুস-নুদুস চেহারা ধরণী তরফদারের, বেঁটে বলে বেশী মোটা দেখায়। টানা চোখ, মুখখানা থ্যাবড়া না হলে হয়তো কোনমতে মানাত, আর যদি ভুরু না হত দামাল মোচের মত ঘন। টানা চোখে একবার সে তাকিয়ে নেয় সবার দিকে, কে কে এসেছে, কেন এসেছে, মোটামুটি আন্দাজ করে নিতে। দিনকাল বড় খারাপ পড়েছে, একদিন সকালে বৈঠকখানায় নেমে যদি ত্যাখে যে একদল আধিয়ার হাতিয়ার নিয়ে অপেক্ষা করছে, মোটেই সে আশ্চর্য হবে না। ব্যবস্থা অবশ্য সে করে রেখেছে আত্মরক্ষার। দুনলা বন্দুকে ছর্‌রা টোটা ভরে ছেলে দাঁড়িয়ে আছে ভেতরের দরজার ওপাশে, রামদা নিয়ে প্রস্তুত হয়ে আছে রঘু আর বিষ্ণু। তাছাড়া, লোক-জন সকলকে বলাই আছে যে, বৈঠকখানায় একটু হট্টগোল শোনামাত্র যে যেখানে থাকে ছুটে আসবে দা' লাঠি যা পায় হাতের কাছে তাই নিয়ে।

উপস্থিত এদের মধ্যেও তার ভাড়া-করা লোক মিলে-মিশে আছে দুচার জন। ওরা তার চরের সামিল, চাষীরা কি ভাবছে কি পরামর্শ করছে খবরাখবর পৌছে দেয়—হঠাৎ দরকার হলে ওরাও তাকে বাঁচাবে।

তবু, বলা তো যায় না। যা দিনকাল পড়েছে।

রাজেন যে? খবর কি?

রাজেনের দিকে তাকিয়েই কিছুক্ষণ হুঁকো টেনে ধরণী জিজ্ঞাসা করে।

একটু দরকার ছিল।

বোসো। জয় দুর্গা শ্রীহরি।

হাই তুলে তুড়ি দেয় ধরণী, বলে শরীরটা ভাল নেই!

হুঁকো টেনে যায় ধরণী, খানিকটা চোখ বুজে, চুপচাপ। বিষয়কর্মে তার যেন মন নেই, এতগুলি লোক কেন তার কাছে এসেছে সে যেন জানতেও চায় না, পরম গভীর কোন এক অপার্থিব চিন্তায় সে যেন ডুবে গেছে। নিজে থেকে

সে কিছু বলবে না, তার গরজ নেই, এ জানা কথা। তোরাব একটু সামনে এগিয়ে বলে, মোরা কর্জের জন্য এয়েছিলাম কত্তা।

কর্জ ? তা বেশ। ফজলু মিঞার খবর কি ?

তেনা ভাল আছেন। তা, তেনা কাত্তিকে দেড়ভাগি আপোস চান তাই আপনার কাছে এয়েছি।

বটে ? তা বেশ। কাত্তিকে দেড়ভাগি অন্যায় জুলুম বটে।—ধরণী যেন মাটির পৃথিবীতে ফিরে আসে হঠাৎ, মুখটা দেখায় গম্ভীর : ইন্দ্র, ধান কি আছে কর্জ দেবার মত ?

কিছু আছে। অল্প-স্বল্প দেয়া যায়।

তখন ধরণী বলে, শোন বলি, কাত্তিকে দেড়ভাগি চাইব না আমি, আমার বাপু বিবেক আছে। ও-সব গোলমালে কাজ নেই। ধানের বাজার-দরে ধান দেব, টাকায় সুদ ধরব—ধরণী গলা খাঁকরায়,—সুদখোর মহাজন হলে আট আনা ধরত, চার আনা দিও, তাই ঢের।

শুনে স্তম্ভিত হয়ে যায় উপস্থিত সকলে। সকলে মরিয়া হয়ে প্রাণপণে নাড়াচাড়া করে প্রস্তাবটা মনে মনে, বোকা চাষা-ভূষো মানুষ, কথাটার যে-মানে বুঝেছে তা হয়তো ভুল, হয়তো অন্য মনে আছে।

তোরাব বলে, কত্তা ?

রাজেন দাস বলে, এটা কি বলছেন ?

কেন ?—ধরণী আশ্চর্য হয়ে যায়,—দেড়ভাগিতে মণে আধ মণ সুদ দিতে হত তোমাদের, টাকায় আট আনা। আমি কি চামার, মাসে আট আনা সুদ চাইব ? চলতি দরের হিসেবে টাকার খত দিয়ে ধান নাও, চার আনা সুদ দেবে টাকায় বা ধানে যা তোমাদের খুশী।

ধানে শোধ দিলে—? সংশয়ভরে প্রশ্ন করে একজন।

ধানেই দিও, নির্বিকারভাবে বলে ধরণী, টাকায় চার আনা ধরে দর হিসেবে ধানেই দিও।

এবার জ্বালা বোধ করে সকলে। এতই বোকা ঠাউরেছে তাদের ধরণী

তরফদার ? আজ ধানের দর কোথায় ফসল উঠার আগে, ফসল উঠলে তা কোথায় নেবে যাবে। চার আনা সুদ!—বিনা সুদে এই কড়ারে ধান কর্জ নিলে দেড়ভাগি হিসাবেরও অনেক গুণ বেশী ফিরিয়ে দিতে হবে ধরণীকে। ব্যাটা ধড়িবাজ ডাকাত।

রাখাল বলে, আজকের চোরাবাজারি দরে মোরা ধান নিতে পারি কত্তা? চার আনা সুদে ?

তবে দেড়ভাগি হিসেবে নাও।

পুলিন যেন হাঁফ ছাড়ে, ধরণীর চলতি দরের হিসাবে কর্জ দেবার প্রস্তাব শুনে তার মাথা ঘুরে গিয়েছিল!

তাই দেন কত্তা, তাই দেন।

রও দাদা, রও। তড়ফিও না অত।—তোরাব বলে ধমক দিয়ে, দেড়া ভাগির কর্জ মোরা ছোঁব না কেউ।

বটে না কি ? মুচকে হাসে ধরণী, তুমি দেখছি নেতা হয়ে উঠেছ তোরাব। তা হম্বিতম্বিটা ফজলু মিঞার হোতা করলে হত না? জাতভাই ছিল, তারিফ করত ?

গরীব চাষার জাতভাই!

তোরাবের এই কথার পিঠে কথা চাপিয়ে খোঁচা দেবার স্পর্ধায় অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে ধরণী দুবার গলা-খাঁকারি দিয়ে গম্ভীর মুখে তামাক টানতে থাকে। তার ভাবটা এই যে, এতই যদি তেজ তোমাদের, আমার কাছে এলে কেন বাপু?

এক কাজ কেন করেন না সামন্ত মশায়? রাজেন দাস বলে মধ্যস্থের ভঙ্গিতে, ছআনা মেনে নেন। দেড়পো ভাগেই ধানটা দিয়ে প্রাণটা বাঁচান গরীবদের। আপনার কথাও থাক, মোদের কথাও থাক।

বাজারে যেন দর করছে জিনিসের!

তোমার কাছে দুআনা কিছু না রাজেন দাস, রাখাল বলে, তোমার ভাত খায় কে। ওই দুআনায় মোদের মরণ-বাঁচন।

নিতে আর কি, সোজা কাজ, তিনু বলে, দিতেই যে শ্বাস ওঠে রে দাদা।

পুলিন বলে, কত্তা যদি দয়া করেন—

কচকচিতে কাজ কি? হাকিমের রায় দেবার সুরে বলে ধরণী, হাট না বাজার পেলে তোমরা এটা জিগ্যেস করি? দরাদরি কোরো না বাপু। ধানের দরে টাকার সুদে না তো দেড়ায় নেও তো নেবে, নয় তো এসো গে ভালয় ভালয়। সোজা কথা।

এর পর আর কথা কি?

মুহ্যমানের মত তারা বসে থাকে। তোরাব ভাবে বাহরণের কথা, ভরা মাসের উঁচু পেটে দুরোজ অন্ন পড়েনি। চেষ্টা করে উচিত সুদে ধান মিলল না। আরও যদি চেষ্টা করে দেখতে চায়, আরও দু-এক রোজের উপোস কি সইবে বাহরণের? ওর কিছু হলে তখন বিনা সুদে ধান পেলেই বা কি লাভ হবে তার। ভূষণ ভাবে রোগা ছেলেটার কথা, প্রথম বিয়ানী মেয়েটার কথা, তাকে নিতে কাল জামাই এসে দুদিন থেকে যাবে, সে কথা। রসিক হিসেবী, সে ভাবে, চার বিঘে খাজনা জমির যে পনের-যোল মণ আর তিন বিঘে ভাগের চাষের পাঁচ-ছ মণ থেকে আবোয়াব আদায় বাদে থাকবে মোটামুটি পনের মণ, আগের কর্জ বাবদ যাবে সাড়ে তিন মণ সুদে আসলে, দু-এক মাস বাদে ভিটে বাঁধা না দিলে মরণ নির্ঘাৎ—দেড়ভাগিতে আজ ধান কর্জ না নিলে তাকে আগেই বাঁধা দিতে হবে ভিটেটা, তার চেয়ে দেড়ভাগি মেনে নিলে এখন তো বাঁচবে ফসল তোলা তক। রাখাল ভাবে, বেশী খেটে, খরচা কমিয়ে, কম খেয়ে নয় পুষিয়ে নেবে বাড়তি সুদটা, উপায় কি। তিনু ভাবে, আচমকা লাফিয়ে উঠে তরফদারের টুটিটা যদি কামড়ে ধরে, মরণ-কামড় দেয় একেবারে, নিজে মরবে তবু ছাড়বে না এমনি কামড় বসায়, তরফদার কি মরবে, না শুধু তার মরণ-খাটুনিই সার হবে? সবাই ভাবে, ক্ষোভে হতাশায় জ্বলে যায় সবার বুক, এক সুরে অভিশাপ বাজে ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীগুলিতে: মরুক, মরুক তরফদার, শকুনি ছিঁড়ে খাক তাকে।

এতগুলি মানুষের তীব্র প্রচণ্ড হৃদয়াবেগে এতটুকু অদল-বদল এদিক-ওদিক হয় না ধরণীর বার-কাছারির আদালতী চাল-চলন ঠমক আর কার্যপদ্ধতি। আইন ছাড়া এখানে কথা নেই, আইনের মার-প্যাঁচ ছাড়া। ধরণী তরফদারের কাছারিতে তার বিধান ছাড়া রীতিনীতি নেই, তার চালবাজি ছাড়া গতি নেই। চাষীরা রাজার আদালতও জানে, জোতদারের কাছারিও জানে—একটু বেশী ঘনিষ্ঠ ভাবে জানে। প্রত্যেকের মনে হয় সে যেন খুনী আসামী। ফাঁসির দড়িটা গলায় দেবার দিনটা ক'দিন পিছিয়ে দেওয়াই অসীম দয়া হাকিম আর জোতদারদের।

ঢিমে তালে কাজ চলে। শ্রীনাথ মাইতি লোচন সরকারের হাতে বৌয়ের মল দুটি তুলে দিয়ে ঠায় বসে থাকে এক ঘণ্টা, তার পর দয়া করে ক'টা টাকা তাকে দেওয়া হয় দু মাসের সুদ কেটে রেখে।

আগের বার আগাম সুদ তো কাটেননি কত্তা?

শ্রীনাথ নিবেদন জানায় সবিনয়ে।

আগের বার জানতাম সুদ দিতে পারবে, তাই কাটিনি! ধরণী তাকে বুঝিয়ে দেয়, আসল টাকাটা এবার মারা যাবে কি না খটকা আছে বাপধন!

খানিক চুপ-চাপ মাথা ঘামিয়ে ব্যাপারটা বুঝতে হয় শ্রীনাথের। রুপার মল বাঁধা দিয়েছে, বোধ হয় আদ্দেক দামে। আসল না দিক, সুদ না দিক, রুপার মল দুটো তো থাকবে ধরণীর। তবে তার লোকসানের ভয়টা কিসের?

মল তবে ফেরত দেন কর্তা।—এক টাকার নোট ক'টা শ্রীনাথ বাড়িয়ে দেয় লোচনের দিকে, মল বেচেই দেব সুধী কামারকে, আর বাঁধা রেখে কাজ নেই।

আর হয় না, লেখা-পড়া হয়ে গেছে, ধরণী বলে গম্ভীর আওয়াজে, বেচে দিলেই পারতে? গোড়ায় বললেই হত?

রাজেন দাস বলে, অনভিজ্ঞ বোকার মতই বলে শ্রীনাথের পক্ষ নিয়ে, ভুল করে বাঁধা দিয়েছে, ছাড়িয়ে নিতে চায়।

নিক।

উদাস ভাবে অনুমতি দেয় ধরণী।

মল ছাড়িয়ে নাও না ছিনাথ? এ তো সোজা পথ!—রাজেন উৎসাহিত হয়ে ওঠে।

কিন্তু তা তো হয় না। মল বাঁধা রেখে এখুনি যে টাকাটা পেয়েছে শ্রীনাথ, সে টাকা দিয়ে তো আর ছাড়ানো যায় না মল,—লেখাপড়া হয়ে গেছে! লেখাপড়া বাতিল হতে পারে না।

উকিল বাবুকে ফি দিলে না ছিনাথ, এমন পেটোয়া পরামর্শ দিল? ওকালতি করলে তোমার ভাল পশার হত রাজেন।

ধরণী বলে হাসি-খুশী-ভরা ব্যঙ্গে, তার পরেই গর্জে ওঠে, যাক্ যাক্। ছিনাথের দুটো রুপোর মল নিয়ে আমি রাজা হব! লোচন, মল ফিরিয়ে দাও। লেখো যে সুদ-সমেত কর্জের টাকা পরিশোধ করায় মল ফেরত দেওয়া হইল। টিপ-সই নাও ছিনাথের যে মল ফেরত পেল। আর তোমাকে বলি ছিনাথ, ফের যদি তোমাকে দেখি এখানে, কান ধরে জুতো মেরে দূর করে দেব।

শ্রীনাথ অকাতরে বলে, কত্তা, মাপ করেন। পা-ধোয়া জল খাই, মাপ করেন।

কিন্তু ধরণী আর তাকায় না তার দিকে। গর্জন করে যে হুকুম দিয়েছে ধরণী তা পালন করতে চরম গাফিলতি দেখা যায় ইন্দ্র সরকারের, অথচ তার সামান্য একটি ইঙ্গিত মানতে পর্যন্ত সে কখনো ভুল করে না। মল শ্রীনাথ মাইতির দখলে আর যায় না। অগোচরে কোন ইঙ্গিত বা সঙ্কেতই বুঝি করে থাকবে ধরণী ইন্দ্রকে।

অনেকক্ষণ ধৈর্য ধরে থেকে শ্রীনাথ তাগিদ দেয়, মলটা দেন?

টাকাটা সে বাড়িয়ে দেয়।

খাতার পাতা থেকে চোখ না তুলেই ইন্দ্র ফ্যাঁচ করে ওঠে, দাঁড়াও বাবু, মুলো বাড়িও না। দেখছ না ভিড়?

অন্যদের আবেদন-নিবেদনের ফাঁকে কানু আর ফকির তাদের প্রার্থনা জানায়, কেউ কান দিচ্ছে মনে হয় না। ধরণী কয়েক মুহূর্ত নির্লিপ্তভাবে তাকায় তাদেব দিকে, তারা উৎসাহিত হয়ে ওঠে, মনে হয় ধরণী বুঝি

শুনছে তাদের কথা। তেমনি নির্লিপ্ত ভাবেই চোখ ফিরিয়ে নেয় ধরণী।

পিনাক সাহস করে সামনে এগিয়ে যায়, বলে, মোর একটা বিহিত করেন কত্তা, তুমি ধম্মোবাপ। মশাটারে মারতি নীলামের ছুটিশ কেনে, ডাকিয়ে এক থাপড় দিতেন। তোমার সাথে বিবাদ করে বুকের পাটা কার?

তুমি কে বটে?

তাকে চিনতে পারে না ধরণী!

পিনাক সামন্ত, হুজুর।

তাকে না চেনা হাস্যকর হত অন্য অবস্থায়, এখানে বেশ মানিয়ে যায়, জোতদার রাজার অবজ্ঞা আর চাষী প্রজার হা-হুতাশ-ঠাসা এই কাছারি-সভায়।

দুখীরামের বাপ এনা—মহেন্দ্র আরও চিনিয়ে দেয়।

মহেন্দ্র ধরণীর লোক, বিশেষ কোন দরকার বা দরবার তার নেই, এমনি এসে বসে আছে এক পাশে উবু হয়ে আনুগত্য জানাতে।

সে বলে, ওর ছেলের কত কাণ্ড। বিলের ধারের জমিটা ভাগে নিয়ে তেভাগা চাইছিল। তোমার মনে নেই ধরণী?

ধরণী একটু বিরক্ত হয়ে কড়া চোখে তাকায়।

মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি বলে, মনে তোমার অবিশ্যি আছে। তুমি কি ভুলবার না ভুল করবার মানুষ! ক্ষমা-ঘেন্না করতে চেয়ে নিজের লোকসান কর। তোমার কাছে ধান-টাকা কর্জ না পেলে কেউ বাঁচত?

মস্ত একটা ভুল চাল দিয়ে ফেলেও মহেন্দ্রকে বিশেষ দুঃখিত বা চিন্তিত মনে হয় না। ধরণী নিজেই তাকে বাহাল করেছে মোলায়েম বিরোধিতার ভূমিকায়। চাষীদের পক্ষ নিয়ে মহেন্দ্র মাঝে মাঝে ধরণীকে খোঁচা দেবে, সমালোচনা করবে। চাষীরা তাকে ভালবাসবে—তার কথা শুনে চলবে। সে অনেক চাষীকে বলি করে এনে দিয়েছে ধরণীর দরবারে। একটা ভুল করেছে বলেই চোখ রাঙালে চলবে কেন! তাকে ছাড়া তো উপায় নেই ধরণীর।

ধরণী চোখ বুজে মিনিট দুই তামাক টানে।

তোমার ও নীলামের ব্যাপারে আমি কিছু জানি না সামন্ত। যা বলার অশ্বিনীকে বোলো।

অশ্বিনী সিকদার ধরণীর কর্মচারী। সে যে হাজির নেই লক্ষ্য করেছিল সবাই। এতক্ষণে সকলের খেয়াল হয় যে বেলা হয়ে গেছে অনেক, আবেদন নিবেদন দরবারের ঘটা চলেছে রোজকার মতই কিন্তু কাজ বিশেষ এগোয়নি। যা হয়েছে সাদামাটা কাজ, ঘটি-বাটিটা বাঁধা রাখা, সুদ জমা দেওয়া, অনুগ্রহ মঞ্জুর পেয়েও যারা ক'দিন ধরে হাঁটাহাটি করছে তাদের দু-এক জনের নিষ্পত্তি করা। তোরাবদের দেড়ভাগির আর শ্রীনাথের মল বাঁধার টাকা থেকে আগাম সুদ কেটে রাখার প্রতিবাদ ছাড়া কোন বিশেষ বা নূতন নালিশ প্রার্থনার মীমাংসায় স্পষ্ট রায় দেয়নি ধরণী। নছিবনের নাকছাবিটি হাতেই আছে জৈনুদ্দীনের। আগামী ফসলের ভাগ বেচে দিয়ে আজই নীলমণি চলে যাবে গাঁ ছেড়ে, পড়তা বা দর কিছুই সে জানতে পারেনি এখনো। ধরণীর শর্তেই আপোস চেয়ে বসে আছে গড়পার বিষ্টু মালিক আর কান্দুলির সোনামদ্দি সরদার; শর্ত দূরে থাক, আপোস মানবে কি না ধরণী তাও তারা জানে না।

সিকদার মশায় এসবেন না সরকার মশায়?

এসবে, এসবে।

কুয়াশার চিহ্ন নেই বাইরে, শীতের গোড়ার দিকে তাজা চনমনে রোদ। নতুন বাছুরটা থেকে থেকে তড়পাচ্ছে সামনের মাঠে, গায়ে যেন তার সাদা লোমের ফেনা মাখানো। বন্যা আর বড় মন্বন্তরে চাকা-ভাঙ্গা জীবনযাত্রার চাষাড়ে যানটি প্রায় অচল হয়েছে শোষণ আর অব্যবস্থার পাহাড়ে ঠেকে, এইখানে যাত্রা শেষ কি না জানে না কেউ—আঁচড়ে কামড়ে রক্তাক্ত হয়ে আছে বুকগুলি, সর্বদা

জলে। ধরণীর এই কাছারিতে অল্প প্রত্যাশা নিয়ে এসে বসে থাকতে থাকতে সমস্ত আশা-ভরসার লেশটুকু পর্যন্ত উপে গিয়েছে, ভগবান এবং আল্লাও যেন এই তাজা রোদের উজ্জ্বল সকালে অস্ত গেছেন চিরতরে।

তবু কাছাকাছি এসে বসেছে যখন সকলে তারা, চিন্তাভাবনা ভুলেই যেন নিজেদের মধ্যে ধীরে-সুস্থে তারা আলাপ করে নিরুত্তেজ শান্ত কণ্ঠে, ধৈর্যের যেন তাদের সীমা পরিসীমা নেই।

পরস্পরের ঘরোয়া সুখদুঃখের কথা।

ফসলের কথা।

তার মধ্যে অল্পে অল্পে আলাপের বিষয়টা আবার কেন্দ্রীভূত হতে থাকে রামপুরের ঘটনায়। সকলেই উৎসুক কৌতূহলী হয়েছিল ও-ব্যাপারে। অভাব অনটন রোগ শোক দুর্ভাবনার কথা যেন ক্রমে ক্রমে চাপাই পড়ে যায় রামপুরের ঘটনার আলোচনায়। ওই নিয়েই বলাবলি করে সকলে। প্রতাপ দীঘিকে দীঘি বলা হলেও আসলে সেটা প্রকাণ্ড একটা বিল, এক ক্রোশ চওড়া দেড় ক্রোশ লম্বা হবে। কবেকার দীঘি, কোন রাজা বা নবাব বানিয়েছিল অথবা প্রকৃতি নিজেই সৃষ্টি করেছে কেউ জানে না। বিলের চারি দিকে ঘুরলে বোঝাও যায় না মানুষ কোন দিন বাঁধ দিয়েছিল কি না অথবা এমনিই কিছু বাঁধের মত উঁচু হয়ে আছে বিলের চারি দিকের মাটি।

বর্ষায় থৈ থৈ করছিল বিলটা বিনা নোটিশে যখন সর্বনাশা লোনা জলের বন্যা এল। প্রায় সমতল হল দিক্-দিগন্তে ছড়ানো অথৈ বন্যা আর বিলের জল, কিছু লোনা হল বিলের জল, তবে খুব বেশী নয়।

পরের বর্ষায় প্রায় কেটে গেল বিলের জলের অল্প লোনা স্বাদটুকু!

ডোবা পুকুর দীঘি ভাসিয়ে সাফ করে নিয়ে গেছে বন্যা। মাছ গিজ-গিজ করছে প্রতাপ বিলে। জগদীশের ম্যানেজারের হাতে টাটকা কড়কড়ে নগদ টাকার অনেকগুলি নোট গুনে দিয়ে বিলটা জমা নিয়েছে মদন দাস। সে আবার বিলটা বিলি করে দিয়েছে জেলেদের কাছে মোটা সেলামী আর চড়া বন্দোবস্তে, নগদ পেয়েছে খুব কম, কারণ জেলেদের তখন আধ পয়সা নগদ দেবার সাধ্য

ছিল না কয়েকজন ছাড়া। তাতে ক্ষতি বা আপত্তি ছিল না মদন দাসের—অগ্রিম যে বেশী পায়নি সেটা ভাল করেই পুষিয়ে নিচ্ছে।

এদিকে জলের অভাবে ফসল বাঁচে না চারিদিকের শত শত বিঘা জমিতে। আগের বছর উর্বরা ক্ষেতকে বন্যা মেরেছে, পরের বছর মেরেছে অসময়ে অতিবৃষ্টি আর সময়ে অনাবৃষ্টির দাপটে এ বছরও মারতে চাইছে কৃপণ আকাশ, পক্ষপাতী ইন্দ্র। তা চাষীরা ভাবে কি, দেবতা এক হাতে বজ্রের কারবার করুক, আরেক হাতে করুক অপ্সরাদের বস্ত্রহরণ, তাদের একটু জল পেলেই হয়! লাখো লাখো সবুজ চারা শীষ বিয়োতে উদ্যোগী হয়েও রসের অভাবে বিবর্ণ হতে হতে বাতাসে দুলছে, শুকিয়ে মরবে, না যা হবে কতগুলি জীবন্ত দানার? বিলের কিছু জল পেলে তারা বাঁচে—বাঁচাতে পারে কয়েকজন মানুষকে।

তাই, চাষীরা চাইল, প্রতাপ বিলের জল কিছু তাদের ক্ষেতে আসুক। মদন দাস বলল, বিল থেকে এক ফোঁটা জল অপচয় হলে হাজার হাজার টাকার মাছ প্রাণত্যাগ করবে! জল দেওয়া চলতে পারে না।

চাষীরা বলল, ধম্মোবাপ! এক হাত দেড় হাত জল নামা হলে কি হবে মাছের? জলের খাজনা নেন, জল দেন।

কিন্তু বিলের মাছদের প্রতি বড়ই দরদ মদন দাসের, জল কমিয়ে তাদের অসুবিধা ঘটাতে সে রাজী নয়! তার খাস জমিতে আর তার বর্গাদের জমিতে বিল থেকে জল সেঁচে দেওয়া হচ্ছে, অন্যের জমির ফসল নিয়ে তার মাথা-ব্যথা নেই।

সে বলল, জল কি আমার? জেলেদের জমা দিয়েছি, ওরা জলের মালিক।

মরিয়া চাষীরা একদিন পাড় কেটে বার করতে গেল জল। জেলেদের দিক থেকে বিশেষ বাধা এল না, মদনের আদায়ের বহরে মাছ ধরে তাদের বিশেষ সুবিধা হচ্ছিল না। মাছ ধরার শর্ত ব্যবস্থার অদল-বদল চেয়ে বার বার ধর্না দিয়ে ফল পায়নি। মদনের ভাগ্নে বীরেন আর চোপীন জেলের উস্কানিতেও

কয়েক জন ছাড়া জেলেরা হাত গুটিয়ে রইল। মারামারি হল এক রকম মদনের লোক আর চাষীদের মধ্যে।

কিন্তু সরকারী হিসাবে সেটা দাঁড়াল চাষী ও জেলেদের মধ্যে দাঙ্গা। খবরের কাগজে রিপোর্টও বার হল সেই ভাবে।

এ সব জানা কথা। টাটকা খবর হাসপাতালে আহত বীরেনের মৃত্যু আর বলা নেই কওয়া নেই রামপুর ছেড়ে পুলিসের অন্তর্ধান।

তিনু বলে ভূষণ আর তোরাবকে, বিত্তান্ত শুনি নাই সব। চাষী আর জেলেরা না কি একজোট হয়েছে এই মাত্তর খপর।

ভূষণ বলে জৈনুদ্দীনকে, চাষী আর জেলেরা না কি একজোট হয়ে আপোস-টাপোস কি করে ফেলেছে।

জৈনুদ্দীন জানায় বিষ্টুকে, মিট-মাট করিয়েছে বুঝি চাষী আর জেলেরা একজোট হয়ে—চেপেছে মদনকে। তাই সরে গেছে পুলিস!

মুখে মুখে জানাজানি হয় যতটুকু জানা গেছে। মুখে মুখে বলাবলি হয় অনুমান।

যা বলেছ। গাঁয়ের মানুষকে জোট বাঁধতে দেখলে আর থাকে?

বাবা, ভোলে নাই তো সে সনের শিক্ষে!

চটপট পালিয়েছে ল্যাজ গুটিয়ে! কি জানি কি হয়।

অনুমানটাই স্পষ্ট রূপ নিতে নিতে প্রায় সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে দাঁড়িয়ে যায় যে রামপুরের চাষী আর জেলেদের জোট বাঁধতে দেখে পুলিস ভয়ে সরে পড়েছে গাঁ থেকে।

তারপর আসে অশ্বিনী।

গায়ে পুরোনো র‍্যাপার, মাথায় কানঢাকা গোল উলের টুপি, মোজা-পরা পায়ে ধূলিধূসর চটিজুতো। মানুষটা রোগা, মুখে একটা যাতনা-ভরা বিমর্ষতার চিরস্থায়ী ছাপ।

তাকে দেখেই সাগ্রহে ধরণী বলে, হল?

না বাবু।

শুনে বিমর্ষ হয়ে যায় ধরণী।

নিজের জায়গায় বসে অশ্বিনী, ধরণীর ডান পাশে সামনের দিকে অল্প তফাতে, তার দিকে পাশ করে। এ ভাবে বসে কাজের সুবিধা হয়। বাঁয়ে মাথা ঘোরালে ধরণীর সঙ্গে মুখোমুখি হয় অথচ মুখটা প্রায় চোখের আড়াল হয় উপস্থিত লোকদের, ডাইনে মুখ ঘোরালে মুখোমুখি হয় ওদের সঙ্গে। ধীরে সুস্থে ঢিমে তালে প্রায় যেন ঝিমিয়ে ঝিমিয়েই সে চটপট কাজ সারে, কোন বিষয়ে তার দ্বিধা সংশয় নেই। মাঝে মাঝে কিছু বলার আগে হয়তো দু-একটা কথা বলে নেয় ধরণীর সঙ্গে, হয়তো শুধু একবার তাকিয়ে নেয় চোখে চোখে।

নীলমণি মিনতি জানায়, সিকদার মশায়, আইজ বেলাবেলি রওনা না দিলে মারা পড়মু।

অত তাড়া কেন হে বাঙ্গাল, অশ্বিনী বলে টেনে টেনে, বেলা যায় নাই। দেন তো ওর হিসাবটা মিটিয়ে সরকার মশায়। চার দেড়ে ছমণ আটের দরে ছত্রিশ টাকা। ছাটাই মাড়াই খরচ-খরচা বাদে তিরিশ টাকা দেন রসিদ নিয়ে।

ইটা কি কন?

নীলমণি বলে ভড়কে গিয়ে, বিঘায় দেড় মণ ধরলেন আধা ভাগ, চার পাঁচ মণ ফসল হয়? দর দিলেন ছ টাকা।

তোমার দেখি মাঠে ফসল গোঁফে তেল!

অশ্বিনী বিড়ি ধরিয়ে বলে, ভগবান না কি তুমি পাকতে পাকতে কিছু হবে না ফসলের জেনে রেখেছ? দর কি দাঁড়াবে তাও জেনেছ? ঠিকানা রেখে যাও, ধান বেশী হয়, দর বেশী হয়, পাওনা টাকা মনিঅর্ডারে পাবে।

গোপাল ভাঁড়ের মতই যেন রসিকতা করেছে একটা এমনি ভাবে কয়েকজন হেসে ওঠে।

হাসপাতাল হয়েই বাড়ি ফেরে ঘনশ্যাম। বারতলার ছোটখাটো লোক-দেখানো হাসপাতাল, একটি পাকা ঘর ও একটু চালা। ওষুধ বা পরামর্শ কিছুই পাওয়া গেল না, সময় পার হয়ে গেছে। আটটার আগে না এলে ও-সব মেলে না।

বেদম জ্বরটা ছেড়েছে ডাক্তারবাবু, তবু বড় বেশী রকম ছটফট করছে—

কাল এসো, কাল।

বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে সে মড়া-কান্না শুনতে পেল। কয়েকটি স্ত্রীলোকের গলার মধ্যে দয়ার গলাটি সবচেয়ে তীক্ষ্ণ ও স্পষ্ট।

গাঁদাও কাঁদছে জায়ের সঙ্গে।

৫

বিষ্ণু চক্রবর্তীর বাড়ি সদর টাউনে। শুধু এই এলাকায় নয় আরও ছড়ানো তার নাম, লোকে শ্রদ্ধা করে, বিশ্বাস করে। তেভাগা আন্দোলনে জেলে গিয়েছিল, সদ্য ছাড়া পেয়েছে।

দুচারদিনের মধ্যে তার এদিকে আসার কথা। একটা জাঁকাল রকম সম্বর্ধনা জানাবার আয়োজন হচ্ছে। পয়সা খরচের হিসাবে নয়, লোক জমানোর হিসাবে জাঁকাল সম্বর্ধনা।

তা, খবর পেলে লোক জমবে তাতে সন্দেহ নেই।

নন্দর ডিসপেনসারিতে বসে এই কথাই কৈলাস আলোচনা করছিল, এমন সময় এল গাঁদা। সঙ্গে কেউ নেই, অল্প একটু ঘোমটা টেনে একলাই এসেছে। উত্তেজনা চেপে রাখতে নিশ্বাস ফেলছে ছোট ছোট।

দেখতে গেছলেন কাল? কেমন আছে?

ভালোই আছে; শরীরটা একটু দুর্বল, সেরে যাবে।

গাঁদা আঙুলের কোণটা আঙুলে জড়ায়। তার আরও কিছু জিজ্ঞাস্য আছে।

চোখ তুলে ভুজঙ্গের দিকে একবার চেয়ে মাথা নামায়। মৃদুস্বরে বলে, বিষ্ণুবাবু ছাড়া পেল, আরেকজন কবে ছাড়া পাবে ?

ভুজঙ্গকে চুপ করে থাকতে দেখে তীব্র ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে কৈলাসের দিকে চেয়ে গাঁদা অভাবনীয় ব্যঙ্গ আর ঝাঁজের সঙ্গে আবার বলে, বুঝতে পারছ না কৈলেসদা ? তোমার খাতিরের ছোট শালা গো, শম্ভু নাম দিয়ে তোমরা যাকে জেলে পাঠিয়েছ।

নন্দের দিকে সে তাকায় না। বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে তার দিকে আধখানা পিছন ফিরেই থাকে। কুটুম সম্পর্কে সে শুধু কৈলাসের শালার বৌ নয়, তার সঙ্গে নিবিড় স্নেহের ঘনিষ্ঠতাও আছে। গাঁয়ের চেনা মানুষ জানা ডাক্তার, —নন্দের সঙ্গে এইটুকু তার সম্পর্ক। নন্দ যেন হাজির নেই এই ভানটুকু ছাড়া এই সুরে এমন ভাবে কথা কওয়া চলে না তার মত ছেলেমানুষ বৌয়ের।

কৈলাস একটু ভড়কে গিয়ে বলে, তোর ভাতারটিকে কেউ জেলে পাঠায়নি, শম্ভু নামও দেয়নি। সে নিজেই নাম ভাঁড়িয়ে জেলে গেছে। কিন্তু তুই কার কাছে শুনলি গাঁদা ?

তুমি আর কথা কোয়ো না কৈলেসদা। লক্ষ্মীদিকে সব বলতে পেরেছ, চেপে যাওয়া হল মোর কাছে ! কী মানুষ তুমি মাগো ! লক্ষ্মীদিকেও বলিহারি যাই। একটা মানুষের ছ-মাস খোঁজ নেই, দিবারাত্তির ভেবে মরছি—

জেলে আছে শুনে ভাবনা কমেছে নাকি ?

কমবে না ? মানুষটা যেখানে হোক বেঁচেবর্তে আছে হদিস মিলল, ধড়ে প্রাণ আসবে না ? অ্যাদ্দিন কি বলে কথাটা চেপে রেখেছিলে নিজেদের মধ্যে ?

যার কথা তারি হুকুমে। ওকে চিনতাম আমি, আমায় পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিল কাউকে কিছু বলতে পাব না। তোর কথা ভুলিনি, স্পষ্ট শুধিয়েছিলাম, গাঁদাকে চুপিচুপি বলব তো ? কিন্তু শালার হুকুম মেলেনি। পরিষ্কার বলে দিয়েছে তোকে জানালেও সাংঘাতিক বিপদ ঘটবে। আমি তবু লক্ষ্মী আর ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করেছিলাম, কি করা যায়। ওরাও

বললে, কেন মাস্টর ভাঁড়িয়েছে, কেন সবাইকে বলতে বারণ করেছে, এসব না জেনে চুপ করে থাকা ছাড়া উপায় নেই। শেষকালে হিতে বিপরীত হবে?

গাঁদা যেন কান খাড়া করে শোনে। নন্দের বিস্ময় কমতে চায় না। গাঁদাকে সে শক্ত তেজী মেয়ে বলেই জানত, কিন্তু এতটা জানত না। এমন একটি অল্পবয়সী বৌ একা তার ডিস্পেনসারিতে এসে এতখানি মুখরা হয়ে উঠতে পারে আবার এমন ধীর একাগ্র ঔৎসুক্যের সঙ্গে শুনতে পারে যে সব কথা তার হৃদয়কে তোলপাড় করে দিচ্ছে, এটা সত্যই নন্দের ধারণাতীত ছিল।

কৈলাস বলে, জানিস দিদি, জেলে একবার দেখা করতে যেতে পারিনি, সোজাসুজি খবর নিতে পারিনি। বাবুর আসল পরিচয় যদি ফাঁস হয়ে যায়! শম্ভু দাস নাম, পাকিস্তানের উদ্বাস্তু—একি আর ওরা বিশ্বাস করেছে। আগে কোনদিন কিছু করেনি, পয়সা কামাতে কলকাতা গিয়ে দু-তিনটে মাস একটু বাড়াবাড়ি করেছে, নামঠিকানা জানিয়ে দিলে অ্যাদ্দিনে বোধ হয় খালাস পেয়ে যেত। তোর ভাতারের নিজের মতলবটা কি জানা গেল না সেটাই হয়েছে মুশকিল।

ভাতার ভাতার করছ কেন?

ভাতার বলেই তো রোজগার করতে খেদিয়েছিলি।

ইস্! নিজের পেট নেই? নিজে বুঝি ন্যাংটো হয়ে থাকে? সব দোষ আমার, না?

কার দোষ তবে? এই শাড়িটা তো ছিল, ছেঁড়া ফ্যাঁসা কাপড় পরেছিলি কেন? কোঁদল করেছিলি কেন?

গাঁদা দু-হাতে মুখ ঢাকে।

তাও বলেছে তোমায়?

বলবে না? বেচারা গেল আদর করতে, শুনিয়ে দিলি চটাং চটাং কথা!

আঃ, চুপ কর না?

গাঁদাকে আজ যেন বেশীরকম কনে-বৌ মনে হচ্ছিল। এতক্ষণে নন্দ খেয়াল করে চেয়ে ছাখে যে গাঁদার গায়ে দামী কাপড় উঠেছে—বিয়ের শাড়ি

মিশরীর। এ কাপড় শখ করে সে পরেনি সেটা জানা কথা। গাঁয়ের পথে বার হবার মত সাধারণ কাপড় থাকলে গাঁয়ের মেয়ে-বৌ একরকম সাজ করে না। আর কাপড় নেই, লজ্জাও অভাব বোঝে না, উপায় কি! শুধু গাঁদা নয়, দু-একখানা যা তোলা ভালো কাপড় সম্বল ছিল তাই আজ আরও অনেককে পরতে দেখা যায়।

কৈলাস একটা বিড়ি ধরিয়ে বলে, তোকে খবরটা কে জানাল তা তো বললি না গাঁদা?

চিঠি লিখেছে।

চিঠি? ইদিকে আমায় হুকুম দিলে চুপচাপ থাকো, ডাকে চিঠি লিখল তোর কাছে?

ডাকে লেখেনি। বিষ্টুবাবুর হাতে পাঠিয়েছে। এই তো খানিক আগে সাঁতরাদের নতুন বৌ মাকে দিলে। হরিদা সদরে গেছিল, ওকে দিয়ে পাঠিয়েছে।

তাই বল! কী লিখেছে একটু বল তো শুনি?

গাঁদা ফিক করে একটু হেসেই আঁচল দিয়ে কপাল মুছবার ছলে মুখের হাসিটুকুও মুছে নেয়। হাসি দেখে কৈলাস খুশী হয়, নিশ্চিন্ত হয়। হাসির এই ঝিলিকটুকুই প্রমাণ দিয়েছে যে নিরুদ্দেশ মহিমের জন্য অজানা অনির্দিষ্ট আশঙ্কার বিশ্রী পীড়ন থেকে সত্যই মেয়েটা মুক্তি পেয়েছে। মানুষটা জেলে আছে শুনেও তাই সম্ভব হয়েছে হাসিটুকু।

কৈলাস হেসে বলে, আরে লজ্জা কিসের? ভালবাসার কথা যা লিখেছে শুনতে চাইছি কি? অন্য কথা যদি বা লিখে থাকে ছুটো একটা, তাই একটু শুনিয়ে দে।

শোনাবার গরজ নেই। পড়ে দেখলেই হয়।

আঁচলের খুঁটে বাঁধা ছিল চিঠিটা। গিঁট খুলে চিঠিটা গাঁদা দ্বিধা না করেই এগিয়ে দেয়, তার মুখে শুধু একটু পোঁচ পড়ে লজ্জার।

পড়ব তো? কৈলাস তবু অনুমতি চায় আরেকবার।

দিলাম তো পড়তে ?

কয়েক লাইনের ছোট চিঠি—রসকষবিহীন। প্রাণেশ্বরী গাঁদা বলে যে শুরু ক'রেছে সেটাও যেন নেহাত নিয়ম রক্ষার জন্য—চিঠিতে বৌকে সম্বোধন করার এটাই চিরকেলে রীতি, তাই।—তুমি নিশ্চয়ই আমার উপর রাগ করিয়াছ, অন্ত নামে জেলে থাকায় এতদিন খবর দিতে পারি নাই, কৈলাসদার কাছে সব জানিতে পারিবা, তোমাদের জন্য সর্বদা মন কেমন করে। সাবধান, কাহারও নিকট এই চিঠির কথা প্রকাশ করিবা না।—এই হল চিঠি।

পড়ে কৈলাস বুঝতে পারে গাঁদা কি জন্য এত সহজে তাকে চিঠিটা পড়তে দিয়েছে।

বলে, এমনিতেই শালা হয়, নইলে শালা বলে গাল দিতাম। বৌকে যেন অফিসিয়াল নোট পাঠিয়েছে।

চিঠি প'ড়ে সে কি বলে শোনার জন্য গাঁদা উৎকর্ণ হয়েছিল, সে প্রতিবাদ করে বলে, বাঃ রে, লোকের হাতে লুকিয়ে পাঠালে, আবার কি লিখবে ?

তা বটে, তুই ঠিক বুঝে নিয়েছিস !

তুমি কি বুঝলে বল না ?

কি বুঝলাম ? বুঝলাম মোদের গাঁদার জন্য ছটফট করছে, খবর না জানিয়ে থাকতে পারল না।

গাঁদা হতাশার সুরে বলে, শুধু এই বুঝলে ? শিগগির ছাড়াটাড়া পাবে বলে খবরটা জানিয়েছে, ওসব কিছু নয় ?

কৈলাস উৎসাহিত হয়ে বলে, হাঁ হাঁ ঠিক কথা, তাও হতে পারে ! তুই ঠিক ধরেছিস দিদি। তুই ছাড়া ওর মনের কথা কে এমন করে ধরতে পারবে বল ?

গাঁদা খুশি হয়ে বলে, না এবার পালাই। মা টের পেলে ধুয়ে দেবে।

নন্দের বোঁন গঙ্গা মাঝখানে একবার ভেতরের দরজায় উঁকি দিয়ে তাকে ডেকে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি কথা সেরে আসতে ভিতরে গিয়ে খানিক পরে গঙ্গার সাথে সে বেরিয়ে আসে।

গঙ্গা বলে, আমি একটু ওপাড়ায় যাচ্ছি নন্দ। রায়েদের বৌটা নাকি বাঁচে কি মরে।

নন্দ বলে, সে তো জানি। কিন্তু তুই মিছেই যাচ্ছিস গঙ্গা, কিছুই করতে পারবি না। আমাকে ওরা মরে গেলেও ডাকবে না, ডাকলেও চিকিৎসা হতে দেবে না। ওরা চায় বৌটা মরে যাক।

তুমি যদি নিজে বসে থেকে জোর করে ওষুধ খাইয়ে ইনজেকশন দিয়ে—?

নন্দ মাথা নাড়ে—জোর করব কিসের জোরে? ঘোষদের সেজ বৌটা বিষ খেয়েছিল, ওরাও চেয়েছিল মরে তো মরে যাক। থানা-পুলিসের ভয় দেখিয়ে জোর করে গিয়ে বসে চিকিৎসা করেছিলাম। কিন্তু এ যে অসুখ। বিনা চিকিৎসায় খুন করলেও কারো কিছু বলার নেই, করারও নেই।

গঙ্গা এক মুহূর্ত ভাবে। নন্দের চেয়ে সে মোটে বছর দেড়েকের ছোট হবে, ছেলেবেলা থেকে পরস্পরের নাম ধরে ডাকার অভ্যাসটা বজায় রয়ে গেছে। ছিপছিপে দীঘল গড়ন, কালো রং, মাথায় সামান্য কোঁকড়ানো একরাশি চুল—খোঁপাটা হয়েছে প্রকাণ্ড।

গুমোটের মত মুখে থমথমে ভাব। চাউনি দেখলে মনে হয় যে বুঝি কোন কারণে ভয়ানক রেগে আছে। কথা শুনলে এ ভুল ভেঙে যায়। আশ্চর্য রকম ধীর শান্ত আর সুমিষ্ট তার গলার আওয়াজ।

এক কাজ করা যাক্ না নন্দ? আন্দাজে ওষুধ দিয়ে দে না, পারি তো খাইয়ে দেব? ইনজেকশন দরকার হলে তাই বরং ঠিকঠাক করে আমায় দিয়ে দে। এমনি তো মরবেই, যদি বাঁচানো যায়—?

নন্দ একটু হাসে, এত শেখালাম পড়ালাম, শেষে এই তোর বিদ্যে হল? জোর করে ওষুধ খাওয়াবি, ইনজেকশন দিবি! মরে গেলে তোকে যখন খুনের দায়ে ফেলবে, তখন কি হবে? আমার ভাই ডাক্তার, ভাই-এর কাছে ডাক্তারি শিখেছি বললে তো শুনবে না লোকে।

যা পারে করবে আমার। বৌটা তো বাঁচবে।

নন্দ চুপ করে থাকে। গঙ্গার এটা বড়াই নয়, নিছক মুখের কথা নয়।

নিজের ভালোমন্দ সম্পর্কে এই চরম অবজ্ঞাটুকু সম্বল করেই সে দু-বছর আগে স্বামীর ঘর ছেড়ে ভাই-এর কাছে চলে এসেছিল।

দু-বছরে হতাশা কাটাতে পেরেছে কিন্তু নিজের সম্পর্কে এই বেপরোয়া উদাসীনতা আজও তার ঘোচেনি।

গঙ্গা বলে, তবে শুধু একটু দেখেই আসি। বলে-কয়ে যদি কিছু করা যায়।

গাঁদা আর গঙ্গা চলে গেলে তীব্র আপসোসের সঙ্গে কৈলাস বলে, সত্যি মারছে বৌটাকে। লক্ষ্মীও তাই বলছিল। বাঁচানো যায়, অথচ তাকে মরতে দেওয়া? এতো খুন ভাই!

খুন বৈ কি। সংসারে এমন কত খুন হচ্ছে।

একটু থেমে নন্দ যোগ দেয়, এরা চিকিৎসা না করিয়ে মারছে। চিকিৎসার অভাবে যারা মরে?

কৈলাস বলে, খেতে না পেয়ে যারা মরে?

তারা স্থির দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে চেয়ে থাকে।

মহিমের ব্যাপারের খাপছাড়া জটিলতাটুকু সত্যই মহিমের নিজের সৃষ্টি।

রোজগারের চেষ্টা করার জন্যই মহিম শহরে পালিয়েছিল, আর কোন উদ্দেশ্যই তার ছিল না। শহরে গিয়ে পয়সা কামাবে, গাঁদাকে বুঝিয়ে দেবে সে অপদার্থ নয়। ঠিক এই কারণে এভাবে একটা জোয়ান ছেলের পক্ষে ঘর ছাড়া খুবই সাধারণ ব্যাপার।

তার উৎসাহ আর আত্মবিশ্বাস দেখে এ প্রশ্ন মনে জাগা সম্ভব ছিল যে এও কি সেই বহুপরিচিত কাহিনীর পুনরাবৃত্তি, এও কি সেই অনভিজ্ঞ রোমান্টিক তরুণের অজানা জগৎকে জয় করতে বুক ঠুকে বেরিয়ে পড়ার অ্যাডভেঞ্চার? কিন্তু মহিম তো চাষীর ছেলে, সে কোথায় পাবে এই অবাস্তব আশা আর দুঃসাহস, মিথ্যা স্বপ্ন আর কল্পনার রসেই যা পুষ্ট হয়? পেটের দায়ে গাঁ থেকে দলে দলে যারা রোজগারের আশায় শহরে যায়, তাদের হাল কি সে জানে না? জন্ম থেকে

মাটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে সে বড় হয়েছে, সে কি খবর রাখে না গাঁয়ে হোক শহরে হোক তাদের স্তরের মানুষের দু-পয়সা রোজগার করাটাই কি কঠিন কাজ ?

রোজগার করতে সে শহরে যাক, বাপভাই এককালে সম্পন্ন চাষী ছিল এবং এখন পর্যন্ত খানিকটা তাদের আড়ালে থেকেছে বলে অভাবের আসল চাপটা সোজাসুজি না বুঝে বৌয়ের কাছে পৌরুষ বজায় রাখতেই যাক, কিন্তু সে ভুলে যাবে কোন্ হিসাবে যে কাজটা মোটেই সহজ হবে না ? এভাবে সে কি করে যাবে যেন অ্যাডভেঞ্চার করতে বেরিয়েছে, ভয়-ডর-চিন্তাভাবনার কারণ নেই, বেরিয়ে পড়াটাই একটা রোমাঞ্চকর ব্যাপার ?

বাড়িতে কিছু জানাবে না এই শর্ত করে নিয়ে মহিম কৈলাসের কাছে আশ্রয় নিলে তার নির্ভয় নিশ্চিন্ত উল্লাসের ভাব দেখে এই প্রশ্ন কৈলাসেরও মনে জেগেছিল। কিন্তু সে কিনা নিজেও চাষীর জগতের মানুষ এবং মহিমকে সে কিনা খুব ভালো করেই চিনত, তাই সে ছেলেটাকে অভিনব একটা ব্যতিক্রম বলে ধরে নিয়ে প্রশ্নটা বাতিল করে দেয়নি।

সোজা এবং মোটা খাঁটি মানেটাই ধরতে পেরেছিল।

বাস্তব অভিজ্ঞতার অভাবটা সব ক্ষেত্রে সবার কাছেই এক ব্যাপার। খানিকটা একপেশে বাস্তববোধ জন্মায় বলেই চাষীর ছেলের বেলা নিয়মটা অন্য রকম হয়ে যায় না। চাষীর বাস্তববোধ কি ঠেকিয়ে রাখতে পেরেছে স্বপ্নের চেয়েও খাপছাড়া কুসংস্কার, আত্মহত্যার চেয়েও যুক্তিহীন অন্ধ বিশ্বাস ? মহিম সবই জানে কিন্তু তার যে অভিজ্ঞতা নেই ! বাপভায়ের সাথে চাষের কাজে হাত লাগিয়েছে, শহরে রোজগার করতে নিজে সে তো আসেনি কোনদিন। অন্য অনেকের ভাগ্যে কি ঘটেছে সে জানে, কিন্তু তার বেলাও যে ঠিক ওই রকম ঘটবে তার কি মানে আছে ? এমন তো নয় যে গাঁ থেকে শহরে পয়সা কামাতে এসে একজনের ভাগ্যেও শিকে ছেঁড়েনি।

শহরে এসে অনায়াসে উপার্জনের পথ খুঁজে পেয়েছে এমন লোকও তো আছে দু-চারজন।

তার বেলাই বা সেটা ঘটবে না কেন ?

অনায়াসে নাই বা ঘটল, প্রাণপাত করতে সে তো অরাজী নয়, কষ্ট করেই সে নয় পথ খুঁজে নেবে।

মহিমের কথাবার্তা থেকেও এটা বোঝা গিয়েছিল। কি করবে কিছুই সে ভেবে আসেনি। একটা কিছু করবে। যেমন হোক একটা কিছু।

বিরাট শহর বিপুল সমারোহ বিশাল জনসমুদ্র তাকে দমিয়ে দেয়নি বরং আশা আর উৎসাহ বাড়িয়ে দিয়েছে। যেখানে এমন অসংখ্য রকম উপার্জনের উপায়, সেখানে তার কি একটা উপায় হবে না?

শহর অবশ্য তার একেবারে অজানা অচেনা ছিল না। অনেকবার এসেছে, দু-চারদিন থেকে গিয়েছে। কিন্তু সে যেন ছিল অন্য একরকমভাবে আসা আর যাওয়া—পরের মত একটু শুধু উঁকি মারার জন্য। এবার সে এসেছে শহরের আপন হতে, শহরের লাখ লাখ মানুষের সংখ্যা আরেকটি বাড়াতে, স্থায়ীভাবে এখানকার জীবনস্রোতে মিশে যেতে।

সে বলেছিল, উঁহুঁ কিছু না করে বাড়ি ফিরছি না কৈলাসদা। এসে ভালো করেছি। আর কত সয়ে গাঁয়ে পড়ে থাকা যায় বল তো? নিজের বৌকে একটা কাপড় দিতে পারি না, অপমান হতে হয়! সেলাই-করা ছেঁড়া কাপড় ফেঁসে যাবে আর রাত দুকুরে কাঁদাকাটা গালাগাল শুনতে হবে!

কৈলাস ব্যাপারটা অনুমান করে বলেছিল, বটেই তো। আদর করতে বৌকে টানব, তার কাপড় যাবে ফেঁসে। আদর করা চাঙে উঠবে, বৌ রেগে-মেগে কেঁদে-কেটে খালি বলবে, একটা কাপড় দেবার মুরোদ নেই, গোঁয়ারের মত গায়ের কাপড়টুকুও ফাঁসিয়ে দিতে পারেন।

বল তো কৈলাসদা? মানুষের সহ্য হয়?

বটেই তো। তাও আবার যেমন তেমন বৌ নয়, ভালবেসে বিয়ে করা বৌ।

মহিম গিয়েছিল চটে।

তোমাদের মুণ্ডু করা বৌ! কোত্থেকে তোমাদের মাথায় যে ঢুকল এটা! বিয়ের আগে চেনা ছিল, ব্যস্, অমনি পীরিত হয়ে গেল?

এ নিয়ে তামাসা করলেও মহিম বরাবর চটে গিয়েছে। কারণ বোধ হয় সে

নিজেই জানে না। বিয়ের আগেই গাঁদাকে সে ভালবেসেছিল এ যেন মস্ত দোষের কথা, তার একটা লজ্জাকর দুর্বলতার প্রমাণ। পাশের গাঁয়ের মেয়ে, মায়ের সঙ্গে কি রকম কুটুম্বিতার একটা সম্পর্ক আছে মেয়ের বাপের সঙ্গে, তাই না দেখা হয়েছে কথা হয়েছে মেয়েটার সঙ্গে তার, তাই না সে আমজাম পেড়ে দিয়েছে মেয়েটাকে, কাকডাকা ভোরে ফুল তুলতে বার হলে একবার কুকুর তাড়া করেছিল বলে ভোরবেলা ফুল তোলার সময় সাথে থেকেছে? পুজোর সময় বর্ষার ভরা জলাটার টলটলে জল দেখে কার না নাইতে সাধ যায়? একলা অতদূর নির্জন জলায় গিয়ে তো নাইতে পারে না মেয়েটা, তাই না সে তাকে নিয়ে নাইতে গিয়েছে? এসব করলেই ভালবাসা হয়ে গেল!

বিয়ের আগে একবার যদি সে টের পেত যে এসব থেকে তাদের ভালবাসা হয়েছে ধরে নিয়ে গাঁদার মাসী তার মাকে চেপে ধরেছিল আর লোচনের বিশেষ অনিচ্ছা সত্ত্বেও ইচ্ছামতী উঠেপড়ে লেগে গাঁদাকে বৌ করে ঘরে এনেছিল— মজাটা সে টের পাইয়ে দিত সবাইকে।

লক্ষ্মীর সঙ্গেও তামাসার সম্পর্ক। লক্ষ্মী ভড়কে যাবার ভান করে বলত, বল কি গো? কী মজা টের পাইয়ে দিতে? বিয়ে করতে না ওকে?

নাঃ!

তাতে অন্যের ক্ষতিটা কি হত? তোমরাই মজা টের পেতে! তা এক কাজ কর না? বিয়ে তো আর ফিরবে না, গাঁদাকে ছেড়ে দাও। আমিই ওকে পুষব'খন, করব কি! কিন্তু খপর্দার, দু-দিন যেতে না যেতে সুড়সুড় করে গিয়ে হাজির হলে ঠ্যাং খোঁড়া করে দেব।

এখনকার কথা বলছি নাকি!

তার মানে এই যে বিয়ের পর গাঁদার সঙ্গে তার ভালবাসা হয়েছে একথা যত খুশি বলুক সবাই মহিমের কোন আপত্তি নেই। বিয়ের আগেই ভালবাসা হয়েছিল এই মিছে কথা তুলে সবাই তাকে খোঁচাবে কেন?

কৈলাস বলেছিল, আহা বেশ তো, তাই নয় হল? বিয়ের আগে কিছু ছিল না তোমাদের, গাঁদাকে দেখলেই তোমার গা জ্বালা করত। এখন তো

ভালবাসা হয়েছে ? কিছু না বলে তোমার শালা পালিয়ে আসার কি দরকার পড়ল !

কে বললে পালিয়ে এসেছি ? পরিষ্কার বলে এসেছি কাজকম্মের খোঁজে যাচ্ছি। এখন কোথায় থাকি কি করি তা জেনে তাদের কি দরকার ?

ক-দিন ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছিল এদিক ওদিক। শনিবার এসেছিল কৈলাসের গাঁয়ে ফেরার সময়। আবার তাকে কথা দিতে হয়েছিল কৈলাসকে যে তার বিষয় বাড়িতে কিছু জানাতে পারবে না। এ বিষয়ে বেশ খানিকটা ভাবতে হয়েছিল কৈলাসকে, বিশেষ করে ভয়ার্ত অপরাধ আর বিপন্নতা বিষণ্ণতার প্রতিমূর্তি গাঁদাকে দেখার পর। তার সঙ্গে অন্য সকলের ভয়ভাবনাও দূর করতে পারে—অন্তত চুপি চুপি গাঁদাকে জানাতে পারে মহিমের খবর। মহিমকে কথা দিয়েছিল বলেই কৈলাসের মাথাব্যথা ছিল না, বিচার-বিবেচনা বাদ দিয়ে যন্ত্রের মত সব কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে এই গ্রাম্য কুসংস্কারে বহুকাল থেকেই আস্থা নেই কৈলাসের।

বিচারের বিষয় ছিল শুধু এই যে বাড়ির সকলকে জানাক বা শুধু গাঁদাকে জানাক—তার নিষেধ মেনে নিয়ে [illegible] কি ওরা চুপচাপ থাকতে পারবে ? ইচ্ছামতী কি টিঁকতে দেবে বাড়ির মানুষকে ? শুধু গাঁদাকে জানালে এখনকার মনের অবস্থায় সেও কি গোপন রাখতে পারবে কথাটা ?

কৈলাস জানত, মহিমকে ফিরিয়ে আনতে গেলে ফলটা হবে খারাপ।

শেষ পর্যন্ত চুপচাপ থাকাই ভালো মনে করেছিল কৈলাস। ছেলেমানুষি করেছে মহিম কিন্তু সময় সময় ছেলেমানুষকে ছেলেমানুষি করার স্বাধীনতা না দিয়েই বা উপায় কি ? মানুষের ভুল করার অধিকারকে পর্যন্ত তো মানতে হয় সংসারে !

ঘটনাচক্রে মহিমের সঙ্গে তার যোগাযোগ ঘটেছে, এইমাত্র। মহিম তার কাছে না গেলে নিজের জীবন নিয়ে তার নিজস্ব পরিকল্পনা আর পরীক্ষায় হস্তক্ষেপ করার কোন প্রশ্নই উঠত না !

সে তাই শুধু ভরসা দিয়েছিল সকলকে। গাঁদাকেও। ব্যাপারটা তুচ্ছ করে

দিয়ে ভাস্থিল্যের সঙ্গে বলেছিল, গিয়েছে যাক না? ব্যাটাছেলে দু-চার মাস ইদিক উদিক চরে বেড়াতে গেলে কি এসে যায়?

দু-চার মাস!

দেখতে দেখতে কেটে যাবে লো ছুঁড়ি, ভাবিস্ নে। রোজগারের পথ খুঁজে নেবে, রোজগার করবে, দুটো পয়সা জমাবে, তবে তো ফিরবে? সময় লাগবে না?

কৈলাস শহরে ফিরতেই মহিম সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করেছিল, সবাই কী করছে? কী বলছে?

কী করবে? খাচ্ছে দাচ্ছে ঘুমোচ্ছে!

আমার কথা কিছু বলাবলি করছে না?

করছে বৈকি। সবাই বলছে, আগে থেকেই মাথার চিকিৎসা করা উচিত ছিল। আর আমাদের গাঁদা—মুখখানা এমন গম্ভীর করেছিল কৈলাস যে মহিমের মুখ হাঁ হয়ে গিয়েছিল।

গাঁদা টুকটাক বাপের বাড়ি যাচ্ছে আর রায়দের বুনোর সাথে গুজগাজ ফুসফাস চালাচ্ছে।

মহিম হেসে ফেলেছিল।—তাই বল! আমি ভরিয়ে গেলাম, কিছু করে বসেছে বুঝি!

হাসির কথা নয়; টের পাবে। সোজা মেয়ে পাওনি ওকে। তুমি মজা করে পালিয়ে বেড়াবে, সে শুধু ঘরে বসে কাঁদবে ভেবেছ, না? ওই বুনোর সাথেই না শেষে ঘর ছাড়ে মেয়েটা!

তবু মহিম হেসেই চলেছিল। ক্ষোভে দুঃখ অভিমানে তার গাঁদা উদ্ভট আর খাপছাড়া অন্য যা কিছু হোক করেছে শুনলে হয়তো সে বিশ্বাস করবে, গাঁদা অন্য কারো দিকে তাকাবে, এর চেয়ে হাস্যকর তামাসার কথা তার কাছে আর কিছু নেই।

তামাসার জের টেনে কৈলাস শুরু করেছিল জেরা।

তামাসা নয়, সত্যি সত্যি জিজ্ঞেস করছি। অমন বৌটাকে ফেলে এসেছিস,—ভাবনাটাবনা হয় না? তুই ভেগেছিস জানলেই দু-চারজন নিশ্চয় নজর দেবে!

দিক না নজর। নজর দিলে কি গায়ে ফোস্কা পড়ে?

মন ভোলাবার চেষ্টা করবে তো!

করুক না। ভুলবার মন হলে ভুলবে, আমি তার করব কি? পাহারা দিয়ে মন ঠিক রাখতে হবে, অমন মন দিয়ে কাজ নেই বাবা!

ফিরে গিয়ে যদি কানাঘুষো কানে আসে?

সে তো আসতেই পারে। এটা ধরে ওটা ধরে বানিয়ে বানিয়ে রটাবার মানুষ গাঁয়ে আছে জানো না? তোমার নামেই তো শুনে এলাম। মুলো-ক্ষেতে লক্ষ্মীদির সাথে হাসিতামাসা করছিলে, হাত ধরে টেনেছিলে, নিধুর পিসী গিয়ে পড়েছিল তাই রক্ষা!

গাঁদার নামে যাই শোনো বিশ্বাস করবে না?

তোমার হল কি বল তো কৈলাসদা? ঐ এক কথা নিয়ে প্যাচাল পাড়ছ?

কৈলাসের মনে আছে, খুশি হয়ে সে বিড়ি ধরিয়েছিল। লোকে বলে সন্দেহ বাতিক নাকি পীরিতের সেরা প্রমাণ! মাঝে মাঝে ভাবত কৈলাস, লক্ষ্মী যেখানে সেখানে যায়, যার তার সঙ্গে মেলামেশা করে, শহরে হপ্তা কাটিয়ে গাঁয়ে গিয়ে মাঝে মাঝে কানাঘুষো কানে আসে, কিন্তু কই, মনে তো তার খটকা লাগে না একবারও! মহিমকে জেরা করে সে যেন নিজের মত আরেকজনকে আবিষ্কার করার স্বস্তি পেয়েছিল।

তাই বটে, বিশ্বাস ছাড়া ভালবাসা?

সে যেন রস ছাড়া রসগোল্লা, নুন ছাড়া ব্যঞ্জন!

সম-আদর্শবাদী আরেকজনকে আবিষ্কার করে খুশি হওয়ার আসল মানেটা অবশ্য কৈলাস জানে না। সে তো হিসাবে আনেনি লক্ষ্মী আর তার মধ্যে কি সম্পর্ক আর কি সম্পর্ক এই মহিম আর গাঁদার মধ্যে! লক্ষ্মী তার সামাজিক

ধারও ধারে না, ভাতকাপড়ের ধারও ধারে না—সন্দেহ অবিশ্বাস নিয়ে নিজে নিজে জ্বরে পুড়ে মরার বেশী তার কোন অধিকার নেই, মুখ ফুটে কথাটি কওয়ার পর্যন্ত নয়! তাই না তার এত ঝোঁক অন্ধ বিশ্বাসের দিকে, এত দরকার নির্ভেজাল বিশ্বাস বজায় রাখার।

দু-তিন সপ্তাহ কাটে কি কাটে না মহিমের আবেগময় উৎসাহ উদ্দীপনা ধোঁয়ার মতই শূন্যে উপিয়ে দেয় মহানগরী, মুখ থেকে মুছে নেয় অহেতুক আশা আনন্দের জ্যোতি। বিয়ের আংটি-বেচা পয়সা আসে ফুরিয়ে, ট্রামে বাসে শহর চষে বেড়ানোটা বেড়ানোর পর্যায় থেকে নেমে আসে কষ্টকর হাঁটাহাঁটির প্রক্রিয়ায়, দেহ টের পেতে শুরু করে শ্রান্তি ক্লান্তি আর খিদে কাকে বলে, মন আবার নতুন করে জানতে থাকে অনেক দিনের জানা কথাটা যে সংসারে মানুষের বাঁচাটা বড়ই কঠিন করে দিয়েছে মানুষ।

কৈলাস জানত এরকম হবে।

বড় বড় কথায় মুখর ছেলেটা চুপচাপ হয়ে আসবে, শুকিয়ে শরীরটা রোগা হয়ে যাবে, মুখে দেখা দেবে রুক্ষ কঠিন ভাব, চোখে ফুটবে নালিশ আর জ্বালা। সেও খোঁজাখুঁজি করছিল যদি কিছু জুটিয়ে দেওয়া যায় মহিমকে। কিন্তু আসল মুশকিল ছিল এই যে এতকাল মহিম শুধু বাপদাদার সঙ্গে চাষের কাজেই হাত লাগিয়েছিল, অন্য সব কাজেই সে একেবারে আনাড়ি।

শেষ পর্যন্ত তাকে যেখানে হোক শিক্ষানবীশ মজুর হয়ে ঢুকতে হবে সন্দেহ ছিল না কৈলাসের। কিন্তু সেটাও যেমন ছিল খোঁজখবরের ব্যাপার তেমনি দরকার ছিল মহিমের এরকম কাজ মেনে নেবার মত অবস্থা তৈরি হবার।

মহিম কাজের চেষ্টায় ঘুরছে, ব্যর্থতার ক্ষোভে জ্বলছে, হতাশার সঙ্গে লড়ছে আর চুপচাপ শুকনো মুখে আকাশপাতাল ভাবছে—এই দেখে কৈলাস শনিবার বাড়ি গিয়েছিল। গাঁদার পরনে দেখেছিল আটহাত একটি নতুন শাড়ি, তার ভাই ভূতো অনেক চেষ্টায় যোগাড় করে দিয়েছে। আটহাতি কাপড় আঁট করে পরতে হওয়ায় তাকে দেখে টের পাওয়া যাচ্ছিল টানাটানির শাক-ভাত খেয়েও বিয়ের পর কি রেটে যৌবনের বাঁধুনি আসতে শুরু করেছে তার দেহে।

শহরে ফিরবার পর কেমন একটু আনমনাভাবে মহিম সকলের খবরাখবর জিজ্ঞেস করেছিল, খানিক উশখুশ করে আচমকা সুস্পষ্ট উদাসীনতার ভান করে শুধিয়েছিল, রায়দের বুনোবাবু গাঁয়েই আছে নাকি ?

যেন কথার কথা জিজ্ঞাসা করা, আর কোন মানে নেই, এমনি একটা ভাব দেখাবার চেষ্টা করেছিল মহিম। ভিতরে চমক লেগেছিল কৈলাসের, বাইরে সহজভাবেই বলেছিল, গাঁয়েই আছে। অসুখে ভুগছে খুব।

কী অসুখ ?

জ্বর আমাশা। মোদের ডাক্তার দেখছে।

ব্যাটার মরাই ভালো। খালি বাবুগিরি আর বজ্জাতি। নিজের বড় ভায়ের বিধবা বৌটাকে নিয়ে পর্যন্ত—

কৈলাস ধমক দিয়েছিল, ছি মহিম, ছি। তুইও শেষে শোনা কথা নিয়ে শুরু করলি ?

লোকটা তো বজ্জাত ?

সেটা কি তার ভাজের দোষ ? তোমার বৌয়ের দিকে নজর দিত, ওকে তোমার যত খুশী গাল দাও। আরেক বেচারা দুটো বাচ্চা নিয়ে ওর সংসারে মুখ গুঁজে আছে, তাকে মন্দ বলবে কেন ?

মনটা খারাপ হয়ে যায় কৈলাসের। মহিমের এ কি রকম কথাবার্তা ? গাঁদার উপর সহজ বিশ্বাসের জোরে এই তো সেদিন বুনোবাবু লোক ভাল কি খারাপ এ প্রশ্নটাই সে অনায়াসে তুচ্ছ করে হেসে উড়িয়ে দিতে পেরেছিল। খারাপ লোকে নজর দিলেই গায়ে ফোস্কা পড়বে না গাঁদার। বুনোবাবু হাজার চেষ্টা করেও এতটুকু পাত্তা পাবে না তার গাঁদার কাছে।

গাঁদার মন কেউ নরম করতে পারবে এটা একেবারে হাস্যকর কথা।

সেই মহিম এভাবে বুনোবাবুর খবর জিজ্ঞাসা করছে, বুনোবাবু বজ্জাত বলে তার গায়ে এমন জ্বালা ধরেছে !

দিন যায়। কত তাড়াতাড়িই যে নানাদিকে চোখ খুলতে থাকে মহিমের।

বিরাট শহরের বুকে ছড়ানো ক্ষোভের সঙ্গেও পরিচয় ঘটে, নিজের ব্যক্তিগত ক্ষোভের সঙ্গে সে এই সমবেত ক্ষোভের সামঞ্জস্য খুঁজে পায়।

মাঝে মাঝে তাকে বলতে শোনা যায়, দাঁড়াও সব চুরমার করে দিচ্ছি, উল্টে দিচ্ছি সব। খাটব, রোজগার করব, তাও করতে দেবে না!

কৈলাস আশ্চর্য হত না। শহরের লক্ষ লক্ষ নিপীড়িত জীবন যে চুম্বকের মত বিচ্ছিন্ন লোহাটিকে টেনে নিয়ে বিক্ষোভের ধর্ম আরোপ করবে সেটাই তো স্বাভাবিক। তার কথার ঝাঁজ ও উগ্রতায় সে শুধু একটু চিন্তিত হত।

মাস তিনেক পরে একটা সাধারণ ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানায় শিক্ষানবীশ মজুর হয়েই ঢুকেছিল মহিম—শম্ভু দাস ছদ্মনামে, উদ্বাস্তু পরিচয় দিয়ে।

আত্মপরিচয় গোপন করার রহস্য তার সেইখান থেকে শুরু—জেলে যাবার কথাটা হিসাবে ধরেছিল।

প্রথমে রোজগারের অঙ্ক শুনে হিসাবপত্র করে বলেছিল, এ তো বেশ ব্যাপার হল! এতে আমারি তো চলবে না!

এর বেশী জুটবে না গোড়ায়।

বৌকে একটা শাড়ি দেবার সাধ্যি হবে কবে?

একদিন হবে। তোমারও হবে, সবারি হবে। আপাতত নিজের পেটটা চলুক!

তাই হোক। মহিম রাজী হয়েছিল। কলকাতায় থাকা তো চলবে।

আমার কথা বলেছ নাকি কৈলাসদা?

না বলিনি কিছু। খবর পেলাম লোক নিতে পারে, কাঁচা হাত। চেনা লোক আছে একজন, তাকে বললে হয়ে যাবে।

তখন মহিম নাম বদলের কথা জানিয়েছিল। কৈলাস আশ্চর্য হয়ে বলেছিল, কেন, নাম ভাঁড়াবে কেন?

লড়াই করব।

লড়াই করবে তো নাম ভাঁড়াতে যাবে কেন?

কারণ আছে, সে তুমি বুঝবে না কৈলাসদা।

বুঝিয়ে বললেই বুঝি !

মহিম কথা ঘুরিয়ে নিয়েছিল : অন্য নামে কাজ পাব না ?

কাজ পাবে না কেন ? নাম ভাঁড়াবার দরকারটা কেন হচ্ছে একটু বল না শুনি ।

দরকার নিশ্চয় আছে । নইলে কি খেলা করছি ?

মহিমও বুঝিয়ে বলেনি, আজও ব্যাপারটা খোলসা হয়নি কৈলাসের কাছে । নানা কথা মনে হয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে লাগসই ঠেকেছে যেটা সেটা হল এই যে ছেলেমানুষী বুদ্ধি খাটিয়ে সে বাড়ির মানুষ আর গাঁদাকে হাঙ্গামার হাত থেকে বাঁচাতে চেয়েছে । তাকে যদি কোন হাঙ্গামায় পড়তে হয় অন্যায় অবিচার অব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে, ওদের যেন কোন ঝঞ্ঝাট না পোয়াতে হয় ।

এসব পুরানো কাহিনী । কিন্তু বেশীদিনের পুরানো নয় ।

ঘরের দিকে হাঁটতে হাঁটতে রায়দের বাড়ির কাছাকাছি এসে কৈলাস শুনতে পায়, বিধবা মেজ বৌটা মারা গেছে । কিন্তু বিনা চিকিৎসায় যাকে মারা হল, তার জন্য কে কাঁদছে, কেন কাঁদছে ?

৬

শুভর দেশে ফেরা উপলক্ষ্যে কলকাতায় সম্ভ্রান্ত আত্মীয়বন্ধুদের একটা প্রীতি ভোজ হবে ঠিক ছিল । শুভর জন্যই ক্রমাগত পিছিয়ে যাচ্ছিল দিন । তার শুধু সময়ের অভাব নয়, এরকম প্রীতিভোজেই তার আপত্তি । বিদেশে যাওয়া ভারি একটা ব্যাপার, তাই নিয়ে ভোজটোজ দেওয়া হাস্যকর নয় ? কিন্তু জগদীশও এদিকে ছাড়বে না ! উঁচুস্তরের বিশিষ্ট মানুষদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হলে এসব করা দরকার । শুভ শেষে রাজী, হয়—এক শর্তে । দেশ ফেরার বদলে উপলক্ষ্য হবে তার জন্মদিন ।

নন্দ যাতে এই উৎসবে যায় সেজন্য শুভ পিড়াপিড়ি করে।

নন্দ বলে, তুমি ক্ষেপেছ? বিশ্রী বেখাপ্পা হবে না? সবাই ভাববে না হাঁসেদের মধ্যে এ বকটি আবার কে এল রে বাবা! মেশাল প্রীতিসম্মেলন হত, আমার মত আরও দশজন হাজির থাকত। সে ছিল আলাদা কথা।

নন্দ হাসে।—আমার জামাকাপড় পর্যন্ত নেই, গেঁয়ো বেশে যেতে হবে। তোমার বাবা ক্ষেপে যাবেন, ঘরের চালায় আগুন লাগিয়ে দেবেন আমার।

তুমি ছদ্মবেশে যাবে। আমার পোশাক তোমায় ঠিক মানাবে। কেউ টেরও পাবে না তোমার শুধু একটা ছুটো লংক্লথের পাঞ্জাবি সম্বল।

কিন্তু আমি যে চালচলন রীতিনীতি কিছুই জানি না ভাই? ময়ূরপুচ্ছধারী কাকের দশা যদি হয়?

শুভ নাক সিঁটকে বলে, সাধে কি বলি গেঁয়ো হলেই ভীতু হয়? তোমরা ভীতু বলেই শহুরে বড়লোকরাই শুধু এদেশে নেতা হয়।

নন্দর রং কালো, ছেলেবেলার বসন্তের কিছু কিছু দাগ থাকলেও তার মুখের গড়নটার মধ্যেই একটা অদ্ভুত জীবন্ত ভাব। টানা না হলেও তার যেরকম বড় বড় চোখ সেটা কেবল বিশেষ জাতের বুনোদের আর মাঝে মাঝে ধাঙ্গর মেথর মুচিদের মধ্যে ছাড়া চোখে পড়ে না।

চোখে ভর্ৎসনা ফুটিয়ে রেখে নন্দ বলে, ভীতু? গাঁয়ের লোক? তুমি জটিল কথা বোঝ সহজ কথা বুঝতে পার না। এ পর্যন্ত শহুরে বড় বড় লোক নেতা হয়েছে সত্যি। তাতে কোন ভুল নেই। কিন্তু নেতা কি তারা হয়েছে টাকার জোরে সাহসের জোরে কালচারেব জোরে? গেঁয়ো লোকের সাহসটাই তাদের একমাত্র জোর। একজন নেতার নাম কর তো গাঁয়ে ভীতু মানুষেরা পিছনে না দাঁড়ালেও যিনি নেতা হতে পেরেছেন? নেতারা শুধু জেলে যান, গেঁয়ো লোকেরা প্রাণ দেয়।

শুভ একটা সিগারেট ধরিয়ে বলে, তুই সত্যি ভারি ঝগড়াটে।

তুই তো ঝগড়া বাধাস।

নন্দর বোন গঙ্গা চা এনে বলে, তোমাদের ঝগড়া হচ্ছে নাকি?

দামী নতুন টি-সেটটার দিকে চেয়ে মুখভার করে বলে, আমার জন্য আনা হয়েছে বুঝি ?

গঙ্গা বলে, এগুলি কেনা নয়, চরণ ঘোষ আমাকে প্রেজেন্ট দিয়েছে। কলকাতায় খাবার বেচে খুব পয়সা কামায়, ভাল ভাল জিনিস খায়। দেশ-বাড়িতে এসে শাকচচ্চরি খেলেই ওর কলিক হয়। কি দরকার তোর ওসব খাবার ? মাছ-দুধ খেলেই হয়। তা বলে কি, মাঝে মাঝে দুএকদিনের জন্য গাঁয়ে আসি, শাকচচ্চরি না খেলে তৃপ্তি হয় না !

গঙ্গা চুপচাপ চা তৈরী করে কাপ এগিয়ে দেয়, তাকে চরণ ঘোষের দামী টি-সেট উপহার দেওয়ার সঙ্গে তার শাকচচ্চরি খেয়ে কলিক হওয়ার সম্পর্ক কি, এ কাহিনীটা যেন সে বলবে না।

শুভ ধৈর্য ধরে জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে থাকায় খুশী হয়ে গঙ্গা আবার শুরু করে, দাদা সেদিন কলকাতা গিয়ে ফিরতে পারেনি। মাঝরাতে চরণের ছেলে এসে ডাকাডাকি, চরণ নাকি কলিকের ব্যথায় আছাড়ি-পিছাড়ি করছে। দাদা নেই শুনে বেচারার মুখ শুকিয়ে গেল। এখন উপায় ? বারতলা থেকে ওষুধ আনতে আনতে রাত কাবার হয়ে যাবে। এদিকে চরণ কাটা ছাগলের মত ছটফট করছে। আমি ভেবে-চিন্তে বললাম, দাঁড়াও, একটা ওষুধ দিচ্ছি। আমার মনে হচ্ছিল, আলমারিতে একটা শিশির গায়ে যেন কলিক টলিকের ওষুধ বলে লেখা আছে পড়েছি। শিশিটা খুঁজে বার করে বুক ঠুকে খানিকটা পাউডার দিয়ে দিলাম। এমন ভয় হচ্ছিল কি বলব আপনাকে—যদি কিছু খারাপ হয় !

গঙ্গা একটু হাসে।

শুভ বলে, সেই ওষুধে সেরে গিয়েছিল তো ?

নন্দ বলে, সেরে যাবে না ? একবারে কতটা পাউডার দিয়েছিল জানো ? পাঁচ ছটা ডোজের কম নয়।

শুভ বলে, তোমার তো সাহস আছে সত্যি !

আপনি তো বলছেন সাহস—বাড়ি ফিরে দাদার সে কি বকুনি ! কলিকে

মানুষ মরে না, আমার আন্দাজী ওষুধ খেয়ে মানুষটা যদি মরে যেত! আমারও সত্যি সেই ভয় হচ্ছিল।

শুভ আবার প্রীতিভোজে যাওয়ার কথা তুললে নন্দ বলে, এত পীড়াপীড়ি করছ কেন?

এ সমাজে তোমার একটু মেলামেশা দরকার মনে করি।

লাভ কি?

একটু ঘনিষ্ঠভাবে মিশে এদের সম্বন্ধে তোমার কিরকম ধারণা হয় জানতে চাই। আমার ধারণার সঙ্গে মেলে কিনা দেখব।

নন্দ একটু ভেবে বলে, যেতে আমি পারি—কিন্তু ময়ূর সেজে ছদ্মবেশে যেতে পারব না। আমার যা আছে তাই পরে যাব।

শুভ আহত হয়ে বলে, সংস্কারের চোরা বালিতে তুইও গলা পর্যন্ত ডুবে আছিস। নীতিকথার বাঁধা নিয়মে চলতে হবে, এতটুকু এদিক ওদিক করা চলবে না। আমি গরীব মানুষ, আমি কেন বড়লোক সেজে বড়লোকের ভোজে যাব? একদিন গেলেই পৃথিবী উল্টে যাবে, আমার গরীবের আত্মসম্মান—

থাম তো। বেশী বিদ্যা হয়ে সোজা কথা তুই দিন দিন কম বুঝছিস। আমি আপত্তি করছি এইজন্য যে এরকম খাপছাড়া নাটুকেপনা করে লাভটা কি হবে?

লাভ হবে। তুই যদি মিশ খেয়ে যাস, খাপ খেয়ে যাস, কস্মিনকালেও যে এ সমাজে মিশিস নি টের না পাওয়া যায়, প্রমাণ হবে যে পোশাকটাই সব! আসলে কোন তফাত নেই।

নন্দ হেসে বলে, প্রমাণ দরকার নেই। আমি বলে দিচ্ছি, পোশাকটাই সব নয়, অনেক তফাত আছে। আমি ভালরকম খাপ খেয়ে গেলেও কিছু প্রমাণ হবে না। আমি বাইরের চালচলন নকল করব, অভিনয় করব, কিছুই টের পাওয়া যাবে না। তাতেই কি প্রমাণ হয়ে যাবে অ্যারিস্টোক্র্যাট আর গেঁয়ো ভূতের মধ্যে তফাত শুধু পোশাকের?

তবু শুভ নাছোড়বান্দার মত বলে, তা হোক, তোকে যেতেই হবে। একটা একস্‌পেরিমেন্ট করতে দোষ কি?

একস্‌পেরিমেণ্ট ? তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করাও যে শুভর একটা এক্সপেরিমেণ্ট ছাড়া কিছু নয় নন্দর তা ভাল করেই জানা আছে। তবু তাকে দিয়ে একরকম সোজাসুজি এক্সপেরিমেণ্ট করার প্রস্তাবে নন্দর অপমান বোধ হয়। সেকি বৈজ্ঞানিক শুভর কাছে ইঁদুর-খরগোসের সামিল ?

কয়েক মুহূর্ত কথা বলতে পারে না। রাগ হলে কথা বলাই তার স্বভাব।

তারপর সহজভাবেই বলে, আচ্ছা বেশ, যাব।

শুভ তাকে নিয়ে একস্‌পেরিমেণ্ট করতে এত উৎসাহী, সেই বা শুভকে নিয়ে এক্সপেরিমেণ্ট করবে না কেন ?

বারতলার জমিদারবাড়ি যার দেখা আছে জগদীশের কলকাতার বাড়ি দেখলে তার চোখে পলক পড়বে না।

যে মানুষটা বছরের বেশীর ভাগ সময় বারতলার ওই মন্দির চত্বর দপ্তর অন্দরে ঘেরা দীঘিওলা সেকেলে বাড়িতে থাকতে ভালবাসে সে কি না মাঝে মাঝে শহরে এসে বাস করার জন্য মডার্ন প্যাটার্নের এমন বাড়ি তৈরী করেছে যে আধুনিকতার সেই বাড়াবাড়ির মধ্যেই যেন ফুটে বেরিয়েছে তার গ্রাম্যতা।

ভিতরে গ্রাম্যতার কিছু কিছু প্রকাশ্য নিদর্শনও আছে। বাড়িতে ঢুকেই সেটা নন্দর চোখে পড়ে গিয়েছিল।

শুভর সঙ্গে সে এসেছিল দিনের বেলা অতিথি সমাগমের অনেক আগে।

দুপুর বেলাই বলা চলে।

বাগানে কাজ করছিল উড়িয়া মালী। হঠাৎ ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে সাবিত্রী ব্যস্ত ভাবে ব্যাকুল ভাবে কি যেন বলল তাকে। বাগানের ওপাশে চাকর বামুন মালীদের জন্য এক ইটে গাঁথা কয়েকটা কুঠরি। তারই একটার মধ্যে ঢুকে খানিক পরে মালী বেরিয়ে এল পোকায় কাটা পট্টবস্ত্র পরে কাঁধে নামাবলী ঝুলিয়ে খালি পায়ে। বাগানে কাজ করার সময় তার গায়ে মোটা ধবধবে পৈতেটা নন্দর চোখে পড়েনি। ওটাও বোধ হয় তোলাই থাকে।

খানিক পরেই বাড়ির ভিতর থেকে শোনা গিয়েছিল শঙ্খ-ঘণ্টার শব্দ।

শুভ নিজেই বলেছিল, আর বলিস কেন। পিছন দিকের একটা ঘরের মধ্যে একটা মন্দির করা হয়েছে। মা কিছুতেই ছাড়বে না। সকাল-সন্ধ্যায় পূজা-আরতি হয়। আজ বাবা বোধ হয় বলে দিয়েছেন বিকাল থেকে লোকজন আসবে, ওসব চলবে না। করলেও চুপচাপ নিঃশব্দে করতে হবে। মা তাই মালীকে দিয়ে তাড়াতাড়ি সন্ধ্যা-পূজাটা সেরে রাখছে।

দুপুরে সন্ধ্যা-পূজা?

উপায় কি? তবু নিয়মটা রক্ষা হল।

নন্দ গম্ভীর মুখে বলে, এনে বোধ হয় ভালই করেছিস আমায়। তোকে যে এতখানি মানিয়ে চলতে হয় সয়ে যেতে হয় খেয়াল হত না; আমি জেনে রাখতাম এসব তুই ডোণ্ট কেয়ার করে উড়িয়ে দিস!

তাই কখনো হয়? ধর্ম-কর্ম নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না—যারা মাথা ঘামায় তাদের জিজ্ঞাসা করতে যাই না এসব কি দরকার। কিন্তু অতিথিরা কি মনে করবেন বলে বাগানের মালীকে দিয়ে দুপুর বেলা সন্ধ্যাপূজা সেরে রাখা—এটা কি মারাত্মক অবস্থা ভাব তো?

নন্দর মনে পড়ে ছেলেবেলা স্কুলে একসঙ্গে পড়বার সময় মাঝে মাঝে শুভ তাকে জোর করে বাড়িতে টেনে নিয়ে যেত। শহরের বাড়িতে প্রীতিভোজের উৎসবেও টেনে এনেছে।

শুভ আজও জানে না বন্ধুত্বের নামে কি নির্যাতন কি অত্যাচারটাই সে করত কামারের ছেলেকে শুধু এক ক্লাশে পড়ে বলেই ঝোঁকের মাথায় বন্ধু হিসাবে বাড়ি নিয়ে গিয়ে।

অল্প বয়স। কিন্তু সে টের পেত দরোয়ান থেকে জগদীশ পর্যন্ত প্রকাণ্ড জমকালো বাড়িটার সকলেই তাকে অস্বীকার করছে। শুভ যেন একটা মাটির পুতুল কিনে এনেছে, ছেলেমানুষী খেয়ালে রাস্তা থেকে একটা ফেলনা ইট-পাথর কুড়িয়ে এনেছে।

একমাত্র সাবিত্রীই তাকে খাতির করত। আদর করত। সে খাতির আর আদর ছিল তাকে লুচি পরোটা সন্দেশ রসগোল্লা ঠেসে ঠেসে খাওয়ানোতে।

শুভ আর একটা রসগোল্লা চাইলে ধমক দিয়ে বলত, আজ ছুটো সন্দেশ, তিনটে রসগোল্লা বেশী খেয়েছিস। পেট ব্যথা হবে না তোর পেটুক কোথাকার ?

সে আর খেতে পারছে না জেনেও তার পাতে আরও কয়েকটা খাবার দিয়ে বলত, খাও খেয়ে নাও। না খেলে আমি রাগ করব কিন্তু !

কোনবার পেট ব্যথা হত। কোনবার পেট খারাপ হত।

তু-একটা দিন ভুগতে হত নন্দকে।

তখন জোয়ারভাঁটা চলত শুভর বন্ধুত্ব করায়। ঠিক যেন নদীর জোয়ার ভাঁটা।

বাড়িতে ডেকে নিয়ে যাওয়াটা যেন ছিল পূর্ণিমা আর অমাবস্যার জোয়ার। সবচেয়ে জোরালো বন্ধুত্বের সময়।

তার পরেই ভাঁটা-শুরু হত শুভর বন্ধুত্বে !

শুধু কাছে গিয়ে দাঁড়ানোর জন্য শুভ বিরক্ত হয়েছিল এমন অনেক দিনের কথা মনে আছে নন্দর।

সাবিত্রীকে বহুদিন সে সামনাসামনি ত্যাখেনি। এরোড্রোমে অনেকেই গিয়েছিল কিন্তু বিদেশ-ফেরত ছেলেকে অভ্যর্থনা জানাতে সাবিত্রী কেন যায়নি আজ নন্দ তার মানেটা বুঝতে পারে।

এরোড্রামে উড়োজাহাজ থেকে যে নামবে সে তো পুরোপুরি ছেলে নয় সাবিত্রীর। সে একটা ভিন্ন রকম বিদেশী-রকম যুবক।

মাসে একবার তুবার শুভ টেনে নিয়ে গেলেও, জোর জবরদস্তি করে ভাল দামী দামী খাবার খাইয়ে পেট ব্যথা পেট খারাপ করে দিয়ে থাকলেও পটের ছবির জীবন্ত রাজরানীর মত সাবিত্রী কাল্পনিক কাহিনীর ডাকিনী যোগিনী মোহিনী মহামায়ায় এক মিশেল দেবীত্বের মহিমায় মনটা তার আচ্ছন্ন করে রেখেছিল অনেক বয়স পর্যন্ত।

প্রীতিভোজের আয়োজন করা হয়েছে সমারোহের সঙ্গে। জগদীশের বড় শালা, সাবিত্রীর একমাত্র দাদা, পঞ্চান্ন বছরের মহেশ্বর কলকাতায় এই বাড়িটার

চার্জে আছে এক যুগের বেণী। তার বৌ নেই ছেলেমেয়ে নেই। একতলায় ছোট ঘরে থেকে সে জগদীশের শহরের বাড়িটা রক্ষণাবেক্ষণ করে।

মাসে মাসে ঝি বদলায়, রাঁধুনি বদলায়। জগদীশ যা বলে দিয়েছে তার একটি পয়সা বেশী খরচ করে না।

তীর্থে ধর্মশালায় যেমন পুণ্যার্থী যাত্রীদের দুচারদিন ঘর ভাড়া দিয়ে রোজগার করা হয়, জগদীশের এই শহরের বাড়িটার দুচার খানা তেমনি শহরে আনন্দপ্রার্থী আর প্রার্থিনীদের ঘণ্টা হিসাবে রাত্রি হিসাবে, বা বিশেষ ক্ষেত্রে দুতিনটা দিন রাত্রির হিসাবে ভাড়া দিয়ে মহেশ্বর যেঁপে গেছে।

সন্ধ্যার আগেই আত্মীয়বন্ধুসমাবেশে বাড়িটা সরগরম হয়ে ওঠে জগদীশের।—

আত্মীয়কুটুম্বদের মধ্যে আজ অবশ্য ডাকা হয়েছে তাদেরই সম্ভ্রান্ত গণ্যমান্য মানুষের সমাবেশে যারা নিজেদের মানিয়ে নিয়ে মিলতে মিশতে জানে।

জগদীশের এই এক জ্বালা।

আজ বিশেষভাবে যাদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছে তার আত্মীয়কুটুম্বের বেশীর ভাগেরই তাদের সমাজে মিশবার যোগ্যতা নেই।

জগদীশ একাই সকলকে অভ্যর্থনা করে। সাবিত্রী ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে আলোগুলি জ্বালিয়ে চারিদিক ঝলমল করে দেবার পর।

তার নাকি মাথা ধরেছিল। সে নিজের ঘরে শুয়েছিল।

নন্দর মত অন্য সকলেও যেন কয়েকবার পলক ফেলতে পারে না তাকে দেখে। রাজরাণী সেজে রাজরাণীর মতই ধীর শান্তপদে সে সকলের মধ্যে নেমে এসেছে।

একাল দিয়ে সংশোধন করা সেকেলে রাজরাণী। প্রৌঢ় বয়সেও তার জমকালো রূপ আর সাজসজ্জায় কয়েক মুহূর্তের জন্য উপস্থিত তরুণীদের রূপ-যৌবন সাজসজ্জা যেন নিষ্প্রভ হয়ে যায়। তবে কয়েক মুহূর্তের জন্যই।

সাবিত্রী এগিয়ে গিয়ে একটা সোফায় বসতে না বসতে চাপা চাপা মৃদু মৃদু হাসাহাসি শুরু হয়ে যায় এদিকে ওদিকে।

নন্দ চোখ ফেরাতে পারে না। একেই কি সে দুপুরবেলা আলুথালু বেশে বাগানে ছুটে যেতে দেখেছিল মালীকে দিয়ে সন্ধ্যাপূজা সেরে নেবার জন্য ?

চোখ ফিরিয়ে নিতে পারে না বলেই, আত্মবিস্মৃত হয়ে চেয়ে থাকতে পারে বলেই, নন্দ অল্পক্ষণের মধ্যে টের পায় সাবিত্রী অভিনয় করছে,—রঙ্গমঞ্চে দর্শকদের সামনে পাকা অভিনেত্রী যেমন তার বিশেষ ভূমিকা অভিনয় করে তেমনি ভাবেই অভিনয় করছে।

নন্দ ভাবে, তাই বটে। তাছাড়া উপায় কি সাবিত্রীর ? তার ছেলের সম্মানে একটি সন্ধ্যার জন্য এমন এক জমজমাট সমাবেশ হয়েছে। পিছিয়ে আড়ালে থাকলে চলবে কেন ?

কাউকে ডাকে না সাবিত্রী, কারো সঙ্গে যেচে কথা কয় না। অতিথিরাই একে দুয়ে গিয়ে গিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে দু-এক মিনিট আলাপ করে তার মর্যাদা রেখে আসে।

সাবিত্রীর সঙ্গে একটি সুদর্শন যুবকের পরিচয় করিয়ে দেবার সময় শুভ নন্দকেও ডেকে নেয়।

বলে, এর নাম ফিরোজ রহমান। আমরা একসঙ্গে রিসার্চ করছিলাম।

নন্দ জিজ্ঞাসা করে, এখন কি করছেন ?

ফিরোজের হাসিটি সুন্দর। দাঁতগুলি ঝকঝকে।

চাকরির চেষ্টা।

আপনারা দুই বন্ধুই দেখছি বৈজ্ঞানিক হয়ে দেশে ফিরে বিজ্ঞান ত্যাগ করছেন।

আমি ঠিক ত্যাগ করছি না—বিজ্ঞান নিয়ে যাতে থাকা যায় তার উপায় খুঁজছি। না খেয়ে তো বিজ্ঞানচর্চা করা যায় না ? সুবিধামত চাকরি না পেলে হয়তো রিসার্চ বাদ পড়বে, যেটুকু শিখেছি তাই নেড়ে চেড়ে খেতে হবে।

ফিরোজের কথায় একটু টান আছে। নন্দ জিজ্ঞাসা করে, আপনার দেশ কি পাকিস্তান ?

সারা পৃথিবীটাই সায়েন্টিস্টদের দেশ। এখন এটাই দেশ করেছি, পাকিস্তানে যাবার উপায় নেই।

রাজনৈতিক ব্যাপার?

অর্থনৈতিক এবং ব্যক্তিগত। একজন ক্ষমতাবান ব্যক্তি আছেন, তাঁর আত্মীয়কে চাকরি দেওয়া নিয়ে গোলমাল করেছিলাম। তিনি একটি মামলা সাজিয়ে রেখেছেন, গেলেই জেলে পুরবেন।

নন্দ আপসোস করে বলে, সব দেশেই ক্ষমতার বাঁকা গতি, অপব্যবহার।

ফিরোজ বলে, সব দেশ বলবেন না, সোভিয়েট চীন এসব দেশগুলিকে বাদ দেবেন।

ও! আপনি সোভিয়েটের চীনের ভক্ত? তবে আর কথা কি আছে। কোয়ালিফিকেশন দাম পাবে না।

শুভ বলে, সত্যি। এদেশে আত্মীয়পোষণ যেখানে পৌচেছে শুনছি তাতে রুইকাতলার আত্মীয় হওয়াই একমাত্র গুণ দাঁড়িয়ে যাচ্ছে।

সাবিত্রী বলে, মানুষ বড় হলে আত্মীয়ের জন্য করবে না?

শুধু আত্মীয় বলে করবে? আর কিছুই দেখবে না?

মায়া এসে দাঁড়ানোয় কথার মোড় ঘুরে যায়। মায়া ফিরোজকে বলে, কেমন আছেন? বিয়ে করছেন শুনলাম?

ফিরোজ বলে, শুনে রাগ করেছেন তো? আপনাকে বাদ দিয়ে শুভকে একা নিমন্ত্রণ করেছি! আমার কিন্তু দোষ নেই। সেদিন শুভ কেবল পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল, আর কিছুই জানায় নি। আজ এখানে এসে শুনলাম দুদিন পরে বলতে হলে আপনাদের দুজনকেই বলতে হবে।

ফিরোজের কথায় ব্যবহারে চেহারায় সহজাত আভিজাত্যের ছাপ। বুঝতে দেরি হয় না সে সম্ভ্রান্ত অভিজাত পরিবারের ছেলে।

দুহাত একত্র করে বলে, যাই হোক, কৈফিয়ত থাকলেও অপরাধ নিশ্চয় হয়েছে। সেটা মার্জনা করে শুভর সঙ্গে আপনার যেতে হবে কিন্তু।

শুভ বার বার মার দিকে তাকাচ্ছিল। তার বিব্রতভাবটা স্পষ্টই চোখে

পড়ে। এবার সে বিব্রতভাবেই বলে, আমার আবার ও-সময়টা বাইরে যাবার কথা। যদি থাকি তা হলে অবশ্য—

সাবিত্রী হাসিমুখে ফিরোজকে বলে, জানো বাবা, শুভ কথাটা চাপা দিচ্ছে। তোমার বিয়েতে গিয়ে খানা খাবে, জাত যাবে শুনে ওর সেকেলে কনজারভেটিভ মা'টি যদি হার্ট ফেল করে বসে! মাকে অত সেকেলে ভাবিসনে শুভ।

তিনজনে অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

সাবিত্রী হাসিমুখে বলে চলে, আমি জাতধর্ম মেনে চলি, আমার কথা আলাদা। তোর বন্ধু আমায় নেমন্তন্ন করলে মুশকিলে পড়ব। যদি বা যাই, জলটুকুও খেতে পারব না। কিন্তু আমি কি বলতে যাব, তোদেরও আমার মত হতে হবে? তুই আর মায়া জাত-টাত মানিস না। তোরা যেখানে খুশি যাবি, খাওয়া-দাওয়া করবি, সে তোদের ইচ্ছা। আমি কিছু মনে করতে যাব কেন? আমার নিয়ম আমার, তোমাদের নিয়ম তোমাদের। যে যার নিয়ম মানবে। তুমি কি বল ফিরোজ?

আপনি খাঁটি কথা বলেছেন।

নন্দ ভাবে, এই সাবিত্রীই কি মালীকে দিয়ে দুপুরবেলা পূজা সাজ করে রেখেছিল?

জগদীশ বহুলোককে বলেছে। সমাগম ঘটেছে শুধু বড়লোক নয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরও। জমজমাট সমাবেশ।

অনভ্যস্ত পোশাকে অনভ্যস্ত পরিবেশে নন্দ বড়ই অস্বস্তি বোধ করছিল। শুভর এক্সপেরিমেন্টের আসল ফাঁকিটা ক্রমে ক্রমে তার কাছে ধরা পড়ে যায়।

শুভ যা জানতে চায় এভাবে পরীক্ষা করে তা জানা অসম্ভব। একদিন হঠাৎ একজন গরীব গেঁয়ো মানুষকে লাগসই পোশাক পরিয়ে এরকম সমাবেশে আনা যায়, দুচারজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া যায় কিন্তু সমাবেশের মানুষ-

গুলি সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা করতে হলেও যেটুকু ঘনিষ্ঠতা দরকার কিছুতেই তা সৃষ্টি করা যায় না।

সে আর নিমন্ত্রিত কারো মধ্যে শুধু চলতে পারে ভাসা-ভাসা আলাপ।

শুভ অনুযোগ দেয়, কি হল? নার্ভাস হয়ে পড়েছিস? ভাল করে মিশতে পারছিস না যে কারো সঙ্গে?

নন্দ একটু হেসে বলে, আমিও পারছি না, অন্যেরাও পারছেন না। ভুলে যাস না সবাই যেমন আমার অজানা অচেনা, আমিও তেমনি সকলের কাছে অজানা অচেনা!

তবু দুএকজনের সঙ্গে চেষ্টা করে—

চেষ্টা করেছি। পরস্পরকে না জানলে তো পরিচয় জমে না? অপরজন কি করে কোথায় থাকে দুপক্ষেরই সেটা জানা দরকার। দুচারজনের সঙ্গে এপর্যন্ত এগিয়েছি। কিন্তু আমি অজ পাড়াগাঁয়ে ডাক্তারি করি, পাশ করি নি এটুকু শুনে প্রত্যেক ধরে নিলেন গাঁয়ে থেকে সম্পত্তি দেখাশোনা করি, আমার শখের ডাক্তারি। পয়সার অভাবে পুরো ডাক্তার হতে পারি নি শুনেই প্রত্যেকে ঘাবড়ে গেলেন। বারবার পোশাকটার দিকে তাকাতে লাগলেন। বাস্, সেইখানেই ইতি!

নন্দ একটু হাসে।

৭

বিদেশ থেকে ফিরে একটা ব্যাঘ্র-ঘটিত ঘটনাচক্রে শুভর প্রথম পদার্পণ ঘটে নবশিল্প মন্দিরের ভিতরে।

নবনব শিল্প-পরিকল্পনায় মাথাটা ঠাসা হয়ে থাকায় তার একবার মনেও পড়েনি নবশিল্প মন্দির দেখে আসার কথা। তার ধারণা বন্ধ কারখানার

ভিতরে এতদিন ধরে ধুলো জমা হয়েছে, দেখে আসবার কিছু নেই। সে জানত না এখনও ওখানে তারই কিছুকাল আগের একটা বাস্তব শিল্প-প্রচেষ্টা-মর-মর অবস্থায় ঠুকঠাক চলছে।

জগদীশ ভুলেও ছেলের কাছে নবশিল্প মন্দিরের কথা উল্লেখ করে না। কারখানাটা একেবারে বন্ধ করে না নিয়ে কিছু কিছু কাজ যে সে চালু রেখেছে ছেলেকে একথা জানাতে জগদীশ সাহস পায় না। কে জানে সে চটে যাবে কিনা, যা মতিগতি হয়েছে ছেলের। বাস্তব রূপ দিতে গিয়ে আদর্শ ভেঙে গেছে, চেষ্টাও শেষ হয়েছে, ব্যাপারটা চুকে বুকে গিয়ে দাঁড়িয়েছে অতীত জীবনের একটা ভুলে। সামান্য লাভের জন্য এমনভাবে জোড়াতালি দিয়ে সেই ভুলের জের টেনে চলা!

হয়তো ক্ষেপেই যাবে শুভ।

সামান্য হলেও লাভ হয়। একটা পোস্তেরও হিল্লে হয়েছে, কাদম্বিনীর ছেলে বঙ্কিমের। সে কারখানাতেই থাকে, কাজকর্ম দেখাশোনা থেকে তৈরী মাল চালান দেওয়া পর্যন্ত সব কিছু সে-ই করে। জগদীশের কোন হাঙ্গামা পোয়াতে হয় না।

শুভ কি এ হিসাব বুঝবে? যথেষ্ট সন্দেহ আছে জগদীশের। হয়তো বঙ্কিম তার নবশিল্প মন্দির চালায় এটা শুনেই তার মাথা বিগড়ে যাবে।

দি গ্রেট ইউনিটি সার্কাস নেমেছিল বারতলা স্টেশনে। প্রতি বছর এসময় প্রকাণ্ড মেলা বসে বারতলায়, তিন দিন একটানা মেলা চলে, দূর থেকেও দলে দলে মানুষ এসে এসে ভিড় বাড়ায়। খাস কলকাতা শহর থেকে পর্যন্ত লোক আসে গাঁয়ের এই মেলায়। শুধু দেখতে নয়, শস্তায় এটা ওটা কিনতেও বটে। যাতায়াতের খরচ ধরলে অবশ্য শস্তা হয় না মোটেই, কলকাতায় বসে কেনার চেয়ে বেশী পড়ে যায় দাম। কিন্তু যাতায়াত তো জিনিসগুলি কেনার জন্য নয়—মেলা দেখার আনন্দের জন্য।

সেইজন্য শস্তা হয়।

গাঁয়ের মানুষ যেমন কলকাতায় দেখতে যায় বারোমেসে শহরে মেলা

কলকাতার কিছু মানুষেরও তেমনি দেশী ভাবের সেকেলে ধাঁচের গেঁয়ো মেলা দেখবার শখ জাগবে সেটা বিচিত্র কি !

ছোট ছোট সার্কাস, ম্যাজিক, জুয়াখেলার দল তালি-মারা জীর্ণ তাঁবু সম্বল করে এই সব মেলায় পয়সা লুটতে যায়। মেলার আসল আনন্দ ধামা কুলো, পাটি মাদুর, দা বঁটি বাসনপত্র খেলনা প্রভৃতি কেনাকাটা আর তেলে ভাজা খাবার খাওয়ায় কিন্তু মজার খেলা জুয়াখেলা, নাগরদোলার আমোদ ছাড়া সে আনন্দ নিরামিষ হয়ে যায়। অন্তত দুটি পয়সা দিয়ে মানুষের আয়না সাজানোর কায়দায় কাটা মুণ্ড দেখে আর সেই কাটামুণ্ডকে কথা কইতে শুনে আরেকবার আশ্চর্য না হলে যেন মানেই থাকে না মেলায় আসার।

সার্কাসওয়ালাদের সঙ্গে ছিল একটা ম্যাদামারা বাচ্চা বাঘ। তাঁবুর মত সব কিছুতেই তাদের জোড়াতালি, বাঘের খাঁচাটি পর্যন্ত ছিল নড়বড়ে। খাঁচা থেকে পালিয়ে বাঘটা গিয়ে লুকিয়েছিল নবশিল্প মন্দিরের ভিতরে।

খবর পেয়ে শুভ এল বন্দুক দিয়ে বাঘ মারতে। আর সার্কাসের লোক এল বাঘটাকে ধরে খাঁচায় পুরতে।

তারা ছিল একান্ত নিশ্চিন্ত। ও বাঘ একটা ছাগলকেও আঁচড়াবে না, বনে জঙ্গলেও পালাবে না। যেখানেই গা-ঢাকা দিক, লোকে দেখতে পেয়ে হৈ চৈ করবে, খবর পেয়ে তারা গিয়ে ধরে নিয়ে এসে খাঁচায় পুরবে।

খবর তারাও পেল, শুভও পেল। কিন্তু শুভই পৌঁছল আগে আর পৌঁছেই জানালার ফাঁক দিয়ে তাক করে তিন গুলীতে খতম করে দিল বেচারা বাঘের জীবন।

সার্কাসের লোকেরা এসে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল।

এ কি করলেন বাবু? আমাদের রুজি-রোজগার মেরে দিলেন?

ছাড়ো কেন বাঘ? কাকে মারবে, জখম করবে—

এ বাঘ কি জখম করে বাবু? ও শুধু নামেই বাঘ, লোক-দেখানো বাঘ।

কিন্তু তখন আর এসব বলে লাভ কি। মরা বাঘটার দাম হিসাবে কয়েকটা টাকা তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হল। যতই হোক—শিকার-করা বাঘ, চামড়াটা

চিহ্ন হিসাবে ঘরে টাঙানো থাকবে। কিন্তু এসব কিসের যন্ত্রপাতি মালমসলা ছড়িয়ে পড়ে আছে চারিদিকে, মরচে ধরে যাচ্ছে ?

একপাশে টুকটাক করে তৈরী হচ্ছে কি জিনিস ?

হাসিমুখে বঙ্কিম এসে সামনে দাঁড়িয়েছিল। বয়সে শুভর চেয়ে কিছু বড় হবে, বেঁটে মোটাসোটা চেহারা। ছেলেবেলায় খুবই হাবাগোবা ছিল, বয়স বেড়ে বুদ্ধি একটু পাকলেও ধার আসে নি বিশেষ।

কাদম্বিনী কোন এক সম্পর্কে শুভর মাসী হয়। আজ প্রৌঢ় বয়সেও তাকে দেখলে অবাক হয়ে ভাবতে হয় বয়সকালে না জানি তার কেমন আগুনের মত রূপ ছিল। শুভর মা সাবিত্রীও অসাধারণ সুন্দরী, কিন্তু তার রূপ অন্য ধরনের, রাজরাণীর মত জমকালো।

অল্প বয়সে কাদম্বিনী বিধবা হয়। সাবিত্রী আগ্রহ করে তাকে এনে আশ্রয় দিয়েছিল। জগদীশের নাগালের মধ্যে তাকে এনে আশ্রয় দেওয়া আর বাঘের নাগালে কাঁচা মাংস নেওয়া সমান জেনেও গ্রাহ্য করে নি !

কিছুই গ্রাহ্য করে নি।

শুভ এসব জানে। কিন্তু মাথা ঘামায় না! কারণ সে এটাও জানে যে, সমাজ সংসারের সাধারণ নিয়মেই জমিদার জগদীশের সমগ্র জীবনে এসব মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে, একটা ব্যাপারকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে বড় করে তোলার কোন মানে হয় না।

তা ছাড়া কাদম্বিনী নিঃসন্দেহে কাজে লেগেছিল তার মার। কাদম্বিনীকে দিয়ে—হয় তো বা অন্য ভাবেও—সামলে ছিল বলেই জগদীশের যৌবনের দুর্দান্ত বিকারের জন্য বাইরে মদ আর মেয়েমানুষের প্রয়োজনটা বড় হয়ে উঠতে পারে নি।

তুমি এখানে কি করছ বঙ্কিম ?

আমিই তো কারখানা চালাই।

কারখানা চালাও ? কিসের কারখানা ?

স্টোভ আর লণ্ঠনের কারখানা ফেঁদেছিল শুভ আজ। সেখানে তৈরী হয়

কাচ-ঘেরা চারকোনা টিনের ল্যাম্প আর টিনের ছোট ছোট স্যুটকেশ।

সাপ্তাহিক উৎপাদন গোটা পঞ্চাশ ল্যাম্প আর ডজনখানেক স্যুটকেশ। আশপাশ থেকে ক-জন মাত্র দেশী কামার কারিগর খাটতে আসে।

বঙ্কিম সগর্বে বলে, তুমি তো সব লোকসান করে দিয়েছিলে, আমি মুনাফা তুলছি। মেসোমশায় ভারি খুশি। চুটকি মালের কারখানা থেকে লাভ করার নিয়ম কি জানো? শুধু খরচ কমাও—বাস, আর কিছু চাই না।

শুভ বুঝতে পারে কথাগুলি জগদীশের, বঙ্কিম শুধু মুখস্থ বলছে। জগদীশের খরচ কমানোর নীতিটা চোখকান বুজে পালন করে সে মুনাফাও তুলছে কারখানা থেকে।

জগদীশ মিথ্যা অনুমান করে নি। তার নবশিল্প মন্দিরের পরিণতি দেখে প্রাণে বড়ই আঘাত লাগে শুভর।

কত সমারোহের সঙ্গে নবশিল্প মন্দির স্থাপন করেছিল, আজ তার এই দশা! তার শিল্প বিস্তারের প্রচেষ্টাকে কামারশালা হয়ে দাঁড়াতে দেখে আত্মীয়-বন্ধু আর চারিপাশের মানুষ না জানি কত হাসাহাসি করেছে।

বাড়ি ফিরেই বলেছে, এ তামাসা রাখার মানে? একেবারে বন্ধ করে দিলেই হত!

জগদীশ লজ্জিত হয়েই কৈফিয়ত দেয়, তাই দেব ভেবেছিলাম। তবে চলতে লাগল, কোন ঝঞ্ঝাট নেই, কিছু পয়সা আসছে—

ধরা-বাঁধা তালে মাল তৈরী হয়, বাঁধা খাতে বাইরে যায়, কিছু পয়সা ঘরে আসে। লোকসান যা যাবার সে তো গিয়েছেই, এখন বিনা হাঙ্গামায় যে কটা টাকা ঘরে আসে।

আয়ব্যয়ের ব্যাপার নিয়ে সেদিন পর্যন্ত জগদীশ কখনো ছেলের সঙ্গে কোনরকম আলোচনাই করেনি। আজ টাকা ঘরে আসার প্রসঙ্গে আপসোস করে বলে, জানো, চারদিকে খরচ শুধু বেড়েই যাচ্ছে। এদিকে আদায়পত্র সুবিধে নয়। বজ্জাৎ ব্যাটারা যেন পণ করেছে উৎসন্ন যাবে তবু জমিদারের পাওনা দেবে না। কি করে যে আমি চালাই—

শুভ ভেবেছিল রাগারাগি করে অবিলম্বে নবশিল্প মন্দির নিয়ে তামাশাটা বন্ধ করে দেবে। টাকার কথা তুলে জগদীশ তার মুখ বন্ধ করে দেয়। খরচ বেড়ে গেছে, আয় কমে গেছে, জগদীশের টানাটানি!

তার পিছনেও এপর্যন্ত শুধু টাকা ঢেলেই এসেছে জগদীশ, আজও ঢালছে।

এদিকটা সেদিন প্রথম খেয়াল হয়েছিল শুভর। টাকার চিন্তায় জগদীশ একটু কাতর। সাধারণ একটা কামারশালার মৃত টিনের ল্যাম্প আর বাক্স তৈরির কারখানাটুকু থেকে সামান্য যে কত টাকা আসে তারও মূল্য আছে জগদীশের কাছে, সেটাও সে হিসাবে ধরে!

ভাসা ভাসা ভাবে ব্যাপার খানিকটা অনুমান করেছিল শুভ, খুবই আলগা-ভাবে। প্রজার দফা নিকেশ হয়ে এসেছে বলে জমিদারের পক্ষেও আগের চালের সঙ্গে নতুন চাল বজায় রেখে চলা দায় হয়ে পড়েছে। শোষণ ঠিক আছে কিন্তু রক্তই শেষ হয়ে এসেছে প্রজার। থাবার ঘায়ে বাঘ ঘাড় মটকাতে পারে কিন্তু রক্ত না থাকলে সে শুষবে কি?

তাকে অনুযোগ দেয়নি জগদীশ। শুভ তা জানে। এখনো বেশ কিছুকাল সময় তাকে দেওয়া হবে, ভুলেও জগদীশ তাকে ইঙ্গিতে পর্যন্ত জানাবে না যে এবার তার কিছু করা উচিত। তার কাছে অনেক আশা করেছে জগদীশ, আপাতত সে আশা করেই সন্তুষ্ট। টাকা-পয়সার দিক দিয়ে কোন সাহায্যই সে এখন তার কাছে চায় না।

সে চায় না কিন্তু তার প্রয়োজনটা তো স্থূল বাস্তব সত্যের উপলব্ধি হয়ে ধরা দেয় শুভর কাছে। সে টের পায় যে জানা কথাই আরেকবার জানায় তফাত কি। আদর্শ ও পরিকল্পনা কেটে ছেঁটে নেবার বা বর্জন করার প্রশ্ন ওঠেনি, যা-ই সে করতে চাক তাতে ব্যাঘাত সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়নি কিন্তু পরিবারের প্রয়োজন ও প্রত্যাশা তার কাছে স্পষ্ট করে দিয়েছে যে কেবল ওদিকটা নয়, এদিকও একটা আছে তার বড় কিছু করতে চাওয়ার!

ও দায়িত্ব আর কর্তব্যের কথা ভুলে গেলে চলবে না !

একটু মন খারাপ করেই শুভ মেলা দেখতে বেরিয়ে যায়।

স্কুলের পিছনের মস্ত ফাঁকা মাঠ আর আমবাগান ভরে গিয়ে রাস্তা পর্যন্ত ঠেলে এসেছে জমজমাট মেলা। চাষীর কিন্তু এবার যেন আরও বেশী ভিড় হয়েছে মেলায়। কত কি দরকার সংসারে, কেনা যায় না। যদি একটু সস্তায় পাওয়া যায় মেলাতে, যদি চোখকান বুঝে মরিয়া হয়ে কিনে ফেলা যায় জরুরী একটা জিনিসও। কিন্তু মেয়েরা যেন এবার কম এসেছে মেলায়।

মেলায় শুভ লক্ষ্মীকে দেখতে পায়।

লক্ষ্মী কাঁসার বাসন দর করছিল।

কি কিনছ লক্ষ্মী ?

একটা গেলাস দর করছি। কাঁসার দামও কোথায় চড়েছে !

কাঁচের গ্লাস ব্যবহার কর না কেন? কিম্বা প্ল্যাষ্টিকের? খুব শস্তায় পাবে।

লক্ষ্মী হেসে বলে, কাঁচের গেলাস? যেমন শস্তায় পাব তেমন শস্তায় যাবে। টং করে ভাঙলেই হল। ভালো কাঁসার একটা জিনিস হলে একজনের জীবন কেটে যাবে। ফেটে যাক ফুটো হোক তবু কাঁসার দামে বিকোবে।

শুভ মাথা নেড়ে বলে, যুক্তিটা ঠিক মনে লাগছে না লক্ষ্মী। পাথরের বাসন তো তোমরা কিনছ? কাঁচ আর চীনা মাটিতে এত অরুচি কেন? হাত থেকে পড়লে পাথরের জিনিসও ভাঙবে, কাঁচের জিনিসও ভাঙবে। কাঁচের জিনিস বরং বেশী শস্তা।

পাথরের জিনিস সহজে ভাঙে না তো।

কেন ভাঙে না ?

ভারি যে। কাঁচের গেলাস কত হালকা।

এত বড় বৈজ্ঞানিক শুভ একটু নির্বোধের মতই তাকিয়ে থাকে।

লক্ষ্মী বুঝিয়ে বলে, বুঝলেন না? ভারি জিনিস হলেই মানুষ সেটা শক্ত করে ধরে। ও আর ভেবেচিন্তে ধরতে হয় না, আপনা থেকে ধরা হয়ে যায়।

তাই বল!

শুভ সত্যিই একটু লজ্জা বোধ করে। নিজের বুদ্ধির অভাবের জন্য নয়, প্রয়োজনও তার হয় না। এদের বাদ দিয়ে দেশ কথাটার মানে হয় না, দেশের স্বাধীনতার বা এগিয়ে যাবারও মানে হয় না—শিক্ষিত সমাজে এই সহজ সত্যটা থিয়োরিতে স্বীকৃত হয়ে থাকার বদলে সাধারণ বাস্তব উপলব্ধির চারা হয়ে মাথা তুলেছে। অনেক স্বপ্ন আর কল্পনা গুঁড়ো হয়ে গিয়ে গিয়ে, অনেক ব্যর্থতার জ্বালায় পুড়ে পুড়ে বোধ জন্মাচ্ছে যে এইসব সাধারণ মানুষেরা তাদেরও ভবিষ্যতের জন্য শুধু প্রয়োজনীয় নয়, একেবারেই অপরিহার্য। নিজের, নিজের শ্রেণীর ভবিষ্যৎ স্বার্থ—এই বাস্তববোধটাই কিনা ভিত্তি সকল আত্মীয়তা বোধের, তাই শুভও স্বাভাবিক মমতা আর আত্মীয়তা-বোধ দিয়েই শ্রদ্ধা অশ্রদ্ধার প্রশ্নটাকে বাতিল করে দিতে পেরেছে। যে কারণে এদের সংকীর্ণ নিঃস্ব জীবন কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, শিক্ষাহীন ভোঁতা মন—সেই কারণের বিরুদ্ধে যে জ্বালা স্থায়ীভাবে জ্বলছে তার মধ্যে তাতেই অসম্ভব হয়ে গিয়েছে এদের পরের মত হীন ভাবা, অনাত্মীয়ের মত নীচু স্তরের অশ্রদ্ধেয় জীব মনে করা। সে কথা নয়। দেশের মানুষকে আপন মানুষ ভাবতে পারার পর এদের পিছনের অন্ধকারে ঠেলে রাখা, বোকা হাবা নোংরা ভাঙা মানুষ আর কুসংস্কারের ডিপো ভাবার জন্য নিজের কাছে লজ্জা পাবার কারণ ঘটে না। দেশের মানুষ যেমন তাকে ঠিক সেরকম জেনে রাখা ভেবে নেওয়ার মধ্যে দোষেরও কিছু নেই, লজ্জা পাওয়ারও কিছু নেই।

শুভ তা জানে।

জানে বলেই তার বৈজ্ঞানিক মন মাঝে মাঝে তাকে টের পাইয়ে দিচ্ছে যে বিদেশ থেকে ঘুরে এসে কি যেন হয়েছে তার, এসব মানুষকে একটু বেশী রকম পিছিয়ে-পড়া জীব মনে হচ্ছে, যতটা সত্যই তারা নয়। এজন্য অবশ্য অবজ্ঞা নেই, আছে আপসোস। কিন্তু কেন সে নিজের মনে বেশী পিছিয়ে দেবে দেশের মানুষকে, বেশী অন্ধকারের জীব মনে করবে? বিচার করার তুলনা করার কোন মাপকাঠি সে গড়ে নিয়েছে?

লক্ষ্মীর এই সাধারণ বাস্তব বুদ্ধি আর অভিজ্ঞতাটুকু তাই তাকে আশ্চর্য করে দিয়েছে, পরক্ষণে তা তাকে লজ্জিত করেছে নিজের কাছে।

ওজন করা হলে কাঁসার গেলাসটার দাম শুনে লক্ষ্মী মুখ ফিরিয়ে ঘুরে দাঁড়ায়।

নেবে না?

কাল নেব।

শুভ যেন কাঁচের গ্লাসের পক্ষে প্রচারের ভার নিয়েছে। সে আবার বলে, ক-আনা দিয়ে একটা কাঁচের গ্লাস কিনেই নাও না আজ? দেখই না ব্যবহার করে। স্থবিধেও নিশ্চয় আছে। নইলে এত লোক কিনছে কেন, ব্যবহার করছে কেন?

লক্ষ্মী বলে, স্থবিধে আছে বৈ কি। যাদের স্থবিধে হয় তারা ব্যবহার করছে। আসলে কি জানেন, কাঁসার বাসন কাঁচের বাসন মিশিয়ে তো কাজ চলে না, একরকম রাখতে হয়। শহরে ঘরে ঘরে চা জলখাবারের জন্যে কাঁচের গ্লাস কাপ ডিস চলে, ভাত খেতে কাঁসার বাসন। গাঁয়ের গেরস্ত-ঘরে কি ওসব পাট আছে? কাঁচের গেলাস নিতে বলছেন, পাঁচটা কাঁসার থালা-গেলাসের সঙ্গে একটা কাঁচের গেলাস মাজতে ধুতে রাখতে বড় ঝঞ্ঝাট।

শুভ খুশি আর উৎসাহিত হয়ে বলে, ঠিক বলেছ, এটাই আসল কথা। আমি উলটো ভাবছিলাম।

কি ভাবছিলেন?

ভাবছিলাম, তোমাদের বুঝি সংস্কারে বাধে। মা কাঁচের গ্লাসে জল খায় না। চা খাবে কিন্তু পাথরবাটি চাই। তাই ভাবছিলাম তোমাদেরও বুঝি একই ব্যাপার, শুধু অভ্যাস আর সংস্কারটাই আসল। এখন দেখছি তা তো নয়। মার বরং সংস্কারে বাধে, তোমাদের হল স্থবিধা-অস্থবিধার বিচার।

আশ্চর্য রকম খুশি মনে হয় শুভকে!

একটু খাপছাড়া মনে হলেও শুভর কথাবার্তা খারাপ লাগে না লক্ষ্মীর। তার আন্তরিকতা লক্ষ্মীর অন্তর স্পর্শ করে—ফাঁকা দরদে লক্ষ্মীকে ফাঁকি দেবার সাধ্য

কোন মানুষেরই বুঝি আর নেই। আন্তরিকতার ধাপ্পাবাজিও চিনতে দেয় না হৃদয়মনের যে বিষম রোগ, অতি কড়া বিষের ডোজে সে রোগ তার প্রায় সেরে গেছে।

কাঁসার বাসন কাঁচের বাসন থেকে সংস্কারের প্রসঙ্গে এল কথা। কিন্তু শুভ কা সত্যই বুঝেছে তার কথা? এঁটো বাসন হুড়মুড় করে কুড়োতে, ঘাটে নিয়ে গিয়ে মেজে ঘষে ধুয়ে আনতে একটা ঠুন্‌কো কাঁচের গেলাস কী যন্ত্রণা দিতে পারে সেটা ধারণা করতে পেরেছে কি শুভ?

কে জানে! তবু, তার সরল সহজ কথা আর ব্যবহারকে মেনে নিয়ে লক্ষ্মীও সহজভাবে খোলা প্রাণে কথা কয়।

গরীবের কি বেশী সংস্কার পোষায় ছোটবাবু? হিসেব ছাড়া চলে? এমনিই দুর্ভোগের অন্ত নেই, সংস্কারের খাতিরে দুর্ভোগ কখনও আরও বাড়াতে পারে মানুষ?

পারে না? তুমি কি বলতে চাও চাষীদের মধ্যে কুসংস্কার নেই? অদৃষ্টের ওপর নির্ভর করে তারা অকারণে বেশী কষ্ট পায় না?

লক্ষ্মী স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। একটু ভর্ৎসনার স্বরে বলে, আপনারা এত লেখাপড়া শিখেছেন, এমন সোজা কথাটা ধরতে পারেন না কেন? সব জিনিসের কলের মত মানে করেন কেন?

শুভ ক্ষুব্ধ ও গম্ভীর হয়ে যায়। নন্দও তাকে এই অনুযোগ দিয়ে থাকে। লক্ষ্মী বলে যায়, কুসংস্কার গাদা গাদা আছে, অদৃষ্টও সবাই মানে। না করছে কে? কিন্তু কুসংস্কারের জন্য অদৃষ্টের খাতিরে চাষাভূষো মানুষ মিছিমিছি কষ্ট পাওয়ায় এ ধারণা কোত্থেকে আসে আপনাদের? তাদের রাতদিন শুধু চিন্তা কষ্টটা কি করে একটু কমানো যায়। কষ্ট কমাবার উপায় পেলে ভগবান অবতার কোন কিছুকে কেয়ার করবে না। আপনি দিন না উপায় করে কষ্ট কমাবার? দেখবেন, কুসংস্কার অদৃষ্ট এসব কেমন চটপট বাতিল করে দেয়।

আঁচলের গিট খুলে লক্ষ্মী একটুকরো তামাকপাতা মুখে পুরে দেয়!—কষ্টের চেয়ে বড় হবে সংস্কার! কেন, আপনি কি দ্যাখেন নি গাঁ থেকে চাষী বৌ

কলকাতায় গিয়ে ডাস্টবিন থেকে এঁটো কুড়িয়ে খেয়েছে? কদিন আগেও তার এঁটো-এঁটো ছুঁচিবাই ছিল, দিনে দশবার পচা ডোবায় গা ডুবিয়ে শুদ্ধ হত?

শুভ বিব্রতভাবে বলে, সে হল আলাদা কথা। যেমন ধর নন্দ বলছিল, অনেকে রোগে কষ্ট পাবে কিন্তু যেচে দিলেও বিলাতী ওষুধ খাবে না।

এবার লক্ষ্মী হাসে।

আমার কি আস্পদ্ধা বলুন তো? এত বেশী জানেন বোঝেন, আপনার সাথে তর্ক জুড়েছি! হাসছেন তো মনে মনে? তা হাসুন তবু বলব একটু কম জানলে বুঝলে ভাল করতেন। রোগে কষ্ট পাবে তবু বিলাতী ওষুধ খাবে না? খাবেই না তো। সাতপুরুষে রোগ হলে বিলাতী ওষুধ খেতে পায় নি, জানা চেনা কেউ পায়ও না খায়ও না। সে কোন সাহসে আপনার ওষুধ খাবে? ব্যবস্থা করে দিন না, রোগ হলে সবাই যাতে বিলাতী ওষুধ পায়—ওটা রেওয়াজ হয়। কে ওষুধ খায় না একবার দেখব। দুএকজন ঢং করে খাবে না, বাহাদুরি করার জন্য খাবে না দুচারদিন। বাকি সবাই খাবে।

শুভ বলে, তোমায় তো ঠিক চাষীর মেয়ে চাষীর বৌ মনে হচ্ছে না লক্ষ্মী!

কি করে মনে হবে? ছোটবাবু যেচে কথা কইছেন, তবু গদগদ হয়ে নেতিয়ে পড়িনি যে!

শুভ রাগ করে এগিয়ে যায়। লক্ষ্মীর এবার খেয়াল হয় অসীম বিস্ময় নিয়ে শত শত চোখ মেলার মধ্যে দাঁড়িয়ে তাদের আলাপ করা দেখছিল।

রাগ বলে রাগ! ভিতরটা যেন পুড়ে যেতে থাকে শুভর, দুকান গরম হয়ে ঝাঁ ঝাঁ করছে। সে টের পায় যে হাত-পা পর্যন্ত তার থর থর করে কাঁপছে।

মনের মধ্যে দাপড়িয়ে বেড়াচ্ছে অশান্ত অবাধ্য একটিমাত্র চিন্তা: খুশি হলেই যাকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে বন্ধ ঘরে চরম অপমান করতে পারে সে কিনা এমন বেয়াদবি করতে সাহস পায়।

বৈজ্ঞানিক শুভ নিজের মনকে বলে, শান্ত হও! শান্ত হও!

কিন্তু বলে কি সঙ্গে সঙ্গে শান্ত করা যায় এখনকার এই মনকে! একটা চাপাপড়া আগ্নেয়গিরির যেন বিস্ফোরণ ঘটেছে ভিতরে, হলকায় হলকায় বেরিয়ে আসছে ক্রোধের আগুন আর উন্মাদ লালসা। আচ্ছন্ন অভিভূত করে দিতে চাইছে বুদ্ধি ও চেতনাকে। কোমল কান্তিময়ী মায়ারা যেন ছায়া হয়ে দূরে সরে গিয়েছে, বন্ধ ঘরে কেবলি শাড়ি কেড়ে নেওয়া চলেছে মাটির কাছের খাটুয়ে চাষী মেয়ে লক্ষ্মীর টাসবুনানি দেহ থেকে।

এটাই যেন তার চিরদিনের ধ্যানধারণা, এমনিভাবে শিকড় গেড়েছে চিন্তাটা। চেষ্টা করেও মন থেকে তাড়াবার সাধ্য যেন তার হবে না।

বৈঠকখানায় আরাম কেদারায় বসে জগদীশ তামাক টানছিল। তফাতে মেঝেতে উবু হয়ে বসেছিল বুড়ো ভীম মণ্ডল। তার হাত দুটি জোড় করা।

জগদীশ উদ্বেগের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে, কি হয়েছে শুভ? তোমার মুখ এমন দেখাচ্ছে কেন?

কিছু হয় নি—এমনি।

জগদীশ ক্ষুব্ধ চোখে তাকায়। মাঝে মাঝে কি যে হয় শুভর, একটা কথা জিজ্ঞাসা করলে দাঁড়িয়ে ভাল করে জবাবটা পর্যন্ত দেয় না, এমনভাবে অবজ্ঞা করে চলে যায়।

এই একটা মারাত্মক দোষ একালের শিক্ষার।

অন্দরের বারান্দায় সাবিত্রীর চুলে তেল মাখিয়ে দিচ্ছিল কাদম্বিনী। সাবিত্রীও ছেলের মুখ দেখে ভড়কে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে, কি হয়েছে শুভ? ওনার সঙ্গে আবার—?

শুভ নীরবে মাথা নাড়ে। কয়েক মুহূর্তে মা আর কাদম্বিনীর দিকে চেয়ে থেকে সে নিজের ঘরে চলে যায়।

ঘরে হালকা আসবাব। স্তরে স্তরে সাজানো বই।

একটা মোটা বই টেনে নিয়ে শুভ চেয়ারে বসে। বইয়ে মন বসাবার চেষ্টা করার দরকার হয় না। ইতিমধ্যেই প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল।

কত তাড়াতাড়িই যে কেটে যায় তার রাগ আর লক্ষ্মীর ঠাসবুনানি দেহটার জন্ম উগ্র পাশবিক লালসা—বেয়াদবি করার অজুহাতে গায়ের জোরে তাকে ভোগ করার অন্ধ উন্মাদ তাগিদ।

তার বদলে উথলে ওঠে তীব্র ঘৃণা আর বিদ্বেষ। একা জগদীশের বিরুদ্ধে নয়, পূর্বপুরুষদের বিরুদ্ধে, বংশের বিরুদ্ধে। যে বংশ তাকে এই রোগ দিয়েছে। একেবারে রক্তের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিয়েছে রোগ। হঠাৎ হোক, সাময়িক-ভাবে হোক, বেশীক্ষণ তাকে কাবু করতে না পারুক, তার এত দিনের এত চেষ্টা এত সাধনাকে ঠেলে সরিয়ে রোগটা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

শুভ জানে, এই জ্বালাবোধের তীব্রতাও ধীরে ধীরে কমে আসবে—এটা শুধু প্রতিক্রিয়া। মন তার শান্ত হবে। কিন্তু এখন তো বিশ্রী লাগার সীমা পরিসীমা থাকছে না।

লক্ষ্মীর জন্যই কি বাসন সম্পর্কে সচেতন হল শুভ ?

কে জানত নবশিল্প মন্দিরকে পিতল কাঁসা ভরনের বাসন তৈরির কারখানায় পরিণত করার কথা শুভর মাথায় এসেছিল এবং ধারণাটা যুগিয়েছিল মেলারই বাসনের অস্থায়ী দোকানগুলি আর বাসন সম্পর্কে মানুষের লোভ ও আগ্রহ।

ছেলেবেলা থেকে এ মেলার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয়। কলকাতায় পড়বার সময়েও বাড়িতে এসে তিন দিন সে মেলা চষে বেড়িয়েছে। কিন্তু আগে কোনবার লক্ষ্য করেনি যে মেলায় এতগুলি বাসনের অস্থায়ী দোকান হয়, এত লোক বাসন কিনতে চেয়ে পছন্দ আর দরদস্তুর করে, এত বাসন বিক্রিও হয়।

এবার মেলায় ঘুরতে ঘুরতে এটা খেয়াল করে সে নাকি সত্যই আশ্চর্য হয়ে গেছে।

ভিড়? না, ঠিক ভিড় হয় না বাসনওয়ালাদের কাছে, যেমন ভিড় অন্য অনেক রকম শস্তা জিনিসের দোকানে হয়। কিন্তু সেটাই তো স্বাভাবিক। মফস্বলের মেলায় ভিড় করে আসে দীনহীন গরীব মানুষ যাদের মধ্যে কতজনকে

না জানি ঘরের বাসন বাঁধা রাখতে হয়েছে মেলায় আসার খরচের জন্য!
বাসনের মত দামী জিনিসের দোকানে ওরকম ভিড় হওয়াই তো অসম্ভব।

তবু এই গরীব মানুষের মেলায় যত লোক বাসন কিনতে চায় এবং কেনে সেটা খেয়াল করলে আশ্চর্য হবারই কথা!

পরদিন মেলাতেই লক্ষ্মীর সঙ্গে আবার তার বাসন নিয়ে কথা হয়।

আগের দিন যে সময় গিয়েছিল আজ তার খানিকটা আগেই শুভ মেলায় যায়। লক্ষ্মীর ঠাসবুনানি দেহটার আকর্ষণে নয়, তার সঙ্গে বাসন নিয়ে আরও কিছুক্ষণ আলাপ করার তাগিদে।

বাসনের কথা ভাবতে ভাবতে, হাতেনাতে একটা কাজ আরম্ভ করার সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় ওই চিন্তা আর কল্পনার খুঁটিনাটি নিয়ে সে মশগুল হয়ে গেছে রাতারাতি।

লক্ষ্মীর দেহটা গায়ের জোরে অথবা প্রেমের জোরে ভোগ করা না করা নিয়ে তার আর বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই।

একটি বাসনের দোকানের মালিকের সঙ্গে শুভ আলাপ-আলোচনা চালায়। প্রায় ঘণ্টা খানেক ধরে। বাসনের কথা লক্ষ্মীর কাছেই জানা যাবে, দোকানীর কাছ থেকে শুভ জানবার চেষ্টা করে বাসন যারা বানায় আর বিক্রী করে তাদের কথা। সকলে তারা কাঁসারি নয়। কোন দোকানের মালিক নিজেই বাসন তৈরী করে, কোনো দোকানের মালিক তৈরী বাসন কিনে নিয়ে লাভ রেখে বিক্রী করে। এ সমস্যাটাই একটু মুশকিলে ফেলে দেয় শুভকে। যে নিজে বাসন তৈরী করে আর যে অন্যের তৈরী বাসন কিনে বিক্রী করে তারা পাশাপাশি দোকান দিয়ে একদরে বাসন বেচছে।

কাঁসারি গোষ্ঠকে সে তখন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেরা করছিল। গোষ্ঠ ভাবছিল সেদিন বেরোবার সময় লক্ষ্মীর পটে কপাল ঠেকাবার সময় গোটা কপালটা ঠেকায় নি। নইলে এমন বিপদ ঘটে? খদ্দের ভিড় করেছে দোকানে, সেদিক তার নজর দেবার উপায় নেই, ছোটবাবুর আবোল তাবোল প্রশ্নের জবাব দিতে হবে সসম্ভ্রমে!

যে সোনার রূপার থালা-বাটিতে খায় তার কেন কাঁসার বাসন তৈরী করা বিক্রী করা নিয়ে এত কৌতূহল?

একটু ভয়ও করছিল গোষ্ঠর।

এমন সময় লক্ষ্মী এসে তাকে রেহাই দিল।

লক্ষ্মীর গেলাসটা কেনা হয়েছিল। হাতেই ধরা ছিল জিনিসটা। পয়সা কম পড়ায় আগের দিন কিনতে পারেনি।

গেলাসটা কিনে ছাড়লে?

কী করি। ছ-মাস ধরে কিনব কিনব করছি, অ্যাদ্দিনে কেনা হল।

অনেকে পয়সা জমিয়ে জমিয়ে বাসন কেনে, না?

কেনে না? এমনি মেলায়-টেলায় কিনবে বলে অনেকে ছ-মাস এক বছর আগে থেকে পয়সা জমায়। নইলে গরীবের সংসারে কজন ঝাঁ করে নগদ বার করতে পারে বলুন?

একটু থেমে বলে, শুধু বাসন কেন, অনেক কিছুই এমনি ভাবে কিনতে হয়। একটা জিনিস চাই, জোগাড় করতে দু-তিন বছরও লেগে যায় কারো কারো!

বলে সে একটু হেসেছিল, কেউ কেউ অবিশ্যি সারা জীবনেও জোগাড় করতে পারে না।

তার সে হাসির মানে বোঝেনি শুভ, একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। তাকে দেখে লক্ষ্মীরও কি গা জ্বালা করে? তার ধারেকাছে না এসেও তার নাম শুনেই যেমন জ্বালা করে অনেকের বুক? গাড়ির পার্টস খুলে নিয়ে তাকে জব্দ করতে চাওয়ার ঘটনা তুচ্ছ হয়ে গেছে নন্দর ডিসপেন্সারিতে লুকিয়ে চাষীদের কথাবার্তা শোনার পর থেকে। সেদিনের অভিজ্ঞতায় নিজের বিদ্যাবুদ্ধি জ্ঞান এবং আরেকটি অগ্রসর জগৎ সম্পর্কে তার বাস্তব অভিজ্ঞতা তুচ্ছ বা বাতিল হয়ে যায় নি কিন্তু প্রাণে তার শেল বিঁধেছে।

কৈলাস শুধু তার মনুষ্যত্বটুকু মানতে বলেছিল ওদের। এতবড় বৈজ্ঞানিক, হোক সে জমিদারের ছেলে, ওকে অন্তত তোমরা মানুষ বলে গণ্য কর!

এটুকুও মানতে পারে নি তারা।

লক্ষ্মীও কি ওদেরি একজন ? এমন ঠেস দিয়ে খোঁচা দিয়ে বলার নইলে আর কি মানে হয় যে ওগো বাবু, তুমি কি জানো এদেশে অনেকে সারা জীবন কাটায় সামান্য একটা কাঁসার গেলাস কেনার সাধ না মিটিয়েই ?

তোমার কথা বুঝতে পারছি না লক্ষ্মী। এরকম যাদের অবস্থা তারা কাঁসার গেলাস চায় কেন ? কাঁচের গেলাস নয় নাই কিনল—মাটির গেলাস মাটির ভাঁড় তো পাওয়া যায় ?

কাঁসার গেলাস আর মাটির ভাঁড় ! মাটির ভাঁড় তৈরী করা দেখেছেন ? বন্‌বন্ চাকা ঘুরছে, জল-ভেজানো হাতে যেন চোখের পলকে একটা কাঁচা ভাঁড় তৈরী হয়ে যাচ্ছে। সুতো দিয়ে তলাটা কেটে নামিয়ে রাখছে। মিনিটে একটা করে ভাঁড় তো বটেই। তবু ওদের দৈনিক রোজগার কত জানেন ? রোজ একজন চারশো থেকে পাঁচশো ভাঁড় বানায়। নিজের ঘরে নিজের যন্ত্র নিজের জিনিস নিজের মেহনত দিয়ে বানায়। তবু কলে যারা খাটে তাদের মতই রোজ তাদের বেশী হলে টাকা দুই রোজগার হয়।

শুভ খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে।

বাসনের দোকানী ভাবে, ছোটবাবু ফ্যাসাদে পড়েছে। এই ছুঁড়িটাকে নিয়ে ফূর্তি করবেন না অন্য কাউকে পছন্দ করবেন ঠাহর হচ্ছে না !

শুভ একটা সিগারেট ধরায়। দামী গন্ধওলা সিগারেট।

বলে, রাগ কোরো না। তুমি সত্যি চাষীর মেয়ে চাষীর বৌ নও।

লক্ষ্মী মুচকে হেসে বলে, আমি তবে আকাশ থেকে নেমে আসা কেউ ?

বাসন নিয়ে শুভর বাড়াবাড়ি সেদিন বড়ই অদ্ভুত মনে হয়েছিল লক্ষ্মীর ! কি চিন্তা রূপ নিচ্ছে শুভর মাথায় সেটা ধারণা করা সম্ভব ছিল না তার পক্ষে।

পরে নবশিল্প মন্দিরে বাসনের কারখানা স্থাপনের তোড়জোড় শুরু হলে ব্যাপারটা খানিক স্বচ্ছ হয়েছিল তার কাছে। একটু শঙ্কার সঙ্গে তাকে ভাবতেও হয়েছিল যে তার কথার উপর নির্ভর করে, সংসারে বাসনকোসনের স্থানকে সে অনেক তুলে ধরেছিল বলে, শুভ তো এ মতলব করেনি ?

বাসনের পক্ষে তার গাউনি শুনে বাসন সৃষ্টি করার জন্য তার এ চেষ্টা ব্যর্থ

হলে তাকে তো শেষে দাগ্নিক করবে না শুভ?

কথা হয় মেলায় ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে, লক্ষ্মী অস্বস্তি বোধ করে কিন্তু শুভর যেন কোন দিকেই খেয়াল নেই।

মাটির ভাঁড়ের প্রসঙ্গে প্রায় জেরা করার ভঙ্গিতে শুভ জিজ্ঞাসা করে, বাসনও তো তোমরা দামী সম্পত্তি মনে কর?

সে জবাব দেয়, গয়নার পরেই বাসন। তবে একটা কিন্তু আছে এতে। গয়না ছাড়া দিন চলে, বাসন ছাড়া রাঁধাবাড়া খাওয়াদাওয়া বন্ধ। গয়না শুধু গয়নাই, বাসনটা দরকারী। ভাত কাপড় ঘর, তার পরেই বাসন।

শুভ বলে, মাটির হাঁড়িতে কিন্তু ভাত রাঁধা যায়। কলাপাতে খাওয়া যায়।

সে হেসে জবাব দেয়, গাছতলায় নেংটি পরে থাকা যায়। পুরুষের একটা নেংটিতেই চলে, মেয়েদের দুটো লাগে। তাই তো বলি ছোটবাবু, আমরা যেন হিসেবের শেষ কড়ার কড়ি দাঁড়িয়েছি। কাঁসার একটা বাসন কিনলে ধারণা হয়, তবে তো এরা গরীব নয়, না খেতে পেয়ে মরছে না, চাল না কিনে কাঁসার গেলাস কিনছে আজও! এ যে কী মুশকিল হয়েছে মোদের, কি বলব আপনাকে ছোটবাবু! চাল খেয়ে নাকি মানুষ বাঁচে? মানুষ কি গরু যে তার জল খেতে গেলাস লাগবে না?

আরও কত কথা সে বলে ফেলত কে জানে! গাঁদা এসে তার নাগাল ধরার মতই আঁচল চেপে ধরে কথাবার্তা থামিয়ে দেয়।

বাঃ রে লক্ষ্মীদি বেশ! মোকে ফেলে পালিয়েছ?

তোকে আবার ফেললাম কখন? শাউড়ী-ননদের সাথে লটারি খেলছিস দেখলাম তো তুই।

এত দেখলে, মোর ইসারাটা দেখলে না? ওদের সাথে মেলায় আসার সুখ আছে আধ ছটাক? জানলে না যে কাটিয়ে পড়ে তোমার সাথে ভিড়তে চাই?

গেলাস কিনে ফতুর হয়েছি গাঁদা।

বেশ করেছ। এস না লক্ষ্মীদি।

আঁচল ধরে টেনেছিল গাঁদা।

মোর বুঝি পয়সা রইতে নেই? একজন মোর মাকড়ি বেচে শখ করে জেলে যেতে পারবেন, আমি কিছু বেচতে পারি নে? আসবে তো এস লক্ষ্মীদি, নইলে আমি একলাটি আজ—

শুভর দিকে সে ফিরেও তাকায় না, যেন গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না তার উপস্থিতি। অথচ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে শুভর সঙ্গে কথা বলছিল এটা নিশ্চয় নজরে পড়েছে গাঁদার।

লক্ষ্মীর মনে একটা সন্দেহ জাগে।

দেখা যায় সন্দেহ তার মিথ্যা নয়।

শুভ একটু তফাত হতেই গাঁদা বেশ খানিকটা গর্বের সঙ্গে বলে, দেখলে তো কেমন বাঁচিয়ে দিলাম তোমাকে!

লক্ষ্মী হেসে বলে, থাবড়া খাবি?

বাসনের কারখানা? জগদীশ যেন আকাশ থেকে পড়ে। শুভ শেষ পর্যন্ত পেশা নেবে কাঁসারির!

শুভ তাকে আশ্বাস দিয়ে বলে, আমি ঠিক লাইন ফলো করছি। আমি আগের বার ভুল করেছিলাম। আপনি টিনের ল্যাম্পের কামারখানা বজায় রেখে আরেকটা ভুল করেছেন। আমি সব ভুল সংশোধন করে নিচ্ছি।

বটে!

জগদীশ চটবে না অভিমান করবে বুঝতে পারে না।

শুভ বুঝিয়ে বলে। এখানে নবশিল্প মন্দির গড়ে শুভ যে স্টোভ আর গ্যাসের লণ্ঠন তৈরি করতে চেয়েছিল তাতে দুটো আসল হিসাবেই থেকে গিয়েছিল গলদ। ওসব জিনিস তৈরি করার কারিগর আর মাল কাটাবার বাজার দুই-ই ছিল তার আয়ত্তের বাইরে। ওসব জিনিস তৈরি করার কাজ যারা শিখেছে তারা হয়ে গেছে শহরের শিল্পাঞ্চলের বাসিন্দা, এই বিচ্ছিন্ন এলাকায় কারখানা করা মানেই তাদের উঠিয়ে এনে নূতন করে বসতির ব্যবস্থা করা। যে জগতের যে

বাজারের সঙ্গে শুভর যোগাযোগ গড়া সম্ভব, সেখানে কি স্টোভ আর লণ্ঠন কাটে ? যারা পোড়ায় কাঠপাতা আর জ্বালায় ডিবরি প্রদীপ, তাদের স্তরে কি মার্কেট আছে স্টোভ আর লণ্ঠনের ? সে আলাদা মার্কেট, সে মার্কেট দখল করার অন্য ব্যবস্থা।

বিরাট কারখানা যদি গড়তে পারত শুভ, কারখানা কেন্দ্র করে গড়ে তুলতে পারত শ্রমিক নগর, ঠিক পথে ঠিক ভাবে সেল অর্গানাইজ করতে পারত, তা হলে বরং অন্য কথা ছিল। ওসব জিনিসের এত ছোট কারখানা কি এখানে চলে, এভাবে চলে ? শুধু মজুর এনে বসানোর খরচাটাই যে পোষাবে না ! সেল অর্গানাইজ করা থেকে আরও কতদিকে কত খরচ।

ঘটেছেও ঠিক তাই। শিক্ষিত কারিগর যারা এসেছিল বিদায় হয়ে গেছে, স্টোভ আর লণ্ঠনের বাজার বাতিল হয়েছে। স্থানীয় মিস্ত্রি দিয়ে তৈরি হচ্ছে ল্যাম্প আর টিনের সুটকেশ, বিশেষ কোন ব্যবস্থা দরকার হয়নি সে মাল কাটাবার জন্য। বঙ্কিমের মত একটা গোমুখ্যকে দিয়ে সে কাজ করানো গেছে।

বাসনের কারখানার বেলাতেও এই নীতি খাটবে।

চারিদিকে গ্রামে শহরে বিচ্ছিন্নভাবে কারিগরেরা ছড়িয়ে আছে, তাদের এনে খরচ করে বসাতে হবে না, নিজেদের গরজেই তারা এসে মাথা গুঁজবার ঠাঁই খুঁজে নেবে নিয়মিত মজুরির লোভে। বাসনের বাজার মিলবে সহজেই। ও বাজারটা তাদের জানা, প্রভাবও খাটবে।

বাসন বিক্রি হবেই। যারা লণ্ঠন কেনে না, তারাও দুটো একটা বাসন কেনে।

তাছাড়া বাসন পচবে না গলবে না নষ্ট হবে না।

এ সব কথার চেয়ে জগদীশের বড় আশ্বাস মেলে শুভকে জোরের সঙ্গে ঘোষণা করতে শুনে যে এটা তার সাময়িক উদ্যম, সাইড লাইন। বাসন তৈরী তার জীবনের ব্রত হবে না।

আসলে এটা জগদীশের কারখানা। সে শুধু গড়ে দেবে, তারপর দেখাশোনা কাজ চালানোর ব্যবস্থা জগদীশ নিজেই করতে পারবে।

টিনের ল্যাম্প আর স্যুটকেশ বেচা কটা টাকা পেয়ে জগদীশ খুশি হয়, মোটা লাভ আসবে তার এই কারখানা থেকে।

নন্দকে সে বলে, চুপচাপ বসে থাকব? জল্পনা কল্পনা সম্বল করে? তার চেয়ে এটাতেই হাত লাগালাম আপাতত। নতুন প্ল্যান ঠিক করি ততদিনে।

এর নাম উৎসাহ, একে বলে কর্মপ্রচেষ্টা। তবু কেমন একটা হতাশা জাগে তার কথা শুনলে। বড় কিছু করা যাচ্ছে না হাজার ইচ্ছা নিয়েও, সুতরাং চুপচাপ বসে না থেকে যা হোক কিছু করা যাক, দমে না যাবার প্রমাণ হলেও কথাটা যেন দমিয়ে দেয়!

শুধু নন্দ নয়, লক্ষ্মীও তাই বলে। বাসন সম্পর্কে শুভর কৌতূহলের কারণ বুঝতে পেরেছে কিন্তু মনটা তার খারাপ হয়ে গেছে শুভকে বাসনের কারখানা নিয়ে মাততে দেখে—সে দু-দিনের জন্যে মেতেছে জেনেও।

কৈলাস বলে, তা হবে না? আসল কাজ গোড়ায় যেমন তেমন শুরু করলেও মনে ফুর্তি লাগে। এটা হল একদম অন্য কাজ, অকাজ।

কিন্তু আসল কাজটা কি? শুভর কাছে কোন বড় কাজ আসলে তারা প্রত্যাশা করছিল যার গোড়া পত্তন হিসাবে বাসনের কারখানাটা গড়ে উঠছে না বলে তাদের খারাপ লাগছে?

না, শুভর কোন নির্দিষ্ট পরিকল্পনার খবর তারা জানে না। কিন্তু প্রত্যাশা তারা করে। এটাই ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট হয় তাদের কাছে। শুভ মহাসমারোহে বাসনের কারখানা গড়ার কাজে লেগে যাওয়ায় তাদের হতাশা জাগার মানেটা ধরা যায়। শুভ কি করবে না জানলেও তারা আশা করেছে যে সে এমন কিছু করবে যা থেকে দেশ ও দশের স্বার্থ বাদ পড়বে না। শুভ টাকার কথা ভাববে না, তার অর্থাগম হবে না, এ কথা তারা ভাবেনি।

কিন্তু শুধু লাভের জন্য সে ব্যবসা করবে, তার নিজের লাভ ছাড়া আর কোন মানেই থাকবে না তার কর্মপ্রচেষ্টার, এটাই তারা আশা করতে পারেনি শুভর কাছে।

বারতলা স্টেশন এলাকা আবার সরগরম হয়ে উঠেছে নবশিল্প মন্দিরের নবজন্ম লাভের প্রক্রিয়ায়।

খবরটা রটে গেছে চারিদিকে। কারখানার অদল-বদলের কাজ আরম্ভ হতে না হতে শুধু ব্যাপার জানতেই যে কত লোক আসে, কাজ বাগাবার আশায় আবির্ভাব ঘটে কত বেকারের!

একদিন সকালের গাড়িতে আসে তিনজন মাঝবয়সী লোক। দুজনের গায়ে ছিটের হাতা-কাটা ছোট সার্ট, একজনের পায়ে চটের মত শস্তা ক্যাম্বিশের জুতো, অন্য দুজনের ছেঁড়া চটি।

গজেনের দোকানে বসে তারা চা খায়, বিড়ি কিনে টানে। কারখানা সম্পর্কে নানা কথা জিজ্ঞাসা করে গজেনকে।

বাসন তৈরি করে বেচা তাদের তিনজনেরই বংশগত পেশা। শুভর কারখানা স্থাপনের খবর শুনে ছুটে এসেছে উদ্বেগ ও আশঙ্কা বুকে নিয়ে।

শুভ তাদের না জানুক, বারতলার জমিদারের ছেলেকে তারা চেনে।

এত লেখাপড়া শিখে শেষে এসব বুদ্ধি মাথায় ঢুকল ছেলেটার? জগতে এত জিনিস থাকতে বাসনের কারখানা করার শখ!

তাদের মধ্যে একজনের রং বেশ ফর্সা, কটা চোখ। তার নাম গোষ্ঠ। মেলায় তাকেই শুভর বাসন সম্পর্কে জেরা করেছিল। সে সখেদে বলে, এ তো স্রেফ মোদের অন্ন মারার ফিকির!

গজেন সায় দিয়ে বলে, বটে তো। মানুষের অন্ন মারার ফিকির ছাড়া বাবুদের কলকারখানা ব্যবসা চলে? হাতের কাজ কলে করিয়ে একজনা ঘাড় ভাঙবে দশজনার।

তিনজনে তারা পরামর্শ করে নিজেদের মধ্যে।

গোষ্ঠ জিজ্ঞাসা করে গজেনকে, ছোটবাবু ইদিকে আসেন কখন?

এইবার আসবে। সারাদিন এখানেই থাকে। একেবারে কোমর বেঁধে উঠেপড়ে লেগেছে।

তারা শুভর প্রতীক্ষায় বসে থাকে।

আধ ঘণ্টা পরে শুভর গাড়ি এসে দাঁড়ালে কাছে গিয়ে তিনজনে প্রণাম জানায়। গোষ্ঠ নিজেদের পরিচয় দেয়।

শুভ খুশি হয়ে বলে, তোমরা যেচে এসেছ, এতে আমি বড় আনন্দ পেলাম গোষ্ঠ। তোমাদের মত লোকেরই আমার দরকার। অনেক পরামর্শ আছে তোমাদের সঙ্গে।

পরামর্শ? তিনজনে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে।

গোষ্ঠ বলে, মোরা নালিশ জানাতে এয়েছি ছোটবাবু। এ কারখানা কেন খুলছেন, মোদের রুজি-রোজগার মেরে দিচ্ছেন?

তাদের নালিশ শুনে শুভ যেন আকাশ থেকে পড়ে।

কী বলছ তোমরা? তোমাদের রুজিরোজগার বাড়াবার ব্যবস্থা করছি। তোমাদের নামঠিকানা বল।

বলে সে পকেট থেকে নোটবুক বার করে।

শুনে তিনজনেরই মুখ শুকিয়ে যায়।

এতক্ষণ মুখপাত্র হিসাবে কথা বলছিল গোষ্ঠ, সে আর মুখ খুলবে না টের পেয়ে সুখন সবিনয়ে বলে, মোরা কী এমন করলাম ছোটবাবু, নামঠিকানা লিচ্ছেন, থানা-পুলিস করবেন? মোরা এয়েছি একটু দরবার করতে বৈ তো নয়।

সুখনের গায়ে টিকিনের একটা ফতুয়া, মুখে খোঁচা খোঁচা গোঁফদাড়ি, মাথার চুল কদম ছাঁটার চেয়ে ছোট, বোধ হয় সম্প্রতি বাপ-মা মারা যাওয়ার মত কোন কারণে ন্যাড়া হয়েছিল।

শুধু নম্রভাবে নয়, আশ্চর্যরকম ধীরভাবে সে কথা কয়। মনে হয় মানুষটা বুঝি সে এমন ধীর শান্ত যে গ্রাম্য জীবন কেন আশ্রমজীবনের পক্ষেও সে আদর্শ পুরুষ। শুভ শুনলে বিশ্বাস করতে পারত না যে বদ মেজাজের জন্যই গ্রামের মানুষ তাকে ভয় করে, রাগ হলে তার কাণ্ডজ্ঞান থাকে না।

তার বিনয় আর কথা দুই-ই অপমানের মত বাজে শুভর। এর চেয়ে মনের আসল কথাটা প্রকাশ করে গরম হয়ে দুটো গাল দিলেও যেন অনেক ভালো

ছিল। আবার গভীর ক্ষোভের সঙ্গে তাকে ভাবতে হয় যে, হায়, শুধু জমিদারের ছেলে বলেই ছোটবাবু সে এদের কাছে অমানুষ, এখন পর্যন্ত অমানুষিক কিছুই যে সে করেনি সেটা গণ্যই নয়। একথাও তাকে ভাবতে হয় কী সুলভ এদের জীবনে কারণে-অকারণে থানাপুলিসের ঝঞ্ঝাট!

চিরকাল দাপট সয়ে সয়ে কী ভীরু আর নিরীহ হয়ে গেছে গাঁয়ের মানুষ, দিবারাত্রি সশঙ্কিত। ক্ষমতাবান একটা মানুষ ভালভাবে নামঠিকানা চাইলে পর্যন্ত আতঙ্ক জাগে, ভয়ে যেন কাদা হয়ে যায়।

কী আপসোসের কথা!

অতি নিরীহ মানুষের বিনয় করার ভঙ্গিতে ভয়ে ভয়ে সুখনের কথা বলার পিছনে যে সত্যিকারের ভীরুতা নেই জানলে শুভ আরও কতটা দমে যেত কে জানে!

ভয়ের বাস্তব কারণকে এ জগতে ভয় করে না কে?

ভয় পাওয়া আর ভীরুতা এক নয়!

এরকম নম্রতা আর ভীরুতার ভান যে ওদের বাস্তব জীবনে হাঙ্গামা এড়িয়ে চলার বাস্তব কৌশল, সেটা তলিয়ে বুঝবার সাধ্য শুভর ছিল না। কারণ, তাহলে সত্যসত্যই জমিদারের ছেলে ছোটবাবু সে যে এদের কাছে কতখানি খেয়ালী আর আক্রোশী মানুষ, স্বার্থপর নিষ্ঠুর মানুষ, সেটাও ভালভাবে উপলব্ধি করা দরকার হয়। সেইজন্যই বিনয়! উন্মাদ ছাড়া কে ঝগড়া করতে যাবে বাঘের সঙ্গে, অসময়ে এবং অকারণে? খালি হাতে বাঘের সামনে পড়লে পিছু ছুটে পালিয়ে গিয়ে বাঘকে থাবা মারার সুযোগ না দেওয়াকে কাপুরুষতা ভেবে লজ্জা পাবে?

তার পরিকল্পনা বুঝিয়ে বলাব চেষ্টা করার পরেও সুখনরা তাকে খুব ভালমানুষ ভেবে বসে না। বাঘটাকে এবার তারা একটু খাপছাড়া উদ্ভট বাঘ বলে চিনতে পারে। এ বাঘ ভালো করার নামে সহৃদয়ভাবে ঘাড় মটকায়!

গোষ্ঠ আবার কথা বলে।

এটা কী রকম কথা হল ছোটবাবু। মোরা বাসন তৈরী বন্ধ করে হেথা এসে কুলি খাটব?

কী মুশকিল—কুলি খাটবে কেন? তোমরা কারিগর, বাসন তৈরি কর, এখানেও বাসন তৈরি করবে।

সে তো আপনার বাসন ছোটবাবু। মোরা কারিগর বটে, ফের তৈরী বাসনগুলিও মোদের রয় বটে তো।

দু-চারজন কারিগর মোরাও তো খাটাই। আপনার কারখানায় খাটলে তো মোদের পোষাবে না ছোটবাবু।

সুখন হাত জোড় করে।—দোহাই ছোটবাবু; বাসন করার মতলব ছেড়ে দেন। আরও কত কি আছে জগতে, তার কোন একটার কারখানা করুন, মোদের প্রাণে মারবেন না। মোরা তিনজন মোটে এয়েছি, চাদ্দিকে আরও লোক আছে, সবার অন্ন মারা যাবে। দু-চারটা লোক নিয়ে ঢালাই-পেটাই চালাই, আপনার সাথে কি পাল্লা দিতে পারব কেউ? ছেলেপুলে নিয়ে সবাই শেষ হয়ে যাব একদম।

এতক্ষণে শুভ বুঝতে পারে এরা শুধু কারিগর নয়, বাসনপত্রের ছোট ছোট কুটিরশিল্পের মালিক। গোষ্ঠর মুখে 'মোরা বাসন বানাই' পরিচয় শুনে প্রথমটা ধরতে পারেনি।

এদের এ সমস্যার কথা সে এ পর্যন্ত ভাবেনি, তাই কি বলবে হঠাৎ ভেবে পায় না। কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করার প্রয়োজন হয়। মনে মনে সে আপসোস করে যে কারখানা ঢেলে সাজার কাজ আরম্ভ করার আগে এই সব টুকরো টুকরো গ্রাম্য কারখানা দু-একটা দেখে আসা উচিত ছিল। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে তিনজনকে সে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। একেবারে হাঁড়ির খবর যেন বার করে নিতে চায়—নিজে গিয়ে দেখেশুনে এলে যে জ্ঞান আর অভিজ্ঞতা জুটত এ বেচারীদের জেরা করে এখনই সে যেন তা আয়ত্ত করে নেবে। ক-জন খাটে, কিভাবে খাটে, কিভাবে কত বাসন একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তৈরি হয়, খরচ

পড়ে কত, কোন বাজারে কিভাবে মাল যায়, কত লাভ থাকে—খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অফুরন্ত প্রশ্ন।

জবাব শুনে সে খুশি হতে পারে না। মনে হয় এরা কোন হিসাবপত্রই রাখে না অথবা তার কাছে অধিকাংশ কথা গোপন করে যাচ্ছে।

কত বাসন তৈরি করে কিরকম আয় হয়?

কোনমতে দিন চলে যায় ছোটবাবু।

একি একটা জবাব? কোটিপতি শিল্পপতির হিসাবে থাকে একটি পাই-এর আসা-যাওয়ার, ট্যাকস ফাঁকি দিতে যতই সে প্রকাশ্য হিসাব পাল্টে দিক। বিজ্ঞান আর শিল্প ভাই ভাই, বিজ্ঞানের মত শিল্পেও সূক্ষ্ম সঠিক হিসাব চাই। হোক কুটিরশিল্প—কখনো ভালো দিন আসে, কখনো মন্দা পড়ে, শুধু এই নাকি তার মোট হিসাব!

অথবা এরা তাকে এড়িয়ে যাচ্ছে?

মেজাজ হঠাৎ চড়ে যায় শুভর। একটা এলোমেলো দুর্বোধ্য দুঃসাধ্য সমস্যার ফাঁদে ফেলে তাকে নিয়ে একটু রঙ্গ করার জন্যই যেন গ্রাম্য বিনয়ের প্রতিমূর্তি তিনজন কাঁসারী তার কাঁসার বাসনের কারখানা বাতিল করতে এসেছে।

প্রশ্নে প্রশ্নে মুখর হয়ে উঠেছিল শুভ, আচমকা সে নির্বাক ও গম্ভীর হয়ে যায়। তিনজনের আপাদমস্তক এমনভাবে নিরীক্ষণ করে যেন কোন নেতা তার নিজের কার্টুন দেখছে!

তোমরা কাল সকালে এস।

তিনজনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে।

চোখের চাওয়ায় মুখের ভাবে আর মাথা নাড়ার সংকেতে তাদের মধ্যে যেন দুর্বোধ্য একটা পরামর্শ হয়ে যায় চটপট।

সকালে আজ্ঞা? দুপুরে না তো বিকেলে এলে হয় না? সকালে মোরা পাঁচজনা দুটো কথা কইতে বসব কাল।

এই নিয়ে সাংকেতিক পরামর্শ! এই ব্যাপার নিয়ে কাল সকালে তাদের সলাপরামর্শের বৈঠক বসবে, সেটা তাকে জানাবে কি জানাবে না। জানানোই

ভালো মনে করেছে তিনজনে। শুভ যেন না মনে করে যে তাদের তিনজনের দরবার করতে আসার মধ্যেই এ ব্যাপারের আরম্ভ আর শেষ।

সহজে তারা ছাড়বে না।

শুভ কারখানার ভিতর চলে গেলে গজেন তাদের ডেকে দোকানে বসায়। বিনয়ী সুখন মন্তব্য করে, ব্যাটাচ্ছেলে ভারি চালাক। দারোগার মত কেমন জেরা করলে দেখেছ?

গোষ্ঠ বলে, বিলেত থেকে শানিয়ে এয়েছে, বাপের চেয়ে বুদ্ধি চোখা।

গজেন বলে,—ছেলেমানুষের কাঁচা বুদ্ধি তো, এমনি কত খেয়াল জাগবে।

এ খেয়ালটা যে সাবাড় করবে মোদের!

এই সংঘাত অনিবার্য ছিল এবং সুখনদেরও বিপদের এই সূত্রপাতকে এড়িয়ে যাওয়া ছিল অসম্ভব।

বড় শিল্প গড়া যখন সম্ভব নয়, বরং দেশে ঠিক তার বিপরীত অবস্থা সৃষ্টি হয়ে থাকায় বড় শিল্পের মাঝারি সংস্করণগুলির আত্মরক্ষাই দায় হয়ে উঠেছে, তখন মহৎ সংকল্প আর উদার সদিচ্ছার যুক্তি দাঁড় করিয়ে অরক্ষিত কুটির শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামা ছাড়া শুভদের গতি কি? শুভর প্রতিভা আছে মানতে হবে। মুখে যাই বলুক, মনে যাই ভাবুক, সে উন্মুখ অসহিষ্ণু হয়ে তল্লাস করছিল কি করা যায়, কোন লাইন ধরা যায়। মেলায় বাসনপত্রের কেনাবেচা দেখে আর লক্ষ্মীর সঙ্গে কথা বলে দেশের মানুষের কাছে সোনারূপার আভরণের পরেই যে সংসার করার পিতল-কাঁসার উপকরণগুলির দাম এটা উপলব্ধি করেই সে ঠিক ধরে ফেলেছে কোন কুটিরশিল্পটা গ্রাস করা সুবিধা।

এদিকে খুব বড় একটা অঞ্চলের গ্রামনগরে আজ পর্যন্ত বাসন উৎপাদনের শুধু পুরানো ব্যবস্থাটাই প্রায় অনাহত ছিল। ছোট ছোট ঢালাই-পেটাই-এর ঘরোয়া কারখানাগুলিই এদিকের অধিকাংশ মানুষের বাসনের চাহিদা মিটিয়ে এসেছে।

পাল্লা দিয়েছে নাম-করা জায়গার ভাল বাসনের সঙ্গে।

সুখনদের সমস্যাটা শুভ সহানুভূতির সঙ্গেই বিবেচনা করে। ওদের সর্বনাশকে ছোট করে দেখবার তার উপায়ও নেই। তার প্রচেষ্টা সফল হওয়া মানেই ওদের বাসন তৈরী বন্ধ করা। ওরাও ডুববে না অথচ তার কারখানাও ভালভাবে চলবে এই অসম্ভব আর সম্ভব হয় কি করে? তাই, তার নিজের প্রচেষ্টার কল্যাণকর দিকগুলি ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে মনের মধ্যে খুব বড় করে রাখা বিশেষ ভাবে প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়ায় শুভর পক্ষে।

সেকেলে পচা উৎপাদন-ব্যবস্থা থেকে একটা জাতীয় শিল্প মুক্তি পাবে, বহু লোক কাজ পাবে, দেশের সম্পদ বাড়বে—এজন্য সুখনদের মত কয়েকজন মানুষকে যদি ডুবতে হয়, উপায় কি? কুটিরশিল্প টিঁকিয়ে রেখে তো আর শিল্পের যুগোপযোগী বিকাশ সম্ভব হয় না। নতুন গড়তে হলে পুরানোকে ভাঙতে হবেই।

দেশের শিল্পোন্নতির খাতিরে সুখনদের সমস্ত ক্ষতিকে তুচ্ছ করে দিতে হবে। জমিদারের ছেলে হয়েও তাকে যেমন তুচ্ছ করে দিতে হবে জমিদারি ব্যবস্থা লোপ করা হলে নিজের সমস্ত লোকসান। সারাদিন আত্মীয়বন্ধু অনেকের কাছেই সুখনদের কথা তুলে সে দুঃখ প্রকাশ করে। এদিকটা সত্যই আগে ভাবেনি। বাস্তব কী কঠোর, কিছু লোকের ক্ষতি তাকে করতেই হবে একটা ভালো কাজ করতে গিয়ে!

সুখনদের জন্য তাকে মাথা ঘামাতে দেখে কেউ কেউ আশ্চর্য হয়ে যায়। বাসন তৈরী কি একচেটিয়া সুখনদের, আর কেউ বানাতে পারবে না? কারবার মানেই তো পাল্লা দেওয়া, অন্যের বাজার দখল করা!

এ আলোচনা থেকে একটা কথা স্পষ্ট হয় শুভর কাছে। তার কারখানা কতদিন চলবে, প্রতিযোগিতায় সে নিজেই টিঁকবে কিনা, এ বিষয়ে অনেকের মনে বেশ খানিকটা সন্দেহ আছে!

জীবনকে সে কারখানায় একটা চাকরি দেবে বলেছে। কিন্তু জীবনের ভাব দেখে মনে হয় না কারখানা শৈশব পেরিয়ে বেঁচে থাকবে এ আশা সে পোষণ করে।

কাহিল সে হয় নন্দর কাছে। তার এই শিল্পপ্রচেষ্টার মহত্ত্ব এবং গুরুত্ব দুটোই স্রেফ বাতিল করে দেয় নন্দ।

তবে নন্দর সঙ্গে কথা বলে একটা সুবিধা হয় শুভর। পরদিন সুখনদের কি বলবে সেটা আন্দাজ করতে পারে।

নন্দ তাকে সোজাসুজি বলে, করছ কর, তুমি না করলে আরেকজন করত। ওসব বড় বড় কথা বোলো না! সুখনরা বাসন বানিয়ে কিছু লাভ করছে, তুমি বাসনের কারখানা করে তাতে ভাগ বসাতে চাও। এছাড়া আর কোন মানে নেই তোমার বাসনের কারখানার।

শুভ ক্ষুণ্ণ হয়ে বলে, কি রকম?

রকম খুব সোজা। শিল্পের কঠিন ব্যারাম, গড়ছেও না বাড়ছেও না। বিদেশীরা মুনাফা খাচ্ছে আর শুধু কটা দেশী রুইকাতলার মুনাফার পাহাড় জমছে। তোমাদের মত যারা দেশের শিল্পোন্নতি করে কিছু লাভ চাও, তোমরা কোন দিকে যাবে, কি করবে? দুটো মোটে রাস্তা। চোরাবাজারে নেমে চুরির মুনাফায় কিছু ভাগ বসানো নয়তো কুটিরশিল্পের ঘাড় ভেঙে ছড়ানো লাভের কিছুটা মেরে দেওয়া! তুমি শেষটা করছ। তোমার কিছু মুনাফা হবে, কিন্তু তোমার বাসনের কারখানা দিয়ে দেশের সম্পদও বাড়বে না, লোকের কোন উপকারও হবে না।

আমি শুধু মুনাফা চাই?

মনে চাও না, কাজে চাইছ। তুমি যে অনেস্ট! শুধু মুনাফাখোর হলে তো চোরাবাজারেই নেমে যেতে। ওটা পারবে না বলেই এ পথ নিয়েছ। নইলে বাসনের কারখানার এখন কি দরকার পড়েছে দেশে? লোকে তো বাসন পাচ্ছেই—অবশ্য যে কিনতে পারে। ঘরের বাসন যারা বেচে দিচ্ছে তাদের কথা নয় ছেড়েই দিলাম।

শুভ একটু গুম খেয়ে থাকে। কারখানা করার নৈতিক ভিত্তিটা এমন সরাসরি উড়িয়ে দেওয়ায় সে চটেছে।

গেঁয়ো ডাক্তার, সবজান্তা হয়েছ, তোমার সব একঘেয়ে একপেশে কথা।

বেশী বাসন তৈরী হবে, লোকে শস্তায় বাসন পাবে, কতগুলি লোকের কাজ জুটবে, এসব কিছুই নয় তোমার কাছে।

তার রাগ দেখে নন্দ হাসে।—চটছ কেন? আমরা তর্ক করছি বৈ তো নয়। বেশী বাসন তৈরি হবে? তোমার কারখানায় হয়তো হবে—সুখনদের এক একজনের তুলনায়! মোট বাসন বাড়বে না। তুমি যত বাড়াবে, সুখনদের তত কমবে। লোকের বাসন কেনার ক্ষমতাটা আগে বাড়িয়ে নাও, তারপর বেশী বাসন তৈরী করে দেশের সম্পদ বাড়িও!

শুভ গুম খেয়েই থাকে।

নন্দ বলে, বেকারকে খেটে খাওয়ার সুযোগ দেবে? তুমি তা হয়তো কয়েকজনকে দেবে, সুখনরা কারবার গুটিয়ে নিলে ওদিকে কয়েকজন বেকার হবে। শস্তায় বাসন দেবে? কত শস্তায়? পিতল-কাঁসার দর তো নামবে না তোমার জন্য। সোনার গয়নার মত বাসন ওজন দরে বিক্রি হয়। গয়নার মজুরি ধরা হয় ভিন্ন করে, বাসনের দরেই ওটা কষা থাকে। সুখনরা ভাগে ভাগে কম বাসন বানায়, তুমি এক জায়গায় বেশী করে বানাবে। কিন্তু সুখনদের অন্য সুবিধে আছে, ওরা নিজেবাও কারিগর, নিজেরাই সব দেখাশোনা করে, হিসাব রাখে। তোমাকে এসবের জন্য লোক রাখতে হবে। কত আর কম দামে তুমি বাসন ছাড়তে পারবে বাজারে?

শুভর মুখের গুমোট এবার কেটে যায়। সে অমায়িকভাবে বলে, সাধে কি বলি গেঁয়ো বুদ্ধি! আমার প্ল্যানটাই তোমার মাথায় ঢোকেনি। আমি কি কচি খোকা যে ওসব হিসেব না করে, কস্টিং না কষে, একটা কারখানা গড়ছি? বাসন কেনাবেচার এই সিস্টেমটাই আমি পাল্টে দেব। বাসন শখের জিনিস নয়, বাসন ছাড়া সংসার চলে না। এটার ওপরেই আমি জোর দিচ্ছি। পিতল কাঁসার দর ঠিক থাকবে, লোকের পয়সাও আমি বাড়াতে পারব না জানি কিন্তু বাসন কেনাতে পারব।

মন্ত্রবলে?

কম-দামী বাসন বানিয়ে।

নন্দ অসহিষ্ণু হয়ে বলে, এইমাত্র বললাম না বাসনের দাম তেমন কিছু কম করা যাবে না?

শুভ শান্তভাবেই বলে, করা যাবে। সায়ান্টিফিক মেথডে আমার বাসন তৈরী হবে, তুমি সেটা ভুলে যাচ্ছ। স্বর্ণকাররা পারে না, আমি পারব। ধর, অ্যাভারেজ সাইজের একটা কাঁসার গ্লাস। টেঁকসই গ্লাস করতে স্বর্ণকারদের যতটা কাঁসা লাগে, আমার তার চেয়ে অন্তত ওয়ান-থার্ড কম লাগবে। তাছাড়া শস্তা ধাতু মেশাল দিয়ে শস্তা মজবুত বাসন হবে।

ওঃ! তাই বল।

নন্দ খানিকক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে বলে, ভুলে যাচ্ছিলাম তুই সদ্য সদ্য বৈজ্ঞানিক হয়েছিস, বাসনও এখন পর্যন্ত বানাতে শুরু করিসনি।

এ কথা বলছিস কেন?

এতক্ষণ তুমি-তুমি কথা হচ্ছিল, নন্দ যে হঠাৎ তুই বলেছে এটা খেয়াল না করেই শুভও তুই-এ নেমে আসে। এরকম মাঝে মাঝে ঘটে তাদের মধ্যে।

নন্দ বলে, ঘর চিনিস না, ঘরোয়া জিনিস বাসনের ব্যাপারটাও ধরতে পারছিস না। একটা কথা লিখে রাখবি? ওসব কোন সায়ান্টিফিক কৌশল বাসনের বেলা খাটবে না। সায়ান্টিফিক মেথডে আরও ভালো বাসন বানাতে পারিস, প্ল্যাস্টিকের বাসনে বাজার ছেয়ে ফেলতে পারিস—কম কাঁসা শস্তা ধাতু এসব কোন নতুন কৌশল চলবে না। এতকালে ওসব ঠিক হয়ে যায়নি ভাবিস? মানুষ কি হাঁদা? কত কম কাঁসায় টেঁকসই বাসন হয়, মেশান ধাতুর বাসন কেমন হয়, সব জানা হয়ে গেছে। বাসন মাজতে হয়, ঘষতে হয়। যতটা পাতলা চলে তার চেয়ে কম কাঁসার পাতলা গ্লাস তোর কেউ কিনবে না। কলাই করা গেলাস-টেলাস কিনবে, নয় মাটির ভাঁড়ে জল খাবে। গয়নার বেলাও এই নিয়ম। যে কিনবে সে যতটা কম সোনায় টেঁকসই গয়না হয় ততটা সোনার গয়নাই কিনবে, যে তা কিনবে না সে একেবারেই কিনবে না।

আকাশে রাত্রির ছায়া রূপ নিতে শুরু করেছে। কাছে ও দূরে শাঁক বাজতে

আরম্ভ করেছে। ডিস্পেনসারির কেরোসিনের টাঙানো ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে এনে গঙ্গা শুভকে বলে যায়, যাবেন না। চা আনছি।

শুভ বলে, তবে কি বলতে চাও সুখনদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারব না?

নন্দ বলে, কেন পারবে না? তবে ওই যে শস্তা বাসন বানিয়ে ওদের কাবু করবে ভাবছ, ওভাবে পারবে না। তুমি নানা প্যাটার্নের বাসন গড়বে, তোমার সব বাসন সমান নিখুঁত হবে, লোকে চোখ বুজে তোমার বাসন কিনতে ভরসা পাবে। কিন্তু ওদের ক্ষতি করলেও একেবারে হটাতে পারবে না।

কেন?

জিনিসটা বাসন বলে, শস্তা বাসন দিতে পারবে না বলে। মস্ত গয়নার দোকানের পাশে স্যাকরার কতটুকু ছোট দোকানও চলে দেখেছ তো? বড় দোকানে কত প্যাটার্নের গয়না, লোকে কত নিশ্চিন্ত মনে কিনতে পারে যে এখানে ঠকবে না। তবু ছোট স্যাকরার দোকান উচ্ছেদ হয় নি। বড় দোকান অনেক কিছু পারে, শুধু কম দামে গয়না দিতে পারে না। তার দাম বরং কিছু বেশীই হয়। কাপড়ের মিল তাঁতিদের শেষ করেছে, গয়না বা বাসনের মিল করে স্যাকরা বা কাঁসারীদের শেষ করা যায়নি।

শুভ চুপ করে কথাটা ভাবে। কাল এই ভরসা দেওয়া চলবে সুখনদের!

নন্দ বলে, মেয়েদের অবস্থা যেদিন পাল্টাবে, গয়না গায়ে আঁটার দরকার থাকবে না, সেদিন শেষ হবে স্যাকরারা। আর কাঁসারীরা শেষ হবে তোমরা বৈজ্ঞানিকরা যেদিন কাঁসার চেয়ে শস্তা কিন্তু কাঁসার মত টেঁকসই বাসন দিতে পারবে। একটা কাঁসার বাসনে একজনের জীবন কেটে যায়।

গঙ্গা চা এনে দেয়।

দু-জনকে কাপে দিয়ে নিজে চলটা-ওটা কলাই-করা গ্লাসটা নিয়ে রোগীদের বেঞ্চটাতে বসে। সে প্রায় সব কথাই শুনেছে দুজনের। কথা শোনার জন্য ভিতরের দরজার কাছে বসে ল্যাম্প সাফ করেছে, চাও করেছে ওইখানে বসে। বিলাত-ফেরত একজন বৈজ্ঞানিক আর একজন ডাক্তার এতক্ষণ ধরে মশগুল হয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পিতল-কাঁসা ঘটি-বাটি নিয়ে আলাপ করতে পারে—এটা

উদ্ভট ঠেকছিল গঙ্গার কাছে। চীনা মাটির কাপে চুমুক দিতে দিতে শুভ বার বার তার হাতের কলাই-করা গেলাসটার দিকে তাকাচ্ছে দেখে গঙ্গার প্রায় হাসি পেয়ে যায়। কী চিন্তাক্লিষ্ট গুরুগম্ভীর এই অবিবাহিত ছেলেমানুষটা!

জমিদারের ছেলে বলে কি? স্বামীর ঘরে থাকার সময় প্রায় এই-বয়সী আরেকজন জমিদারের ছেলেকে সে কয়েকবার দেখেছে, বাইরে রাত কাটাবার জন্য তার স্বামীকে যার দরকার হত। সে ছিল হাল্কা হাসিখুশিতে উচ্ছল তামাসা-প্রিয় আর সাপের মত বজ্জাত। তার হাত ধরে টানার কথা বোকামি করে স্বামীকে বলে দিয়েছিল বলে স্বামীকে দিয়েই কত লাথি যে সে বজ্জাতটা তাকে খাইয়েছিল প্রতিশোধ নিতে!

তার সামনেই অমৃত জিজ্ঞাসা করেছিল, তুমি নাকি কাল ওর হাত ধরে টেনেছ?

সৌমেন অম্লান বদনে হেসে বলেছিল, বৌদির সঙ্গে তামাসা করছিলাম। রাগ করেছ নাকি বৌদি?

অমৃত মন্তব্য করেছিল, মেয়েমানুষের মন তো নয়, আস্তাকুঁড়।

সৌমেন চলে যাওয়া মাত্র অমৃত একটা লাথি মেরেছিল তাকে।

শুভ সৌমেনের মত নয়। ওর মুখ দেখলে কন্যাদায়গ্রস্ত বিপন্ন বুড়োর কথা মনে পড়ে যায়।

৮

অ্যাটম বোমার যুগে একটা বাসনের কারখানা কি আর এমন ব্যাপার ছিল? তবু চারিদিকে হৈ চৈ সমারোহ না হওয়ায় শুভ মনে মনে ক্ষুণ্ণ হয়। এ পর্যন্ত ধারেকাছে যা ছিল না সে তাই করেছে। লোকের কি কৌতূহলও জাগে না?

স্টেশনের কাছটা বেশ একটু সরগরম হয়েছে। নতুন কয়েকটা চালা ঘর উঠেছে কারিগরদের থাকার জন্য। এতদিন টিং টিং করছিল গঞ্জের আর

সনাতনের পানবিড়ি-চিড়েমুড়ি-তেলেভাজার দোকান, দেখতে দেখতে আরও তিনটে দোকান গজিয়েছে।

ছোট মুদীর দোকানটি দিয়েছে এ অঞ্চলের চেনা লোক গিরীন, তার মুদীখানার একপাশে কিছু তরিতরকারিও রাখা হয় বিক্রির জন্য।

অন্য দুটি দোকানই পানবিড়ি ও খাবারের—এবং দোকান দুটি দিয়েছে পাকিস্তান থেকে সপরিবারে উৎখাত হয়ে আসা দুটি মানুষ। যেন ওৎ পেতে ছিল, ওভর কারখানায় কাজ শুরু হতে না হতে কোথা থেকে উড়ে এসে গজেন আর সনাতনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রোজগারে ভাগ বসাতে দোকান খুলে বসেছে!

সনাতন ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, কোথা ছিলে বাবুরা অ্যাদ্দিন? টিকিটি তো দেখতে পাই নি? যাও না, নিজের দেশে ফিরে যাও না, হোটেল খুলে বোসো গে যাও।

নিমাইও ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, যেখানে খুশি দোকান দিমু, তোমার কি? পিথিমিটা কিনা রাখছ?

সুরমার তবু তিন-চার মাস বিলম্ব আছে, নিমাই-এর বৌ সুখদাকে দেখলেই বোঝা যায় তার দিন ঘনিয়ে এসেছে। সনাতনের যতই গা জ্বালা করুক, দুদিন আড় চোখে সুখদার উঁচু পেটটা নজর করে করে সুরমা নিজেই গিয়ে ভাব না করে থাকতে পারে না।

একেবারে একলাটি? বাপের কুলে শ্বশুরকুলে কেউ নেই এসময় কাছে থাকে?

আছে না? হ্যাশে আছে, কইলকাতায় আছে, যমের ঘরে আছে। কে কারে হ্যাখে কও?

তবু এ সময়টা—

কিয়ের সময়, কিয়ের অসময়!

নির্ভয় নিশ্চিন্ত ভাব! মনের মধ্যে একটু হু হু করে সুরমার। বিয়ে-করা স্বামীর কাছে আছে তাই কি এতটুকু ভয়-ভাবনা নেই? তার যে এখন থেকেই মাঝে মাঝে ভয়ে ভাবনায় মনটা খিঁচে যায় তার কারণ কি তবে এই যে সনাতন

তার স্বামী নয়? তা আশ্চর্য কিছুই নয়। দাঙ্গায় স্বামী মরার সাতদিন পরে সনাতনের ঘাড়ে নিজের দায় চাপাতে হয়েছিল। পেটের বাচ্চাটা কার তাও সে জানে না। ভাবতে গেলেই মনে হয় ছেলে হোক মেয়ে হোক সংসারে কি দশা দাঁড়াবে তার কে জানে?

ভাবতে গিয়ে অনির্দিষ্ট আশঙ্কায় গা যেন ছমছম করে তার।

কারিগর নিয়ে চিন্তায় পড়েছিল শুভ। সুখনদের কারিগর ভাগিয়ে আনা ছাড়া উপায় নেই এই ছিল তার ধারণা। সুখনরা পরামর্শ করে প্রাণপণে চেষ্টা শুরু করেছিল, বাসনের কাজ জানে এমন একটি লোকও যাতে শুভর কারখানার কাজ না নেয়। শাসানো হয়েছিল নানাভাবে।

কিন্তু যে বাজার! ভাতকাপড় জোটে না লোকের, বাসন কেনে কজন? বাসনের কাজ জানে এমন কত লোক যে বসে ছিল বেকার হয়ে, শাসান দিয়ে কি আর তাদের ঠেকিয়ে রাখা যায়?

পাকা কারিগর পর্যন্ত কাজের জন্য যেচে এসে আশ্চর্য করে দিয়েছে শুভকে।

আশেপাশের শহর আর কলকাতা শহর থেকে কারখানা দেখতে আসে আত্মীয়বন্ধু—শুভর খেয়ালের কারখানা! বাসনের শিল্পে যুগান্তর সৃষ্টি করবে শুভ, বাসন ব্যবহারের ফ্যাশন দেবে পাল্টে।

আত্মীয়বন্ধু ছাড়া অন্য লোকও আসে। ব্যবসায়ী এজেণ্ট, দাঁওবাজ, চাকুরিপ্রার্থী।

এরা শুভর মন থেকে খানিকটা মুছে দেয় চারিদিকে বিশেষ সাড়া না জাগার ক্ষোভ।

খোঁড়া গজেনের জন্য লক্ষ্মীকে দিনে অন্তত একবার দোকানে হাজিরা দিতে হয়—রাত্রে গজেন ঘরে ফিরে যায়, দুপুরের ভাতটা লক্ষ্মী দোকানে দিয়ে আসে।

শুভ একদিন তাকে বিশেষভাবে বলে, রোজ একবার কারখানায় ঘুরে যেও। তোমার সঙ্গে পরামর্শ আছে। তোমার পছন্দ অপছন্দটা আমি কাজে লাগাব।

মাইনে দিতে হবে কিন্তু!

তুমি তামাসা করলে—আমি সত্যি মাইনের কথা ভাবছিলাম!

ওমা, বলেন কি! দুদণ্ড কথা বলার জন্য মাইনে নেব কিরকম?

শুভ শান্তভাবে বলে, এমনি কথা বলা থাকছে না তো এখন, আমার কাজের জন্য তোমাকে দরকার হচ্ছে। উকিল ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারের পরামর্শ নিলে পয়সা দিতে হয়—তোমায় দেব না কেন?

অপমান বোধ করা উচিত কিনা বুঝতে না পেরে লক্ষ্মী বিব্রতভাবে বলে, ওদের কথা আলাদা। আমি মুখ্যু মেয়েমানুষ—

শুভ বলে, এইজন্য হঠাৎ তোমায় বলতে ভরসা পাইনি। তুমি হয়তো চটেই যাবে। মন দিয়ে আমার কথাটা শোন। কারখানার কাজের জন্যই তোমার মত গেরস্ত ঘরের একজনকে আমার দরকার। সাধারণ গেরস্ত ঘরের পছন্দ অপছন্দ ঠিকমত যাচাই করা খুব বড় ব্যাপার আমার কাছে। ধর, কতরকমের তো বাসন আছে, আমি কি জানি কোনটা না হলেই চলে না, কোনটা তার চেয়ে একটু কম দরকার, কোনটা না হলেও চলে? অনেক বাসন আছে, কি কাজে লাগে তাই জানি না; আরও কত বিষয়ে আমার জ্ঞান নেই। এমনি গেলাসেই জল খাওয়া চলে, আফকোরা কেন তৈরী হল? শুধু গেলাসের রকমারি হিসেবে না বিশেষ সুবিধে কিছু আছে? আমি এটা ভেবে পাই না। কারণ, গেরস্ত ঘরে গেলাস আর আফকোরার ব্যবহার আমি দেখি নি। তুমি হয়তো আমায় বুঝিয়ে দিতে পারবে।

লক্ষ্মী খুশী হয়ে বলেছিল, তা পারি। এমনি গেলাসের তলা থেকে ওপর পর্যন্ত সিধে, আফকোরার উপরের দিকটা বাইরের দিকে বেঁকে একটু ছেঁদরানো দেখেছেন তো? ওতে দুরকম সুবিধে। গেলাস পাশ থেকে ধরতে সুবিধে কিন্তু ওপর থেকে আঙ্গুলে ঝুলিয়ে ধরতে আফকোরায় সুবিধে বেশী। তাছাড়া, চুমুক না দিয়ে উঁচু থেকে মুখে জল ঢেলে খেতে গেলাসের চেয়ে আফকোরায় ভাল। মুখে না ঠেকিয়ে জল খেলে বার বার ধুতে হয় না।

শুভ উৎসাহিত হয়ে বলেছিল, দেখলে তো, কত কিছু জানবার বুঝবার জন্য তোমাকে আমার দরকার? শুধু তাই নয়। আমি নতুন ধরনের বাসন বানাব ভাবছি। নমুনা দেখে তুমি আমায় বলতেপারবেগেরস্তঘরে পছন্দ করবে কি না।

একটু থেমে স্বর পালটে বলেছিল, কাজেই বুঝতে পারছ, হঠাৎ দেখা হল, খানিকক্ষণ কথা বললাম, তাতে আমার কাজ চলবে না। তোমায় নিয়মমত কারখানায় আসতে হবে, দুতিন ঘণ্টা থাকতে হবে। তার মানেই চাকরি। চাকরি করে মাইনে নেবে না কেন ?

লক্ষ্মী বলেছিল, কাল বলব।

কৈলাস সব শুনে বলেছিল, নিশ্চয়, রোজ যেতে হলে মাইনে নেবে বৈকি ?

তারপর হেসে বলেছিল, দেখো, আবার অন্য চাকরি না করিয়ে ছাড়ে।

সে রাজী হওয়ায় শুভ সুখী হয়ে বলেছিল, এই তো চাই। তোমার নাম লক্ষ্মী, তুমি এটুকু লক্ষ্মী মেয়ে না হলে দেশের কি উপায় হবে ?

তারপর হেসে বলেছিল, তোমার যখন স্পেশালিস্টের কাজ, তোমার কাজের টাইম বেঁধে দেব না। কোনদিন এক ঘণ্টা কোনদিন দুঘণ্টা—দরকার হলে ঘণ্টা তিনেক। যেদিন যেমন দরকার হবে। কিন্তু একটা নির্দিষ্ট টাইমে তোমায় আসতে হবে। বাবার জন্য কটায় ভাত নিয়ে আসো ?

ঠিক আছে কি ? কোনদিন বারটা, কোনদিন একটা।

কি করে জানলে ? তোমাদের তো ঘড়ি নেই !

থানায় পেটা ঘড়ি বাজে না ?

শুভর মনে খুব আনন্দ। সে যেন অসাধ্যসাধন করেছে, লক্ষ্মীকে সমস্ত সংস্কার কাটিয়ে মাইনে নিয়ে তার কারখানায় চাকরি করতে রাজী করিয়েছে। যেমন সে কৃতজ্ঞ লক্ষ্মীর কাছে, তেমনি গর্বিত !

বলে, ভাবছিলাম তোমায় একটা ঘড়ি প্রেজেণ্ট দেব। ভেবে দেখলাম, এখন সেটা ঠিক হবে না। লোকে নানা কথা বলবে। এখন দিলে সেটা আমার দেওয়া হবে কিনা। কাজ আরম্ভ হোক, তারপর কারখানার পক্ষ থেকে কাজের সুবিধার জন্য তোমায় ঘড়ি দেওয়া হলে কেউ কিছু বলতে পারবে না।

লক্ষ্মী সহজভাবেই বলেছিল, ঘড়ি দেননি বলেই লোকে কিছু বলছে না ভেবেছেন নাকি ?

শুভ যেন চমকে উঠেছিল, ভড়কে গিয়েছিল।

সত্যি নাকি ?

লক্ষ্মীর কাছে আশ্চর্য দুর্বোধ্য লেগেছিল তার এমনিভাবে ঘাবড়ে যাওয়া! চাষাভুষোর সঙ্গে ভাব করতে চায়, ঘনিষ্ঠ হয়ে জানতে বুঝতে চায় তাদের হৃদয়-মন, এটুকু সাধারণ বুদ্ধি শুভর নেই? জগদীশের ছেলে গজেনের মেয়ের সঙ্গে মেলায় রাস্তায় এখানে ওখানে এত আগ্রহ নিয়ে এতক্ষণ ধরে কথা বলছে দেখেও—শুধু প্রকাশ্যভাবে কথা বলছে বলেই লোকে চুপ করে থাকবে, এই শেষে ধারণা হল তার?

লোকে তো বলবেই। তারা কি জানছে আপনার আমার কথা? জানছে যে আপনার মাথায় বাসন ঢুকেছে, আপনি বাসন নিয়ে পাগল, আমার সাথে শুধু বাসনের কথা বলেন? খাপছাড়া ব্যাপার তো হচ্ছে এটা? দশটা দুঃখী মানুষ বুঝবে কি করে বলুন?

লক্ষ্মীর গলা কেঁপে যায়।

বলছে বলুক, আমি গা করি না। কারখানা যদি গড়তে পারেন, দশটা লোক খেতে পায় কারখানা থেকে, কি আসবে যাবে লোকে একটা অসম্ভব কথা বানিয়ে বললে? কি জানেন, খাপছাড়া কিছু দেখলে লোকে যন্তরের মত মানে করে বসে, বিচার করে ছাখে না। ছোটবাবু নজর দেবে লক্ষ্মীর দিকে, তাও যদি কচিকাঁচা হতাম। কি বিবেচনা মানুষের, বলিহারি যাই!

শুভর মুখ দেখে লক্ষ্মী ভড়কে যায়।

ঘাবড়ে গেলেন না কি ছোটবাবু? না না, আপনি মোটে ভাববেন না। আপনার তো বদনাম হয় না। লোকে যদি হাসাহাসি করে তো মোকে নিয়ে করবে। তা করুক গে যাক। অমন আগেও করেছে পরেও করবে।

শুভর বুক কেঁপে গিয়েছিল। একটা তোলপাড় উঠেছিল হৃদয়ে। তবে অল্পক্ষণের মধ্যেই সেটা মিলিয়ে যায়। মনপ্রাণ তার ডুবে গেছে কাজের মধ্যে, নতুন কিছু গড়ে তোলার চেষ্টার মধ্যে। তবু লক্ষ্মীর কাছে আচমকা তাদের নিয়ে কথা রটেছে শুনে ভিতরটা তার মোড়ামুড়ি দিয়ে উঠেছে।

বংশগত রোগ। রক্তমাংসমজ্জায় মেশানো রোগ। চমক লাগার মত মাঝে মাঝে অতর্কিতে শুভর ভয় করে, বুক কেঁপে ওঠে।

ভূদেব, করুণাময়ী এবং কয়েকজন বন্ধু এবং বান্ধবীদের সাথে মায়া সেদিন কারখানা দেখতে এল।

ভিতরে লক্ষ্মীর সঙ্গে কথায় শুভ মশগুল। মায়াদের আবির্ভাবজ্ঞাপক স্লিপটি দরোয়ানের কাছ থেকে যথারীতি বাঁ হাতে নিয়ে না পড়েই শুভ হুকুম দেয়, ঠহ্‌রনে বোলো।

লক্ষ্মী সেদিন একটা ছাপা শাড়ি পরে এসেছিল। শস্তায় ছাপা শস্তা শাড়ি। রোজ কারখানায় যেতে হবে, চাকরি করছে, কৈলাসকে সে কলকাতা থেকে একটা শাড়ি কিনে আনতে দিয়েছিল—কলকাতায় নাকি শস্তায় ভালো শাড়ি মেলে। কী যে রুচি আর পছন্দ কৈলাসের, এনে দিয়েছে এই ছাপা শাড়িটা। নিজের পকেট থেকে কিছু দিয়েছিল কিনা কে জানে!

গজেন দেখে বলেছিল, বাঃ, খাসা কাপড়টা।

কিন্তু তার পছন্দ হয়নি, সে শিউরে উঠেছিল লজ্জায়।

কাপড়টা সাত-আটদিন লক্ষ্মী পরেনি। সাবান-কাচা মোটা খাটো শাড়ি পরেই কারখানায় এসেছে গিয়েছে। কি ভারী শাড়ি! ধুলে এক পরলে ছাড়া নিঙরানো যায় না। অমন শক্ত মোটা শাড়িটাও ফেঁসে গেছে।

সেজন্যই বোধ হয় তেমন লজ্জাও করছে না তার।

এই শাড়িখানা তার পরনে না দেখলে হয়তো রাম সিং দরোয়ান মায়ার সই করা চিরকুট দেখার সময় একটু বিশদ করে জানাত কি ধরনের কেমন লোকেরা ফটকের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। শুনে শুভও হয়তো সচেতন হত। কিন্তু এরকম একটা শাড়িপরা মেয়ের সঙ্গে বাবুকে এমন আত্মহারা হয়ে কথা বলতে দেখে তাকে কিছু বলার সাহস রাম সিং খুঁজে পেল না।

নিয়ম সম্পর্কে শুভ ভারি কড়া। স্বগনদের সম্পর্কে মনে মনে তার একটু আশঙ্কাও ছিল। তাই গেট পাশ বা হুকুম ছাড়া কারো কারখানায় ঢোকা বিশেষভাবে নিষিদ্ধ ছিল।

শুভর কারখানার গেটের সামনে মায়াদের তাই অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। অনেকক্ষণ মানে মিনিট দশেক।

রাগ চড়তে চড়তে মায়া পৌঁছে যায় টং হবার অবস্থায়।

এই! বাবু ভিতরমে হ্যায়?

হুজুর।

হাম ভিতর চলতা।

হুকুম নেহি হুজুর।

চোপরাও! হুকুম নেহি!

মায়া গট গট করে ভিতরে ঢুকে যায়।

বাসন নিয়েই লক্ষ্মীর সঙ্গে কথা হচ্ছিল শুভর। নতুবা এতটা সে মশগুল সে হয়ে পড়ত না। গরীবের মেয়ে একটু তেজী আর সপ্রতিভ হলেই সিনেমায় তার জন্য জমিদারের ছেলের ভীষণ টান জন্মায়, দেশী বাংলা সিনেমা দুচারটির বেশী দেখেনি বলেই বোধ হয় শুভর বেলা সেটা ঘটেনি।

সাধারণ চাষীর ঘরে কি ধরনের বাসন সবচেয়ে বেশী ব্যবহার হয়, বিয়েতে মোটামুটি কি কি বাসন যৌতুক দেওয়া হয়, গরীবের ঘরেও মেয়েরা যে ঝকঝকে করে মাজার জন্য ঘষে ঘষে দামী বাসনও ক্ষয় করে ফেলে এই বেহিসেবী ব্যাপারের আসল মানেটা কি, এই সব নানা কথা সে খুঁটিয়ে জেনে নিচ্ছিল।

শহুরে আর গ্রাম্য বাসনে তফাত আছে কিনা আর থাকলে সেটা কি রকম তফাত বুঝবার চেষ্টা করতে চাওয়ায় লক্ষ্মী হেসে ফেলে।

বাসনের কি শহর আর গাঁ ভেদ আছে ছোটবাবু? বাসনের তফাত হল গিয়ে পয়সার তফাত। গরীবের ঘরে সাদামাটা ছোটখাট বাসন, বড়লোকের ঘরে রকমারি দামী দামী বাসন। কলসীই ধরুন না। শহরেও কলসীতে জল রাখে, গাঁয়েও তাই রাখে। গেঁয়ো বৌয়ের পুকুরে ডুবে মরতে সুবিধা হবে বলে কি গাঁয়ের জন্য ভিন্নরকম কলসী বানায়?

মায়ার আবির্ভাব ঘটে ঠিক এই সময়।

দেখতে পায় সামনে মুখোমুখি চেয়ারে বসে লক্ষ্মী আঁচলে বাঁধা কৌটা থেকে পানদোক্তা নিয়ে মুখে দিচ্ছে, শুভ একান্ত দৃষ্টিতে তাই দেখছে!

শুভ? এটা কি ব্যাপার?

তাকে দেখে খুশি হয়ে শুভ বলে, এস, এস। তুমি যে হঠাৎ?

তার খুশিকে অগ্রাহ্য করে মায়া মুখের ভাব আর গলার স্বরে যতটা পারে রাগ দেখিয়ে বলে, বাবা এসেছে, মা এসেছে, আমার বন্ধুরা এসেছে, আমাদের আধঘণ্টা গেটের বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছ কেন?

আমি জানতে পারিনি।

কখন স্লিপ পাঠিয়েছি দারোয়ানকে দিয়ে।

তখন হাতের স্লিপটার কথা খেয়াল হয় শুভর। লজ্জিত হয়ে বলে, ইস্, ভারি অন্যায় হয়ে গেছে। তুমি বোস মায়া, আমি নিজে গিয়ে সকলকে নিয়ে আসছি।

থাক। আর আদরে কাজ নেই। আমরা কেউ তোমার কারখানায় ঢুকব না।

বলে মায়া আপিস-ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

সুতরাং শুভকেই গিয়ে তার সঙ্গ ধরতে হয়।

চলতে চলতে মায়া বলে, তোমার এতদূর উন্নতি হয়েছে? কারখানার একটা কুলি মাগীকে চেয়ারে বসিয়ে হাসিগল্প চালাও?

শুভ বলে, ছি, মানুষকে এত অশ্রদ্ধা কোরো না মায়া। ও কারখানায় চাকরি করে কিন্তু গাঁয়ের গৃহস্থ ঘরের মেয়ে।

গাঁয়ের গৃহস্থ ঘরের মেয়েকে তুমি পেলে কোথায়?

আমার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল—

আলাপ! এদের সঙ্গেও তোমার আলাপ হয়?

শুভ ক্ষুব্ধ হয়ে বলে, তোমার কী হয়েছে বল তো? তুমি তো এরকম ছিলে না? বাড়ির ঝিকে অপমান করলে তুমি কাকীমার সঙ্গে ঝগড়া কর—

পিছন থেকে লক্ষ্মী বলে, ঝিকে চেয়ারে বসিয়ে কেউ তো তার সঙ্গে হাসিগল্প করে না ছোটবাবু?

কিছু মনে কোরো না লক্ষ্মী।

না। এঁর রাগ হয়েছে কেন বুঝতে পারছেন না? আমার সঙ্গে আপনার ভাব হয়নি, আপনার এখন বাসনময় প্রাণ বলে বাসনের কথা কইতে জগৎসংসার

ভুলে গেছলেন, তাই ওনাদের একটু দাঁড়াতে হয়েছে—এসব বুঝিয়ে বলল রাগ কমে যাবে।

একটু টেনে টেনে সে কথাগুলি বলে। সে যে কিছু মনে করেনি এটা তাতে অপ্রমাণিতই হয়ে যায়। একজন অপমান করলেও কিছু মনে করবে না, এরকম বেখাপ্পা উদারতা লক্ষ্মীর অনেককাল উপে গেছে।

সে চলে গেলে মায়া মন্তব্য করে, আমি দেখেই বুঝেছি, মেয়েটা ভালো নয়। নইলে এরকম শাড়ি পরে?

তুমি ওকে চেনো না তাই—

চিনে কাজ নেই আমার।

লক্ষ্মী সনাতনের ঘরে গিয়ে সুরমার কাছে জল চেয়ে খায়। সুরমার হাতে জল খেয়ে লক্ষ্মীর মা-মাসীর জাত যেত, লক্ষ্মীরও কি আর একটু অস্বস্তি বোধ হত না আগে? রাজকীয় ধর্ষণে জন্মের মত তার জাত যাওয়ায় সুবিধা হয়েছে।

শুভর কারখানা এখনো ঠিকমত চালু হয় নি, তবু ইতিমধ্যেই দোকানের বিক্রি বাড়ায় সনাতন খুব খুশি। শুধু দলে দলে লোকে ভাগ বসাতে আসছে এই যা একটু মুশকিল। দোকানের তেলেভাজা খাবার শুধু নয়, দু-একটা ভালোমন্দ জিনিস সুরমাকে খাওয়াতে পারবে। কিন্তু কী যে বেখাপ্পা ব্যাপার মেয়েদের, এই দুর্দিনে ভালো-মন্দ জিনিস সামনে ধরে সাধাসাধি করলেও সুরমা খেতে চায় না!

৯

এদিকে চাষীদের চরম দুরবস্থা। পেটে আগুন, বুকে আগুন।

শনিবার গাঁয়ে ফিরেই কৈলাস খবর শোনে, পিনাক ভূষণ পুলিন তোয়াবদের মত কিছু মরিয়া চাষী ধরণীর মরাই লুট করার কথা ভাবছে।

রামপুর এলাকা জগদীশের খাস তালুক। সেখানে লোকে নাকি জোর করে খামারের ধান বার করে সকলের সামনে ন্যায্য দরে বিক্রি করে দিয়েছে,

একান্ত দুঃস্থদের দিয়েছে ঋণ হিসাবে। এরাও ওইরকম কিছু করতে চায়। বাজেন দাস পর্যন্ত নাকি সায় দিয়েছে।

কৈলাসকে খবর জানায় লক্ষ্মী। মানুষটাকে নিয়ে তার রীতিমত দুর্ভাবনার কারণ ঘটছে। শুভর কারখানায় সে কাজ নেবার পর আরও যেন বিগড়ে গিয়েছে কৈলাসের মন।

এসব খবর শুনে যদি তার একটু ভাল লাগে এই আশায় লক্ষ্মী উদগ্রীব হয়ে থাকে। খবর শুনিয়ে বলে, মরিয়া হয়ে নিজেরা নিজেরাই সব ঠিক করছে। ডাক্তারকে পর্যন্ত ডাকে না পরামর্শের জন্যে। তুমি বাবু এদিকে একটু নজর-টজর দাও।

রাত্রেই সে দুচারজন চাষীর সঙ্গে কথা বলে। নন্দব সঙ্গে পরামর্শ করে।

সকালে বেরিয়ে পড়ে রামপুরের ব্যাপারটা নিজে গিয়ে দেখে শুনে বুঝে আসতে।

মেটে পথ ধরে চলতে চলতে কৈলাস ভাবে, চাকরি পেয়ে লক্ষ্মী হঠাৎ কেমন বদলে গেছে! উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তার মুখখানা পর্যন্ত। একি শুধু মেয়েমানুষ হয়েও দুটো পয়সা কামাচ্ছে বলে?

শুভর খেয়ালের কারখানায় তারই খেয়ালে দেওয়া চাকরি। তাকে নাকি বেশ খাতিরও করে শুভ। কে জানে কিসের খেয়ালে করে? তাকে নিয়ে মায়ার সঙ্গে শুভর চটাচটির কাহিনী শুনে লক্ষ্মীকে শুভর এত বেশী খাতির করা মোটেই পছন্দ হয়নি কৈলাসের।

মেটে পথ, জমি থেকে হাত দেড়েক উঁচু, স্থানে স্থানে সমতল। দুটি গোরুর গাড়ির পাশ কাটাবার মত চওড়া খুব কম জায়গাতেই। যে গাড়ির বোঝাই কম বা যার বাঁ দিকে ঢাল কম খাড়াই বেশী, সেই গাড়ির মাঠে নেমে অন্য গাড়িকে পথ ছেড়ে দেওয়া রেওয়াজ। কদাচিৎ দূর থেকে মোটর গাড়ির আওয়াজ পেলেই, গোরুর গাড়িগুলি চটপট মাঠে নেমে যায়, ডাইনে বাঁয়ে যে দিকে সুবিধা। ছোট-ছোট গ্রাম পড়ে দুপাশে, কতগুলি মাটির ঘরের সমাবেশ, কিছু ফল-ফুলের গাছ, লাউ-কুমড়ার মাচা, বাঁশঝাড়, ডোবা বা

অবাঁধানো ছোট অগভীর কুয়া, চৈত্র-বৈশাখ মাসে কোনটাতে একটু তলানি জল থাকে, কোনটা একেবারে শুকিয়ে যায়। যতটুকু ঠাঁই পায় ঘর তুলতে চাষী তারও সবটুকু জুড়ে বড় করে ঘর বানাতে পারে না, ছোট নীচু কুঁড়ে ঘর বাঁধে। অনেক দিনের পুরানো গ্রামও আজ এমন রিক্ত যে দেখে মনে হয় অস্থায়ী বস্তি বুঝি, যে কোন দিন মানুষগুলি চলে যাবে গাঁ ছেড়ে, খাঁ-খাঁ করবে শূন্য পরিত্যক্ত ভিটেগুলি। চোখে পড়ে ও-রকম পরিত্যক্ত দু-একটা সাঁওতাল বস্তি, জমিদার-জোতদারের শোষণ আর অত্যাচার সইতে না পেরে দল বেঁধে চলে গেছে।

বড় একটি গ্রাম পড়ে মাঝ-পথে, নাম আনিখা। আনিখার কাছাকাছি কাঁচা রাস্তাটা পড়েছে বাঁধানো পথে, মাঝখান দিয়ে ডাকঘরের সামনে দিয়ে পথটা চলে গেছে। কয়েকটি পাকা-বাড়িও আছে আনিখায়, হপ্তায় দু দিন গ্রাম-প্রান্তে হাট বসে। এখানে গুড় তৈরী হয়, তিল আর সর্ষের চাষ হয় ভাল, প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণে শহরে চালান যায় কলে পিষে তেল তৈরী হবার জন্য। তাঁতের কাপড়-গামছা কিছু তৈরী হয়।

আগে ত্রিশ ঘরের বেশী তাঁতির বাস ছিল, একটু নাম ছিল আনিখার কাপড়-গামছার। যুদ্ধের ক বছরে দশ-বারো ঘর উৎখাত হয়ে গেছে সুতোর অভাবে, অন্যেরা টিঁকে আছে শোচনীয় অবস্থায়, অনেকের তাঁত পর্যন্ত মহাজন দাদনদারের কাছে বাঁধা। পথের ধারে পান-বিড়ি, চিঁড়ে-মুড়ি, দই-মিষ্টির দোকান, গ্রাম্য মুদীখানা, মসলাপাতি তেল নুন জ্বালানি কাঠ থেকে চায়ের প্যাকেট চিরুণী কাঁটা মাথার তেল সব কিছু মেলে। একটি বেঁটে খাটো ওষুধের আলমারি নিয়ে চিরঞ্জীব ডাক্তারের ওষুধের দোকান। কুণ্ডুর দই-মিষ্টির দোকানে চিনির চায়ের সঙ্গে গুড়ের চা-ও মেলে, দুচির-করা বাঁশের বেঞ্চে বসে কোঁচার খুঁটে গরম কাচের গেলাস ধরে জিরিয়ে জিরিয়ে পান করা যায়।

গুড়ের চা আগে রুচত, শহরে খাটতে যাওয়ার পর রুচিটা বদলে গেছে। বেশী দামে আধা গেলাস চিনির চা-ই খায় কৈলাস—শুধু চা। আজ ঠাণ্ডা পড়েছে বেশ, তাড়াতাড়ি শীত এগিয়ে আসছে অথবা কে জানে, এ বছর

খোরাক কম পড়েছে আরো, দেহের শক্তিতে যে কত ভাঁটা পড়েছে সে তো টের পাওয়া যায় স্পষ্টই, এখান পর্যন্ত হাঁটতেই কষ্ট বোধ হয়েছে রীতিমত। দেহে তেজ নেই, শীতের গোড়ার দিকেই তাই ঠাণ্ডা মনে হচ্ছে বেশী।

রামপুর থেকে আসছিল গুড়ের ব্যাপারী ইনাবালি, রোগা লম্বা চেহারা, দেড় আঙুল মুর, গায়ে আধময়লা কোরা মার্কিনের হাতকাটা সার্ট, কাঁধে পুঁটলি-বাঁধা গামছা।

তার সঙ্গে চেনা ছিল কৈলাসের। যুদ্ধের পর হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার দিনে শুধু এই ইনাবালির চেষ্টায় রামপুরে বড় হাঙ্গামা বাধাবার সমস্ত উস্কানি ব্যর্থ হয়ে যায়। মানুষটা সে ছিল অত্যন্ত রসিক প্রকৃতির। মানুষটাকে পছন্দ করত সকলেই। ডাক দিয়ে ইনাবালিকে বাঁশের বেঞ্চে বসিয়ে দুএকটা কথা বলতে বলতেই কৈলাস টের পায় মানুষটার সহজ স্বাভাবিক রসকস প্রায় শুকিয়ে গেছে। কেমন একটু চিন্তিত সচকিত ভাব। রসিকতা আজও করে কিন্তু সেটা কৃত্রিম মনে হয়।

রসিকতা করেই বলে, চা মিলবে তো কুণ্ডু বাবু? আমি কিন্তু বাবা একদম খাঁটি মোসলা।

চা বানাতে বানাতে কুণ্ডু বলে, না মিলবে না; পাকিস্তানে যান।

কৈলাস আলাপ করে ইনাবালির সঙ্গে। রামপুরের খবর? আর রামপুর, হাঙ্গামা লেগেই আছে রামপুরে। বার বার খালি বন্দুকধারী পুলিস এসে আস্তানা গাড়ছে সেখানে, একেবারে তছনছ করে দিচ্ছে মানুষের জীবন।

প্রতাপদীঘি বিলের জেলেরা জালের খাজনা, মাছের আবোয়াব ভাগ আদায়, ওজনে চুরি, কম দর এ সব নিয়ে গোলমাল করেছিল। তার উপর মদনের চোরাই চালানের চাল আটক করে কণ্ট্রোলের দরে সকলকে বেচে দেওয়া নিয়ে বেধেছিল আর একটা হাঙ্গামা। প্রথমে সমিতির ভলানটিয়াররা চাল আটক করে, মদনের লোকজন আর থানার পুলিস এসে তাদের মারতে আরম্ভ করতে ছুটে আসে সবাই, জেলেরা পর্যন্ত। সেইখানে সবার সামনে ওজন করে নগদ দামে চাল বেচে টাকা দেওয়া হয় মদনের লোককে।

বিশ-পঞ্চাশ জনাকে ধরেছে লুঠের দায়ে।

লুঠ?

লুঠ, মদনের গুদোম থেকে লুঠে নে গেছে চাল।

তাছাড়া কি? মদন হাত পেতে দাম নিল চালের কিন্তু ওদের ধরা হল লুঠের দায়ে। রাতারাতি লাইশেন পেল মদন, ও চালানি কম দামে রিলিফ বিলানোর চাল। গুদাম থেকে লুঠে নিয়ে গেছে, ডাকাতি করেছে, ধরবে না?

কৈলাস বলে, হুঁ, তা এখন কি ব্যাপার? বড়কর্তার খামারের ধান নাকি লুঠ হয়েছে?

ভাঁড়ের চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে ভাঁড়টা ছুঁড়ে ফেলে ইনাবালি গলা নামিয়ে বলে লুঠ? তা লুঠ বললে লুঠ, নইলে না।

মদনের চোরা চালের মতই ঘটনা। দলবেঁধে খামারের ধান ছিনিয়ে বার করে উচিত দরে বিক্রী করা হয়েছিল—নেহাত যারা দুঃস্থ তাদের দেওয়া হয়েছিল ঋণ হিসাবে। দুঃস্থই নাকি ছিল বেশীর ভাগ। এই তো সেদিনের ঘটনা। তারপর পুলিসী ঝড় বয়ে গেছে রামপুরের উপর দিয়ে। জগদীশের লোকেরা তাণ্ডব চালিয়েছে। রামপুর এখনো প্রায় ঘিরে রেখেছে পুলিস আর জগদীশের লোকেরা।

যাই ইবার। অনেকটা পথ।

সাধে কি রসকস শুকিয়ে গেছে ইনাবালির। কৈলাসও সঙ্গে চলতে আরম্ভ করে বলে, আমিও যাব রামপুর।

কি দরকার? হয়রানি সার হবে। নতুন লোক দেখলেই ধরবে, নাজেহাল হয়ে যাবেন। চার-পাঁচ দিনের কমে হবে মালুম হয় না। কি আর দেখবেন ব্যাপার? সে দেখাই আছে। ফিরে যান ভাই।

ইনাবালির উপদেশ মেনে নেয় কৈলাস। আজ সন্ধ্যায় লোচনের বাড়িতে পিনাক সামন্তদের জমানোর ব্যবস্থা করেছে। তাকে হাজির থাকতেই হবে।

দাওয়ায় একটা প্রদীপ জ্বালিয়েছে লোচন এতগুলি লোকের জন্য। সরু সলতের ডগায় ক্ষীণ মুমূর্ষু শিখাটা জ্বলছে, সতর্ক নজর রেখেছে লোচন, মাঝে

মাঝে একটু উস্কে দিচ্ছে সলতেটা। সে আলো যেন ছায়াপাতও করেনি মাটির মেঝেতে চাটাই-এ বসা জ্যান্ত মানুষগুলির, চেনা বলেই কোনমতে চিনিয়ে দিতে পারছে মুখগুলি। অন্দরের আঁধার থেকে ভেসে আসছে মেয়েদের ছাড়া ছাড়া কথার আওয়াজ আর থেমে থেমে দয়ার বিনিয়ে কাঁদার স্বর! সেই বুঝি একা একটু শোক করছে ছেলেটার জন্য, বাড়িতে যদিও স্ত্রীলোক মোট পাঁচটি, বাচ্চা ক'টা বাদ দিয়েও। তবে তীক্ষ্ণ গলা ঝিমিয়ে মিইয়ে অস্ফুট হয়ে এসেছে ইতিমধ্যেই দয়ার। পুত্রশোকও জলো হয়ে গেছে মানুষের শোকে শোকে, এমনই তো বছর প্রায় ঘুরত না মড়া-কান্না না কেঁদে, তার ওপর লাঠি গুলি বন্যা দুর্ভিক্ষ মহামারী আর হিংসার মামলা যদি জোট বেঁধে এসে কাঁদাতে চায় অবিরাম, একটার বদলে এক সাথে দশটা মরণের ঘায়ে বুক ফাটিয়ে, কাহাতক শোক করতে পারে মানুষ।

সদরের আদালতে সব ঢেলে দিয়েছে লোচন। একছটাক তামাক কেনার নগদ পয়সা পর্যন্ত তার নেই। অথচ রাজেন দাস আজ এসেছে তার বাড়িতে!

ঘনরাম গিয়েছিল একটু তামাক ধার চাইতে প্রতিবেশী বটুকের কাছে। ফিরে এসে বলে, খুড়োর তামাক নেই।

এক ছিলুম নেই? এক ছিলুম দিলে না? হতাশার রাগে গলা চড়ে যায় লোচনের।

বলল তো কাল থেকে তামাক ফাঁক। তামাক টানতে টানতে বলল।

অ! ব্যাটা কঞ্জুস!

আর বলল কি শুনবে? উপোস পেটে তামুক খেলে রক্ত-বমি হয়। গাঁজা টানো, সিদ্ধি পাবে। হাসি কি! ঠিক যেন শ্যালের গলায় কাসি ঠেকেছে।

বেজন্মা, বজ্জাত! ব্যাটার বৌটাকে ঘর ছাড়ালে।

রাজেন বলে, ইন্দ্র ফুসলেছে না?

ফুসলেছে, অমন সবাইকে ফুসলায়। কে কোথা ফুসলায় আর ওমনি ঘর ছাড়ে ঘরের বৌ, না কি বটে? কারো ঘরে মেয়ে-বৌ রইত না তালি। খেতে দিত না তো কি করবে ঘর না ছেড়ে?

পিনাক বলে, ঠিক কথা, ভাতের ঘাটা নেই বটুকের। তবু ব্যাটার বৌটাকে না খেতে দিয়ে ঘর ছাড়ালে।

তামুক ছাড়া জমে না।—আরেক বার আপসোস করে লোচন। নাতির মরণে সে যেন তেমন কাতর নয়, তামাকের জন্য আপসোসটা বেশী। বিশেষ করে রাজেন দাস আজ যেচে এসে তার দাওয়ায় বসেছে বলে। মাননীয় ব্যক্তির পদার্পণে ধন্য হয়ে তাকে খাতির করার সাধ মেটানো গেল না বলে নয়, যে ছিল পরম শত্রু সে আজ বাড়িতে এসেছে বলে। সাপ-বেজীর সম্পর্ক ছিল তাদের অনেক কাল। রাজেনের বোন সুখদা ছেলেপিলে নিয়ে আজ সাত বছর ঘর করেছে শিয়াপোলের অনন্তের, তাকে ঘনরাম বিয়ে করেনি কথাবার্তা পাকা হবার পর—এই ছিল ঘটনা। ঘাটের পথে সাঁঝের বেলা একলা সুখদাকে নিমাই ছোঁড়ার সাথে কথা কইতে দেখেছিল, হেসে হাত নেড়ে কথা কইতে দেখেছিল ঘনরাম নিজের চোখে—এই ছিল কারণ। কথা সে-ই কইতে দিয়েছিল নিজে, দুটো মিষ্টি মিষ্টি প্রাণের কথা আর বলা হয়নি প্রাণের জালায়। খটকা একটা এমনিই ছিল ঘনরামের মনে যে তার সাথে লুকিয়ে ভাব করতে পারে যে মেয়েটা সে কি আর অন্যের সাথে পারে না ? এ ক্ষেত্রে অবশ্য ভাবটা হয়েছে তারই সাথে, কিন্তু কথা হল, স্বভাব ভাল যে মেয়ের সে তো এ রকম ভাব-সাবের ব্যাপার করে না কারো সাথেই ! যে খুঁতখুঁতানি মনে ছিল সেটা প্রত্যয় হল হেসে হেসে নিমাই-এর সাথে হাত নেড়ে কথা বলা দেখে, বাঁশ-ঝাড় গাছপালায় ঘেরা যে নির্জন স্থানটিতে শুধু তারই সাথে কথা বলার কথা ছিল সুখদার ! ছেলের কথায় বিয়ে তাই ভেঙ্গে দিল লোচন, নিজে যেচে বরণ করা যন্ত্রণায় ঘনরামও দিশেহারা হয়ে রটিয়েও দিল মেয়েটার নামে মনগড়া কলঙ্ক।

তারপর ঘটনা রটনা গালাগালি হাতাহাতি পুরানো হয়ে তলিয়ে গেল অতীতে, জিদ বজায় রইল মুখ-দেখাদিখি বন্ধ রাখার, শত্রুতা করার।

বিয়াল্লিশ সালে দেশজুড়ে ব্যাপার হল একটা। বন্দুক উঁচিয়ে সৈন্য-পুলিস এসে অন্য কটা ঘর-বাড়ির সাথে পুড়িয়ে দিল রাজেনের বাড়ি, আর এমনি মজার যোগাযোগ অদেষ্টের যে, দুকোশ তফাতে কেঁদা গাঁয়ে লোচনের মামা

জগন্নাথের বাড়িতে সপরিবারে আশ্রয় নিয়ে দুটো রাত কাটাতে হল রাজেনকে সপরিবার লোচনের সাথেই। রাজেন ভেবেছিল, মামাকে বলে ভূষণ তাদের খেদিয়েই দেবে বেহদ্দ মার-ধোর খুন-জখম বলাৎকার ঘর-পোড়ানোর তাণ্ডবের মধ্যে। তা, কথাটা লোচনও ভেবেছিল একবার, এত কালের শত্রুকে জব্দ করার এমন খাসা সুযোগ আর আসবে না জীবনে। কিন্তু দুটো দিন বিপদে পড়ে একসাথে থাকার পর সেই থেকে বিদ্বেষ ঘুচে গেছে তাদের, পথে-ঘাটে দেখা হলে দুটো-একটা কথা তারা বলে এসেছে পরস্পরে, কিন্তু শুধু ওই শত্রুতার অবসান ঘটা ছাড়া বেশী আর এগোয়নি-তাদের সম্পর্ক। কেউ পা দেয়নি কারো বাড়ি, ক্রিয়া-কর্মে আপদে-বিপদে কেউ ডাকেনি অন্যকে। এত কাল পরে রাজেন আজ নিজে থেকে এসেছে তার বাড়ি। ওকে দুটান তামাক না টানতে দিতে পারলে কেমন লাগে মানুষের ?

তিনটে বিড়ি নিয়ে আসে রসিক। তাই একটা রাজেনকে দেয় লোচন, পিদিম থেকে ধরাতে গিয়ে নিবে যায় শিখাটুকু। ফের হাঙ্গামা করতে হয় আগুন সৃষ্টি করার। দু-এক টান টেনে বিড়িটা রাজেন বাড়িয়ে দেয় তোরাব আলিকে।

লোচনের তামাকের অভাব টের পেয়েই কৈলাস ইসারা করেছিল লক্ষ্মীকে। খানিক পরে কাঠের আখাব জলন্ত কয়লা দিয়ে সাজানো কলকেয় ফুঁ দিতে দিতে গাঁদা ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে শ্বশুরের মান রক্ষা করে।

আনমনা ছিল তোরাব। এনতার তাকে ডেকে বলে, বিড়ি ধর মিয়া।

এ বড় আশ্চর্য কথা যে এতগুলি মানুষ তারা বসে আছে প্রায় চুপ-চাপ ! কথার কামাই নেই বটে কিন্তু এক সাথে কথা বলছে না এক জনের বেশী, কথার আওয়াজে মোটে সরগরম নয় চোদ্দ জন চাষীর আসর। কাটা-কাটা ছাড়া-ছাড়া সাধারণ চলতি আলাপ এটা-ওটা নিয়ে, তাই মন দিয়ে শুনছে সকলে যে যখন মুখ খুলছে। বিশেষ কিছু একটা শুনবার জন্য যেন প্রত্যাশা সকলের, আবার কথা উঠছে না বলে আগ্রহ চেপে যেন অপেক্ষাও করে আছে

সকলেই। সবার মনের কথা কে আগে তুলবে, কি ভাবে তুলবে তাও জানা নেই কারো। বেশী উৎসুক এনতার, কেবলি উসখুস করছে আর বুড়ো আঙুলের নখ দিয়ে চুলকিয়ে চলেছে ঘন রুক্ষ দাড়ি-ঢাকা চিবুক।

খাবি না মোহন? এসে শুধিয়ে যায় ঘনরামের পিসী সুখতারা।

শ্বশুরের মামলায় যাচ্ছে গায়ের গয়না, সোনার ক'টার পর পায়ের রুপোর মল পর্যন্ত, কোলের ছেলেটা মরে গেল বিনা চিকিৎসায়। শ্বশুর আর স্বামীর অবহেলায়। দয়া তাই নিজের ন বছরের বড় ছেলে মোহনের দিকে ফিরেও তাকায় না। মরে তো ওটাও মরুক, দায় চুকে যাক দয়ার।

খা গা যা মোহন।

খাবানে পরে।

একটা লণ্ঠন চলে যায় বড়তলার সড়ক দিয়ে; ঝকঝকে নতুন লণ্ঠন, সযত্নে কাটা পলতের উজ্জ্বল তেজী শিখা। কনেস্টবল শশী পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে দারোগা মৃণালবাবুকে। হঠাৎ তীক্ষ্ণ আর্ত কেঁউ কেঁউ চীৎকারে বাতাস চিরতে চিরতে পথ ছেড়ে ছুটে পালায় রসিকের বাড়ির কুকুরটা। কে জানে দারোগা বাবুর চলার রাস্তায় পুঁটি কি খুঁজছিল বাড়ির চলার কোণে এক গণ্ডা বাচ্চা ফেলে রেখে!

ও হ্যাঁ, ঠিক কথা, কাল মৃণালের মেয়ের বিয়ে কলকাতায়। লোকজন গাড়িটাড়ি সব গিয়েছে রামপুরে। একজন কনেস্টবলকে নিয়ে হেঁটে তাই তাকে স্টেশনে যেতে হচ্ছে ট্রেন ধরতে।

লুকিয়ে যাচ্ছে, ছুটি চুরি করে! রামপুরে অমন হাঙ্গামা, মেয়ের বিয়ে বলেই কি তার ছুটি জোটে?

কৈলাসের ব্যাখ্যা সবাই মেনে নেয়। পুলিসের দারোগার আবার যে সামাজিক-ভাবে মেয়েটেয়ের বিয়েও হয় এটা তারা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল!

বলি কি—রাজেন দাস হাই তুলে বলে, উপায় একটা না হলে তো নয়। সব দিকে মরার যোগাড়।

অ্যাদ্দিনে জানলে সেটা? তিনু বলে খোঁচা দিয়ে।

আঃ হাঃ! বড়ই বিরক্ত হয় তোরাব, ছেঁদো কথা কথা রাখো না এখন, ঘরে গিয়ে চাটনি খেয়ো।

গাঁদা তামাক সেজে দিয়ে গেছে। কল্কিটা হুঁকোয় বসিয়ে বাড়িয়ে দিলেও রাজেন দাস নেয় নি। ঘনরাম তাই চট করে পেঁপে গাছের একটা ডাল কেটে নল বানিয়ে দিয়েছে রাজেনকে। হুঁকোয় নল লাগিয়ে তার পর এমনভাবে তামাক টানছে রাজেন যেন সে-ছাড়া ঘরে আর কেউ তামাকের ধোঁয়া টানতে শেখেনি, সে ছাড়া আর সবাই নাবালক।

হঠাৎ সে হুঁকোটা লোচনকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে,—বলি কি, একটা উপায় চাই। এত বড় নিরুপায় জন্মে হইনি কোন কালে। অজম্মা এল তো বুঝি না তো এও বুঝি শালা মন্বন্তর ঘটেছে, ও-সব যা করেন তা ভগমান করেন, তেনার নীলা-খেলা আর মোদের অদেষ্ট। কিন্তু ই কি রে বাবা, অজম্মা না, দুর্ভিক্ষ না, খাসা ফলন, তবু হাঁড়ি চড়বে না, ছেলে-পিলে ক্ষিদেয় কাঁদবে?

শুধু কাঁদে না কি?—তিনু বলে, মরে না?

শ্রীনাথ বলে, বিন্দাবনের বড় ছেলেটা মরেছে, ছোটটা মরবে। ওই যে মণি বাবু, জ্ঞানবাবুর ভাগ্নে, তেনা ছুটে শুধোতে এল—

আঃ হাঃ! কাজের কথা কন!—বিরক্ত হয়ে তোরাব বলে।

কিন্তু এবার তার বিরক্তি ও আপত্তি খণ্ডন করে রাজেন বলে, না না, শুনি ব্যাপার।

শ্রীনাথ থেমে হুঁকো টেনে নিয়ে টান দিচ্ছিল, ধোঁয়া ছাড়ার সঙ্গে কেশে খানিকটা কথা তুলে থামেনি, বলে চলে, কলকাতার কাগজে লিখবে কিনা না খেয়ে মরেছে, তাই শুধোতে এল জ্ঞানবাবুর ভাগনে মোদের ওই মণিবাবু। তা ইদিকে মিণালবাবু শাসিয়ে গেছে, উপোসে মরছে তা বলতে পাবে না, বলবে যদি তো মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেবে, কয়েদ করবে। বিন্দাবন কি করে, মণি বাবুকে বলল, না বাবু, না খেয়ে মরেনি ছেলে, ব্যারামে মরেছে। মণিবাবু শুধোল, তা ব্যারামটা কি হয়েছিল? তা কি বুঝি বাবু চাষাভুষো মানুষ? কি জানি কি পেটের ব্যারাম। মণিবাবু ধমক দিয়ে বললেন, তোমার ভয় নেই

বিন্দাবন, যে বেথা আছে তোমার ছেলের মিত্যুর শোধ নেবে। ঠিক করে বল, ছেলে তোমার মরল কেন? জাত হারাও কেন বিন্দাবন? বেঁচে কি থাকবে চিরকাল? কালে কালে মরবে না তুমি? বাচ্চাটাকে কারা মেরেছে বলতে তোমায় এত ভয়? তবু? তবু বিন্দাবনটা বলে কি, না, ব্যারামে মরেছে ছেলেটা বাবু। না খেয়ে মরেনি।

গলা-খাঁকারি দিয়ে থুতু ফেলে শ্রীনাথ বলার শেষে।

তারই কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে রাখাল বলে আস্তে আস্তে, মণিবাবু এক পসারি চাল দিল বিন্দাবনকে। আর দুটো কমলা দিল বিন্দাবনকে ছেলেটার তরে। বলল কিঁ, লেবু এট্টু এট্টু রস করে ছেলেটাকে দিও বিন্দাবন। থানায় দশটা রাত পিটেছে, তখন মণিবাবু এমনি করে চাল দিয়ে কমলা দিয়ে এমনি করে বলতে বিন্দাবন কেঁদে ভাসিয়ে দিলে। স্বীকার করলে যে না বাবু, ছেলেটা ব্যারামে মরেনি, না খেয়ে মরেছে। কলকাতার কাগজে বেরুবে খবর।

এতগুলি চাষাড়ে মানুষ বাক্যহীন হয়ে থাকে। বুক জ্বলে যায় কৈলাসের, সে ভুলে যায় সোজা কথাটা যে বিপদের মানে চাষীরা যদি বোঝে, সে বিপদ তারা হৈ চৈ করে ঠেকায়—বাঘ-কুমীর ঠেকানোর মত। কিন্তু মানেই বুঝছে না তারা এই চিরকেলে সহজ সরল ব্যাপারটার যে কোন রকমে খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখা যায় না একটা বাচ্চাকে। এ যে দুর্বোধ্য বিপদ—খেতে পেলে মাই দিয়েই বাচ্চাটাকে দুবছর সে কি বাঁচিয়ে রাখতে পারতো না? মাই শুকিয়ে গেলে সে করবে কি?

বলি কি, রাজেন বলে খানিকক্ষণ নিজে আর অন্য সকলে চুপ করে থাকার পর, কি করা যায়। আর তো সয় না। মোদের প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে না কি শালার ব্যাটা ধরণী শালা? ই কি রে বাবা, গাঁ পিতিবেশী চাইলে মানুষ ধান দেয় যে হাঁ আজ বাদে কাল ফিরিয়ে দেবে। মোরা তোর গাঁয়ের মানুষ, একটা মাসের তরে দুমুঠো ধান দিবি, কর্জ দিবি, তাতেও তোর দেড়ভাগি চাই? বলি, মাগ যে তোর বছর-বিয়ানী, দু-তিন মাস ছুঁতে পাস

না কি বছর, তা ভাত-কাপড় কি বন্ধ রাখিস মাগের ? না কুত্তা জেলেনীর পিছে যা খরচ করিস তার সুদ কষিস ?

খিলখিল করে হেসে উঠে অপ্রস্তুত হয়ে থমকে যায় অল্পবয়সী কিশোর মোহন। ভূষণ মুখ ভার করে তাকায়। যেন এই এক সলতে পিদিমের মৃদু আলোয় কেউ তার মুখের ভাব দেখতে পাবে। অন্যেরা বিরক্ত হয় না, তবে বুঝেও উঠতে পারে না রাজেনের কথায় এমন কি রসিকতা আছে। রাজেন স্পষ্ট করে জমাট করে প্রকাশ করেছে সবার মনের এলোমেলো অশান্ত খেদ। এ তো সত্যি কথাই যে ধরণী যেন লাটবেলাট জগদীশের পরেই রাজা-বাদশা, ঘরের বৌ পরের মেয়েছেলেকে খুশিমত ভোগ করবে, টাকা নাড়াচাড়া করবে যেন পয়সা হাতের ময়লা মাত্র, নতুন ফসল ওঠার আগেও ধান ভরা থাকবে পাঁচটা খামারের দুটোতে আর হেথা-হোথা ছড়ানো মরাইয়ে—নিজের একটি পরিবারকে সে যে এখন ছোঁবে সে সামর্থ্য কই, ছোঁয়াছুঁয়ি সইবার শক্তি কই সে বেচারার, গর্ভবতী বৌগুলির কথা তো আলাদাই, তারা বাঁচে কিনা নিত্য এ ভয় ভরা মাস হবার আগেই। টাকা আর ধান শুধু তাদের ঋণের খত। ফসল ফলানো নিছক ধরণী জগদীশের জন্যই—ওরা খাবলে নেবে বলে। জমি যার আছে দুবিঘে তার, এক মুঠো মাটিতেও যার স্বত্ব নেই তারও। ঠিক কথাই তো বলেছে রাজেন।

খাবা না ? ফের এসে শুধিয়ে যায় পিসীর বিধবা মেয়ে হারানি। পিসী নিজে না এসে এবার মেয়েকে পাঠিয়েছে।

দুত্তোর নিকুচি করেছে তোর খাওয়ার, রেগে তেড়ে-মেড়ে ওঠে মোহন, দিবি তো দুধ-পোয়া মাপে আলুনি ফ্যান-ভাত, ডাকের কামাই নেই, লুচি-পোলাউ ভোজ খেতে ডাকছে যেন হারামজাদি।

ফোঁস করে কেঁদে ওঠে হারানি কলের দড়ি-টানা বাঁশির মত, যুবতী মেয়ের মনটা যেন চড় খেয়ে কেঁদে-ওঠা শিশুই আছে এখনো, আর নাক দিয়েও তার সিকনি নামে সেই ছেলেবেলার মত, নাক টেনে টেনেও সামলাতে পারে না। মরণ ঠেকাবার উপায় খোঁজার খাতিরে জড়ো এই চাষীর আসরে যেন ছেঁড়া

তালি-দেওয়া জীর্ণ কাপাসে আধ-ঢাকা মূর্তিমতী বিঘ্ন। পুরাণে নজির আছে, পিনাক সামন্ত ভাবে খুশি হয়ে, অর্জুনের তপস্যা ভাঙতে এমনি ভাবে এসেছিল উর্বশী—মেয়েগুলো মরে না, এই যুবতী মেয়েগুলো ?

কেন গাল দিলি ? আমি ডেকেছি তোকে ? মা বলল না ডাকতে ? নিজে যদি এসে ডেকে থাকি তো—নাকের জল চোখের জল খেতে খেতে কথা বলতে গিয়ে বিষম লাগে হারানির। আচমকা অন্দরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে ঠাস করে গালে তার একটা চড় বসিয়ে দয়া তাকে ভেতরে টেনে নিয়ে যায়। ভিতরে যাওয়া মাত্র পিসীও বোধহয় গুম গুম করে কয়েকটা কিল বসিয়ে দেয় মেয়ের পিঠে।

এরা তুদিনের অতিথি। সদরে মামলা করতে গিয়ে লোচন সঙ্গে এনেছে। তামাক কেনার নগদ পয়সা নেই, তবু এনেছে। সঙ্গে আসার জন্য জিদ ধরেছিল মোহন। তা সে এলে পিসীকেও আসতে হয়, মা-মরা ছেলেটা ভিন্ন পিসীর কাছে জগৎসংসারে সব কিছু মিছে—ওই হারানি ছাড়া। পিসীর কি সোজা জ্বালা ? একদিনের জন্য চোখের আড়াল করতে পারে না বোকা-হারা মেয়েটাকে। বোকা নোংরা, নাকে সর্বদা সিকনি ঝরছে। কিন্তু বয়সকালের দেহটা হয়েছে যেন মুনিঋষির পদস্খলন ঘটবার মত। এ মেয়ে হাবা হয়ে যে কি বিপদ ঘটেছে পিসীর।

পুলিন জিজ্ঞাসা করে, মোহনের বাপ কি করে হে সদরে ?

মধু কুলি খাটে একটা জুতার কারখানায়। লোচন নির্বিবাদে বলে, দোকান আছে।

কিসের তুকান ?

লোচন চুপ করে থাকে।

ফকির বলে, শুনি তো কত কাল মধু না কি তুকান করে, তা তুকানটা কিসের ?

কি জানি কিসের তুকান। এবার রেগে বলে ভূষণ।

আঃ হাঃ, তোরাব বলে জোর দিয়ে, তুকানের কথা যাক। ধরণীর তুটো

খামারের ধানের কথা বলাবলি, উয়ার মধ্যি ঢুকান! কি ঢুকান, কিসের ঢুকান! কাজের কথা কও। সাতনলার খামারে লোকজন বেশী রয় না।

শুনে সবাই আবার ধাতস্থ হয়ে গুম খায়। কৈলাস গোড়া থেকেই একটু চুপচাপ আছে। এদের ধাত সে ভালরকম জানে। বিষয় যত গুরুতর, আলোচনা করতে বসে এরা যেন তত বেশী ধীরস্থির হয়ে যায়—এলোমেলো সাধারণ কথা বলে। এদেরই একজন আবার তোরাবের মত অসহিষ্ণু হয়ে আসল কথা তোলে—সকলে ধাতস্থ হয়। তোরাবের বদলে সে যদি কাজের কথা টেনে আনত, সকলে বোধ করত অস্বস্তি। কারণ, সে এদের সকলকে ডেকে এখানে জমা করেছে বুদ্ধি পরামর্শ দেবার জন্য।

সে বেশী গরজ দেখালে এরা ভড়কে যাবে। ধরণীর একটা খামার আছে সাতনলায়। ধানবোঝাই খামার। তা সে খামার তো আগেও ছিল, এখনো আছে, কি তাতে? সবাই জানে আজ এই মরিয়া বেপরোয়া মানুষগুলির আসরে ধরণীর ওই ধান-বোঝাই খামারের কথা ওঠারমানে কি,খামারেলোকজন বেশী থাকে না এ কথা বলারও মানে কি। তবে কি না, জানা কথা শোনা কথাও সবার মিলেমিশে এক সাথে এক ভাবে জানা শোনা তো দরকার!

তা বটে, রাজেন বলে, উয়ার মরাই-ভরা ধান, মোদের দুর্দশা।

ধানে উয়ার স্বত্ব কি?

লুঠের ধান না?

আসলে মোদেরি ধান তো, না কি বল?

গায়ের জোরে কেড়ে নেছে বই তো না?

এ তো একই কথা, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলা। এত দূর এগিয়েও পরের কথাটা জিবের ডগায় এসে আটকে আছে অনেকের। ধীর, অতি ধীর জীবন এদের—অকালে বুড়িয়ে ঝরে যায়, তবু ধীর। ঘুম ভাঙ্গে, হাই তোলে, আড়মোড়া ভাঙ্গে, সন্দেহ করে যে সত্যি রাত শেষ না চাঁদের আলোর আভা বাইরে—না, ভোরই হচ্ছে, কাকের ডাক শোনা যায়। মাঠে গিয়ে লাঙলের ফলা মাটিতে ডাবায়, ফসলের আশা তার কাল নয়, পরশু নয়, মাসকাবারে নয়, সেই ফসল ফলাবার

পর। তাই সে আশায় ধৈর্য ছাড়া তার কি চলে, ধীর না হয়ে উপায় আছে ?

এবার কৈলাস বলে, লুঠের ধান কি বলছ ? লুঠ করা তো বে-আইনী কাজ। রাজার আইনে ঘাড় ভেঙ্গে কেড়ে নেয়া ধান বল।

তখন পিনাক বলে, ধান যদি মোদের, কেড়ে নিতে, লুঠে নিতে পারি না মোরা ? না, ওটা ধরণীদের একচেটে ?

বলি কি—রাজেন বলে—কথাটা বিবেচনা করি এসো মোরা। লুঠে আনতে চাও যদি তো চল যাই আজ রাতেই হানা দি সাতনলার খামারে। তবে কি না হাঙ্গামা হবে তা বলে রাখি, বিষম হাঙ্গামা হবে। তখন দুষো না মোকে।

সে-ই যেন এতক্ষণ ধরণীর সাতনলার ধানের খামার লুঠ করার প্ররোচনা দিচ্ছিল সকলকে, পরামর্শটা গ্রাহ্য হওয়ায় সাফাই গেয়ে রাখছে যে হাঙ্গামা হলে তাকে দোষী করা চলবে না, আগে থেকে সে দিয়ে রাখছে হুঁশিয়ারি। সে নিজে লুঠ করতে যাবে না, হাঙ্গামায় মাথা গলাবে না, তার শুধু পরামর্শ দেওয়ার অধিকার। জীবনের সঙ্গে ঘরে কাটা চরকার সুতোয় মদন তাঁতিকে দিয়ে বোনানো খদ্দরের কাপড় আর কামিজ গায়ে সতের দিন হাজত খেটেছিল রাজেন। বিয়াল্লিশে ঘোষণা করেছিল, গান্ধিজী স্বপ্নে দর্শন দিয়ে তাকে আদেশ দিয়েছেন যে স্বরাজ এসে গিয়েছে, এবার থানা পোড়াও, পুলিস মার।

তোরাব খুশি হয়ে বলে, হাঙ্গামার কমতি কোথা ? হাঙ্গামা ছাড়া কদিন কাটে ? ঘর তো করি হাঙ্গামা নিয়ে। রামপুরে মোর চাচা থাকে, এ গোস্তাকির মাপ নেই, পরশু রোজ তাই হানা দেয়নি মোর ঘরে ? হাঙ্গামার কথা বোলো না দাদা, ওটা খোদার নজরানা।

তোরাবের বৌ একটা মরা ছেলে প্রসব করেছে পরশু। নিজে বাঁচবে কিনা জানা নেই।

তিনু বলে, কি আর হবে হাঙ্গামায় ? নয় প্রাণটা যাবে। মরার বড়ো হাঙ্গামা তো নেই ?

কচু করবে মোদের, যা করার করেছে।

যা বলেছ দাদা। ফাটিক দিক মারুক কাটুক বয়ে গেল। মারুক। মরেই আছি।

হাঃ, মরে আছি! কেন বাবা মরে রইবো? খালি খালি মরে রইবো? মারতে জানি না দুঘা দিয়ে?

বলি কি—রাজেন বড় গম্ভীর, গলার আওয়াজ গমগমে,—চলো তবে আজ রাতেই যাই। কথা তবে শুনে রাখো কিন্তু, লুঠবে গিয়ে এক সাথে, তার পর যে যার সে তার দায়িক। ধান নিয়ে চটপট সরে পড়বে। ঘরে রাখবে না ধান।

কোথা রাখব?—এক জন শুধায়।

তাও জানো না?—রাজেন বলে হতাশায় অবজ্ঞায়,—ধান ফেলে রাখবে বন-বাদাড়ে, বাঁশঝাড়ে, জঙ্গলে, ডোবার ধারে। খানিক বরবাদ যাবেই, উপায় কি?

মনে হয়, ধরণীর খামার আজ রাত্রেই লুঠ করা বুঝি সাব্যস্ত করে ফেলেছে তারা। এখন সমস্যা হচ্ছে শুধু এই যে লুঠের ধান কোথায় রাখবে, কি করবে। পিণাক তিনু তোরাব মধু এরা কজন উৎসাহ বোধ করে, অন্য সকলে উসখুস করে অস্বস্তিতে। ধান লুঠের প্রস্তাবটা যে একান্ত অবাস্তব স্তরে রয়েছে এটা অবশ্য অনুভব করে সকলেই।

রাত্রে গোপনে আচমকা হানা দিয়ে লুঠপাট করতে পারে পাঁচসাত জন মরিয়া মানুষ, কটা গাঁয়ের চাষীদের প্রতিনিধি হয়ে কি ধান লুঠ করতে যাওয়া চলে ওভাবে? চাষীরাই তো সায় দেবে না!

রামপুরে দিনের বেলা পাঁচ সাতশো মানুষের চোখের সামনে খামারের ধান বার করে ওজন করে ন্যায্য দরে বিলি করা হয়েছিল। সে আলাদা কথা।

কৈলাসের দিকে চেয়ে লক্ষ্মী বলে, এ কেমনধারা কথাবার্তা? ধরণীর ঠেঁয়ে অপমান হয়ে রাজেন খুড়োর নয় গায়ে জ্বালা ধরেছে—

কৈলাস তাড়াতাড়ি বলে, আহা, জ্বালা যে জন্যই ধরুক না, কথা তো তা নয়। জ্বালা না থাকলে দশজনের সাথে হাতে মেলাতে আসবে কেন? তবে ধান লুঠের কথাটা কোন কাজের কথা নয়।

শুনে সকলে স্তব্ধ হয়ে যায়। স্বস্তি বোধ করে।

কৈলাস বলে, রামপুরের দিকে গেছলাম ওবেলা, শুনে এলাম খুঁটিনাটি। দিনের বেলা পাঁচ সাতশো লোক গিয়ে ধান বার করে বিক্রি করেছে সবার সামনে ওজন করে, টাকা দিয়েছে বড় কর্তার লোকের হাতে। পয়সা যে নগদ দিতে পারে নি খত লিখে দিয়েছে,—ফসল উঠলে ধান দেবে, সুদ দেবে। কোন হাঙ্গামা হয়নি। তবু তাণ্ডব চলছে রামপুরে কদিন ধরে। ধান বার করেছিল শ'দুই মণ, দোষী নির্দোষীর ঘর থেকে ছিনিয়ে ছিনিয়ে চারশো পাঁচশো মণ ধান খামারে তুলেছে। কয়েদ হয়েছে সত্তর আশী জনা। কত জনার হাড় ভেঙ্গেছে মাথা ফেটেছে বুঝতেই পার, বলে আর কাজ কি?

পিনাক বলে, সবাই এক হয়েও রুখতে পারলে না?

কৈলাস হাঁটুতে চাপড় মেরে বলে, ঠিক এই কথাটা বুঝতে হবে মোদের আজ। একটা গাঁ এক হয়ে জমিদারের লোক রুখতে পারে বটে কিন্তু সৈন্য-পুলিস রুখতে পারে? ধরণী বল, বড়কর্তা বল, চোখের সামনে ওদের দেখছ। ওদের কে বসিয়েছে ওখানে, কার জোরে দাঁড়িয়ে আছে, সেটা না দেখলে হয়? দেখতে গেলে সরকার থেকে পৌঁছবে গিয়ে সেই ইংরেজ-মার্কিন কর্তা তক। এমন মোদের স্বাধীন দেশ।

না খেয়ে মরব তবে?

ধরণীর ধান লুঠে তো পেট ভরবে না। হাঙ্গামাই সার। পেট ভরবে না, পিঠে লাঠি মারার সুযোগ দেয়া শুধু। সবাই যাতে সায় দেবে না সে পথে কিছু হবার নয়।

লক্ষ্মী নিজে যতটা পারে উস্কে দিয়েছে প্রদীপের সলতেটা। ভাল ঠাহর না করলেও বুঝতে পারে ভেতরে ঝড় উঠেছে, থমথম করছে কৈলাসের মুখ। লক্ষ্মীর ভেতরেও মোচড় দেয়। কৈলাস কি ভাবছে সে জানে।

কিসে হবে না তা তো বলে দিল। কিসে হবে?—এ প্রশ্নের কি জবাব দেবে!

সবাই এক হলে হয়—এ জবাব শুনেছে সবাই। ওটা আর প্রশ্ন নেই। কিসে সবাই এক হবে, এক হবার উপায়টা কি, এই হল জিজ্ঞাসা।

কৈলাস বলে, একটা জমায়েত করা যাক। মিছিল করে সদরে যাব।

একজন রোগী বিগড়ে যেতে বসায়, নন্দ আটকে গিয়েছিল, সবেমাত্র এসে বসেছে। সে বলে, আমিও তাই ভাবছিলাম।

কৈলাস জানে, শুধু ভুখা মিছিল হবে না। দুমুঠো ধান পেয়ে, একটু ফাঁকির রিলিফ পেয়ে, খিদে মিটবে না তাদের। কিন্তু আর কি করার আছে কৈলাস তো জানে না!

১০

কৈলাসের ভিতরের অস্থিরতা বেড়ে চলেছে টের পাওয়া যায়।

টের পায় অবশ্য বিশেষভাবে শুধু লক্ষ্মী এবং খানিক খানিক দু-চারজন অন্তরঙ্গ মানুষ। ভিতরে একটা গভীর ব্যাকুলতা এসেছে বলেই এমনভাবে ছটফট করে বেড়ানোর মানুষ কৈলাস নয় সে যে সকলেই টের পেয়ে যাবে।

এটুকু সংযম না থাকলে কি আর সামান্য একজন কম্পোজিটর হয়েও এত বড় একটা এলাকার ভদ্রসমাজ থেকে চাষী-কারিগর হাড়ী-বাগ্‌দীর স্তরে সাফ-মাথা নির্ভরযোগ্য কাজের মানুষ হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়া সম্ভব হত!

খাতিরটা তার তথাকথিত নেতা হিসাবে মোটেই নয়। ধাতটাই সে-রকম নয় কৈলাসের। নইলে এ এলাকার মানুষগুলির অংশবিশেষের বেশ জোরদার মার্কামারা নেতা সে অনায়াসেই হতে পারত। ওসব শখ তার নেই।

দশজনের সব ব্যাপারেই সে প্রায় কমবেশী জড়িয়ে থাকে অথচ কোন ব্যাপারেই এগিয়ে গিয়ে দায়িত্ব নিয়ে কর্তালি করার কিছুমাত্র তাগিদ তার আছে মনে হয় না। দশজনের একজন হয়ে সে দশজনের সঙ্গে আছে—এইটেই অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ পায় তার কথাবার্তা চালচলনে। বিনয়ের তার কিছুমাত্র বাড়াবাড়ি আছে মনে হয় না, কিন্তু নিজের মতটা বা কথাটা দশজনকে মানাবার জন্য এতটুকু জিদও কেউ কোনদিন ছাখেনি।

সকলে দরকার মনে করলে সে কথাও বলে, পরামর্শ দেয়, দায়িত্ব নেয়—কিন্তু বেশ বোঝা যায়, গরজটা তার নিজের নয়।

মোটেই এটা নিরহংকার ভাব নয়। তার কথার কতখানি দাম পাঁচজনের কাছে সেটা জেনেও গর্ব পরিহার করার মহাত্মাজনোচিত নম্রতা নয়। ওসব বৈষ্ণবী দীনতার ধার সে ধারে না। অথচ প্রায় নেতার মতই বিশ্বাস ও স্বীকৃতি পেলেও একেবারেই নেতার মত ব্যবহার না করাটা তার পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক হয় এইজন্য যে সহজ ও স্বাভাবিকভাবেই সে দশজনের একজন হয়ে দশজনের সঙ্গে চলতে পারে। নিজেকে জাহির না করা আলাদা জিনিস। সেটা সচেতনভাবে নিজেকে ঠেকিয়ে রাখা, গুটিয়ে রাখা—সংযম বলেই সেটা চেষ্টা করে করতে হয়।

এই বিশেষ সংযমের প্রযোজন কৈলাসের হয় না। অনায়াসে বিনা চেষ্টায় নিজেকে জাহির না করাটাই তার প্রকৃতি।

বখাউল্লা নামে একজন পুরুষ আমিনা নামে একটি নারীকে তালাক দিয়েছিল। তার নিকা হল নাজেরের সঙ্গে।

কৈলাস যে প্রেসে কম্পোজিটারি করে নাজের সেখানে মাইনে-করা দপ্তরী। কলকাতার মুসলমান দপ্তরীদের আস্তানাগুলি প্রায় শূন্য হয়ে গেছে বাংলা ভাগ হবার পর, চাকরি বলেই নাজের টিঁকে আছে। সাধক ত্রিভুবন দত্তের ছেলে কৈলাস ওই নিকা উপলক্ষে নাজেরের বাড়ি ভোজ খেয়ে যেন প্রথম জানতে পারল যে মুসলিম সমাজে তালাক এবং নিকা আছে!

জানা কথা ঘনিষ্ঠভাবে জানল বলেই বোধ হয়। তার আপসোসের ধরনটা বিচলিত করে দিল লক্ষ্মীকে।

কীভাবে মিছিমিছি আমাদের দিনগুলি নষ্ট হচ্ছে বল তো? তুমি রাজী হবে না তাই, নইলে—

তুমি পারবে? ধর্মের সুযোগ নিতে?

কেন পারব না? সব ধর্মই ধর্ম।

লক্ষ্মী হেসে বলে, বেশ। আমি রাজী আছি। ব্যবস্থা করে ফেল।

শহর থেকে আনা দোক্তা দিতে গিয়ে কৈলাস বলে এসেছিল, কথা আছে, শুনে যেও।

শনিবার শহর থেকে ফিরতে কৈলাসের সন্ধ্যা হয়ে যায়। সন্ধ্যার পর দোক্তা দিতে গিয়ে বিশেষ কথা আছে জানিয়ে এলে কাক-ডাকা ভোরে লক্ষ্মী জলার দিকে যায় কথা শুনতে।

সেদিন লক্ষ্মী ভোর পর্যন্ত ধৈর্য ধরতে পারেনি। কৈলাসের অতিরিক্ত শান্ত ভাবটা তাকে ভাবিয়ে তুলেছিল। ঘণ্টাখানেক নিজের মনে টালবাহানা করে সন্ধ্যা রাত্রে নিজেই এসে হাজির হয়েছিল কৈলাসের বাড়ি।

পুরানো লণ্ঠনের আলোয় কৈলাস সংসারের হিসাবপত্র দেখছিল। বাড়তি লণ্ঠনের এই একটি। রান্নাঘরে ডিবরি জ্বলছে। বাড়তি অন্য ঘর দু-খানা অন্ধকার। পাড়াগাঁয়ে অন্ধকার অভ্যাস হয়ে যায় মানুষের, কিন্তু আলোর টান যাবে কোথা? কৈলাসের মা রান্নাঘরে রাঁধছে, বাড়ির বাকি মানুষেরা এসে জমেছে লণ্ঠনের আলোয়।

তাতে অসুবিধা হয়নি। ঘরের বাইরে দাওয়ার একপাশে মুখোমুখি উবু হয়ে তারা কথা কয়। সকলের পছন্দ না হলেও এ অধিকার তাদের স্বীকৃত। নানা আন্দোলনে থাকবে, পরামর্শ না করলে তাদের চলবে কেন? ঘরের চালায় অর্ধেকটা আকাশ আড়াল হয়েছে, কৃষ্ণপক্ষের উজ্জ্বল তারায় ভরে আছে আকাশ। ঝিঁঝিঁ পোকার অবিরাম গুঞ্জনে আরও নিবিড় হয়েছে স্তব্ধতা, রাত্রিচর পশুপাখির চিৎকারে যা ক্রমাগতই ভেঙে যায়।

কৈলাস বলে, ছ্যাখো, আমি ওসব ভেবেছি। লোকের চোখে হীন হয়ে যাব, এ অঞ্চলে আর বাস করা যাবে না। কিন্তু কি আর এমন আসবে যাবে তাতে? আমরা যদি খাঁটি থাকি, লড়াই যদি টিঁকিয়ে রাখি—ফের দশজনের আদর পাব। হেথা যা ভেঙে পড়বে, ফের তা গড়ে তুলব। ধর্ম নিয়ে মোদের কি এল গেল? একটা উপায় যখন আছে, ছাড়ি কেন?

এ তো ঢের পুরানো উপায়। অ্যাদ্দিনে তোমার খেয়াল হল?

উপায়-টুপায়ের কথা তো অ্যাদ্দিন ভাবিনি।

কেন ভাবনি? এখন ভাবছ কেন?

কিছু ভালো লাগছে না। এত সইছে মানুষ, এত রাগ সবার, কিন্তু সব কেমন ছাড়া-ছাড়া এলোমেলো হয়ে থমকে আছে। এ অবস্থায় সব ওলোট-পালোট হয়ে যাওয়া উচিত। সব ভোঁতা মেরে আছে। ব্যাপারটা কি? একটা মানুষ নেই যে বুঝিয়ে দেয়। ভারি খারাপ লাগছে।

তাই বল! আর কিছু হচ্ছে না, তাই মোকে নিকা করবে?

কৈলাস গোসা করে বলে, তোমার কাছে সব কিছু তামাসা। এখন কিছু হচ্ছে না, দু-দিন বাদে হবে তো? সেজন্য নয়। আমরা কেন এভাবে দিন কাটাব?

লক্ষ্মী বলে, আহা, চটছ কেন? বললাম তো আমি রাজী আছি। তুমি নিজেই পারবে না! মা-বোনকে ছাড়বে? ভাইটাকে মানুষ করবে না?

বাবা আছেন। যা পারি টাকা পাঠাব।

ম্লেচ্ছের টাকা কে নেবে? এখন বাপ রোজগার ছোঁয় না, তখন মাও ছোঁবে না। সম্পর্ক আর থাকবে না, একেবারে সবাইকে ছাড়তে হবে জন্মের মত।

ছাড়ব। ভাসিয়ে দিচ্ছি না তো। বাবা মরতে অবিনাশটা যা হোক কিছু করবে। তাছাড়া—

তাছাড়া—?

তদ্দিনে দেশের অবস্থা পাল্টে যাবে। এ দুরবস্থা আর বেশী দিন থাকবে না।

শুনে লক্ষ্মী ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করে, তাই যদি আশা কর তবে খারাপ লাগছে কেন?

কৈলাস সোজাসুজি বলে, তোমার জন্যে। দিনরাত মনটা হু-হু করছে আমার।

লক্ষ্মী একটু ভেবে বলে, বেশ, তবে ব্যবস্থা কর। কিন্তু মোর মন বলছে কি,

সুখ পাবে না। ঘরের লোককে তো ছাড়া নয় শুধু, সারা জেলার লোককে আপন করেছ। জীবনবাবুই বল আর নন্দ ডাক্তারই বল, তোমার কথার দাম বেশী লোকের কাছে। বিষ্টুবাবু বলতেন কি জানো? একটু পড়াশোনা করলে আর বক্তৃতা দিতে শিখলে আমরা কি পাত্তা পেতাম কৈলাসের কাছে? হেসে হেসেই বলতেন। কিন্তু কথাটা সত্যি। এ তল্লাটে আর একটা মানুষ নেই তোমায় ডিঙিয়ে যায়। যে যত বড় বড় কথা বলুক, তুমি কি বলছ শুনে তবে লোকে মতি স্থির করে। আমারি বুকটা অহংকারে ফুলে ওঠে। এত লোকে তোমায় চায়, পালিয়ে গিয়ে আমায় নিয়ে সুখী হতে পারবে ভেবেছ?

ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়লে তো? সব হিসেব করেছি গো, মনটা এমনি ঠিক করিনি। পালাতে যাব কেন আমি? আমি হিন্দু বলে তো দশজনে আমায় চায় না? পাপ তো করব না কিছু? মানুষটা আমি যেমন আছি তেমনি থাকব। আমার খুশি আমি ধর্ম পাল্টাব, যাকে খুশি ঘরে আনব। তাতে বিগড়ে গিয়ে লোকে যদি আমাকে না চায়, আমার কি দোষ?

দশজনের খাতির পেতে হলে—

দশজনের মন জুগিয়ে চলি না আমি।

কৈলাসের এ ভাব লক্ষ্মী কখনো ছাখেনি। সে বুঝতে পারে গভীর একটা আলোড়নের ভিতর দিয়ে বিশেষ একটা অবস্থায় পৌঁছেছে তার মন, নতুন রকম একটা বিদ্রোহ মাথা তুলেছে তার মধ্যে। এতদিনের গড়া জীবন নষ্ট করে দিয়ে নতুন করে অন্যভাবে গড়বার পণ জেগেছে, আর দ্বিধা নেই তার।

লক্ষ্মী ভয় পেয়ে বলে, দশজনকে যদি কেয়ার নাই কর, এত ভজঘটে কাজ কি তবে? সোজাসুজি ঘর বেঁধে একসাথে থাকি এস?

কৈলাস একটা বিড়ি ধরায়। দেশলাইয়ের আলোতে লক্ষ্মী যে কিরকম ব্যাকুলভাবে তার মুখের ভাব দেখছে সেটা তার চোখে পড়ে।

ধীরে ধীরে কৈলাস বলে, তাই কি হয়? মন যুগিয়ে চলি না মানে দশজনের ভয়ে উচিত কাজ করতে ডরাই না। তাই বলে কি ডোণ্ট কেয়ার করব বলছি সমাজকে? অ্যাদ্দিনে তাহলে কোন ওজর শুনতাম না তোমার।

মনের কথাটা বুঝিয়ে বলে কৈলাস। দশজনে যে নিয়মনীতি আইনকানুন মানে একা সে সব ভাঙা অপরাধ, ভালোই হোক আর মন্দই হোক সে সব নিয়মনীতি আইনকানুন। কিন্তু তারা তো দশজনের বিরুদ্ধে যাচ্ছে না। ধর্ম পাল্টাবার অধিকার সমাজ তাদের দিয়েছে, এ কাজকে বে-আইনী বা সমাজ-বিরোধী বলবার জো নেই। লক্ষ্মীর স্বামী না থেকেও আছে, উচিত না হলেও এটাই যখন দশজনে নিয়ম বলে মেনে নিচ্ছে এখন পর্যন্ত, তারাও এ নিয়মটা নিশ্চয় মানবে। এতদিন মেনেও এসেছে। কিন্তু নিজের ইচ্ছায় ধর্ম পাল্টালে লক্ষ্মীর বিয়েটা ভেস্তে যাবে, এটাও সমাজের স্বীকৃত নিয়ম। এ নিয়ম অনুসারে চললে তাদের দোষ হবে কেন? কিছু মানুষ তাদের দোষ দেবে, গালাগালি করবে—তার মধ্যে আজকের আত্মীয়বন্ধুও থাকবে অনেক—কিন্তু তার আর করা কি। যে অধিকার তাদের দেওয়া হয়েছে কিছু মানুষকে অসন্তুষ্ট করার ভয়ে সেটা না খাটানো মানেই ওই মানুষগুলির মন যুগিয়ে চলা। বুঝলে কথাটা?

বু-ঝ-লা-ম।

অমন টেনে বলছ বু-ঝ-লা-ম?

মোর বাবু মেয়েলোকের মন। বুঝেও মন খুঁতখুঁত করলে করব কি বল?

কিন্তু লক্ষ্মী বুক বাঁধে, মনকে শক্ত করে। শুধু ভাতকাপড়ের অভাবে কত জীবন নষ্ট হয়ে যেতে দেখেছে চারিপাশে। আবার দারিদ্র্যের মধ্যে, স্বচ্ছলতার মধ্যে কত জীবন ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে শুধু কতকগুলি নিয়ম কানুন আচার বিচারের জন্য।

এদের পাশাপাশি আবার তাদের কথাও ভাবে লক্ষ্মী, শত দুঃখের মধ্যেও যারা স্বামীপুত্র নিয়ে সুখী হয়ে আছে। কৈলাস একদিন তাকে বলেছিল, অবস্থা পাল্টে না গেলে এদেশে যোল আনা সুখ পাওয়া, জীবনটা সার্থক করা শুধু গরীব কেন, ছোটখাট বড়লোক কেন, কোটিপতিরও সাধ্য নেই। একেবারে ওপর-তলায় মানুষেরও নাকি আজ সব হারাবার আতঙ্কের কণ্টকশয্যা। জীবনটা সার্থক করা সব চেয়ে বেশী সম্ভব হয়েছে জগতে সোভিয়েট আর চীনে।

তবু, যেটুকু সুখ সার্থকতা এদেশে পাওয়া সম্ভব, সে কেন তা থেকে বঞ্চিত হয়ে জীবন কাটাবে? তার কৈশোরটুকু লুটতে লুটতে স্বামী বিগড়ে গিয়েছিল বিক্রির জন্য বাজারে সাজানো নারীর যৌবন আর নেশায়। সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে এসেছে আজ এক যুগেরও বেশী। তবু সেই সম্পর্কের দায় টেনে নগদ সুখ বাতিল করে কেন সে দুঃখী হয়ে থাকবে?

হোক মুনভাত। উপোসী মানুষ সে। একজন মুনভাতের কলাপাতা সামনে ধরে দিয়ে খেতে ডাকলে কেন সে প্রত্যাখ্যান করবে এটা উচিত কি ওটা অনুচিতের চিন্তায়? স্বর্গে গিয়ে সর্বসুখ পাবার ভাঁওতা সে জেনে গিয়েছে অনেক কাল। তার শুধু এখন এই পৃথিবীর জীবনে ভালো-মন্দ উচিত অনুচিতের বিচার।

এ বিচার কৈলাস নিশ্চয় ভালো বোঝে তার চেয়ে? নিজের মেয়েলি ভয়ডর ভাবনাচিন্তার জন্য কেন সে বার বার ঠেকিয়ে চলবে কৈলাসকে, বাতিল করে দেবে তার বিচার ও সিদ্ধান্ত?

লক্ষ্মী তাই জোর দিয়ে বলে, শোন বলি, মোকে অত ঠাণ্ডা ভেব নাক। ভুল করে নয় ভেস্তেই দেব জীবনটা, অত ডরাইনে আমি। মোর ভাবনা যত তোমার জন্যে। তুমি যদি মন ঠিক করে থাকো, আমিও ঠিক করলাম। কি করতে হবে জানিয়ে দিও, বাস্।

উঠে দাঁড়িয়ে আঁচলে বাঁধা পান-দোক্তা মুখে পুরে দিয়ে মোলায়েম মিষ্টি সুরে বলে, সত্যি সত্যি মোকে সঁপে দিলাম আজ থেকে। বিশ্বাস না হয়, থানার ঘড়িতে এগারটা বাজতে শুনে এস। জেগে রইব।

সত্যিই আসব লক্ষ্মী?

খুশি হলে নিশ্চয় আসবে। আমি কি ডরাই নাকি তোমাকে? কপালে বন্দুক ঠুকে ওসব ন্যাকামি চেঁছেপুছে সাফ করে দিয়েছে জান না?

কৈলাস উদ্বেগের সঙ্গে বলে, জ্বরটর হয়নি তো তোমার? তোমার সেই মাথার বেদনাটা বাড়েনি তো?

লক্ষ্মী বলে, বটে? লক্ষ্মীর মন সায় দেয়নি, তোমার খাতিরে রাজী হল, এসব ভেবে দরদ জাগল বুঝি? পিছিয়ে যেতে চাও?

কৈলাস বলে, খালি নিজের কথাই বলে গেলাম। পুরুষ মানুষ, বাপ শাস্তর জানে, নিজে খানিক ইংরেজি শিখেছি। একটু ভালবাসি বলে ধরে নিয়েছি, একেবারে পোষ মানিয়ে ফেলেছি তোমাকে।

লক্ষ্মী একটু হাসে। আবার আঁচল খুলে একটি পান কৈলাসের হাতে দিয়ে বলে, ভাত খেয়ে খেও। জর্দা দিয়ে সাজা—শুভবাবুর বোন এক কৌটা জর্দা উপহার দিয়েছে। আমাকে নিয়ে শুভবাবু আর মায়ার চটাচটির ব্যাপারটা ভালো করে শুনতে এসেছিল। ওরা কি বল তো? নিজেদের মধ্যে এত অবিশ্বাস? মায়ার কাছে শুনেছে, নিজের ভায়ের কাছে শুনেছে,—তবু এসে বলে কি, ওরা নিশ্চয় আসল কথা চেপে গেছে!

মন ঠিক করে ফেলেছে। মনটা কিন্তু নিরুদ্বেগ করতে পারে না লক্ষ্মী। তার কেবলি মনে হয়, হিসাবে মস্ত একটা গলদ রয়ে গেছে তাদের, বিশ্রী একটা ভুল তারা করতে চলেছে, একেবারে সর্বনাশ হয়ে যাবে তাদের। জীবনে আর মাথা তুলতে পারবে না কৈলাস। মানুষটা ধ্বংস হয়ে যাবে।

না, বুদ্ধি ঠিক নেই কৈলাসের। তার আশঙ্কাই সত্য হয়েছে, মন বিগড়ে গেছে কৈলাসের। তার জন্য পাগল হয়েছে কৈলাস? হয়তো হয়েছে—কিন্তু যে কৈলাসকে সে চিরকাল জানে সুস্থ স্বাভাবিক সে মানুষটা পাগল হয়নি। একটা মেয়েমানুষের জন্য, পিরীতের জন্য, নাটুকেপনা করার ধাত কৈলাসের ছিল না কোনদিন।

মাথা বিগড়ে গেছে কৈলাসের।

দুর্ভিক্ষ মহামারী দমন নির্যাতন চরমে উঠেছে, কিন্তু প্রতিরোধ আর লড়াই ছিল বলে মাথা ঠাণ্ডা থেকেছে কৈলাসের। কোন বিপদ বা সমস্যা নিয়ে তাকে কখনো বিচলিত হতে দ্যাখেনি লক্ষ্মী। অথচ আজকের অচল অবস্থাটা অসহ্য

হয়ে উঠেছে তার, তাকে একেবারে কাবু করে দিয়েছে। অবস্থার অবনতি হচ্ছে দিন দিন, সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা চুরমার হয়ে গেছে মানুষের, অথচ সব যেন থমকে থেমে আছে। কেমন একটা দিশেহারা উদাসীন ভাব মানুষের। অথচ, প্রাণের তো অভাব নেই এদিকে। এলোমেলো ছাড়াছাড়া ভাবে অজস্র সাড়া মিলছে প্রাণের!

কৈলাস নিজেই বলেছে এসব। কিন্তু এই অবস্থা যে তাকে অস্থির করে তুলতে তুলতে কিভাবে বিকৃত করে দিয়েছে তার বুদ্ধি বিবেচনা এটা সে ধরতে পারেনি।

বোধ হয় ধরাও যায় না নিজের বিকার।

কিন্তু তাকে নিয়ে এভাবে পালিয়ে গেলে কি উপায় হবে কৈলাসের? এতকাল যাদের সঙ্গে মিলেমিশে যেখানে থেকে দুঃখী মানুষের অবস্থা পাল্টাবার জন্য এতভাবে লড়াই করে এসেছে, আজ সেই সব সাথীদের ছেড়ে সেখান থেকে চলে গেলে কি নিয়ে দিন কাটবে তার? অস্থিরতা আর এই ঝোঁক তার কেটে যাবে—নিজের ফেলে-যাওয়া আসল জীবনটার জন্য তখন যে হাহাকার করতে হবে তাকে?

থানার ঘড়িতে দশটা বাজার পর লক্ষ্মীর খানিকক্ষণ রীতিমত আতঙ্ক জেগেছিল, যেরকম মনের অবস্থা কৈলাসের সত্যই হয়তো সে তার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসে হাজির হবে!

সাড়ে এগারটার ঘণ্টা বাজতে শুনে এ আতঙ্ক তার কেটে যায়। কিন্তু স্বস্তি জোটে না। অন্য আতঙ্কে প্রাণটা ভরাট হয়ে থাকে।

গাঁদা বলে, ছটফট করছ যে?

লক্ষ্মী বলে, গাঁদা, তোর যখন খুব কষ্ট হয় মানুষটার জন্য, মনে হয় না পাগল হয়ে যাবি? তখন তোর পাগল হতে ইচ্ছা হয় না?

গাঁদা বলে, কেন? ছাড়া পেয়ে আসবে তো ছ-মাছ এক বছর বাদে?

আশায় শান্ত হয়েছে গাঁদার মন! কৈলাসও বিশ্বাস করে এরকম খাপছাড়া-ভাবে থেমে থাকবে না সব, খেই ফিরে পাবে মানুষ, সুনির্দিষ্ট আদর্শ

আর উদ্দেশ্য নিয়ে এগোবার জন্য সক্রিয় হবে—কিন্তু আশায় স্বস্তি পায় না কৈলাস!

গাঁদা আর কৈলাসের মানসিক প্রতিক্রিয়ার মধ্যে অবশ্য তুলনা চলে না।

গম্ভীর জ্বালা আর আপসোসের সঙ্গে লক্ষ্মী ভাবে, তার যদি যথেষ্ট বিদ্যাবুদ্ধি থাকত! একটা দেশের মানুষ কেন আর কিসে এরকম অনিয়ম আর বিশৃঙ্খলার স্তরে এসে ঠেকে থাকে কিছুদিনের জন্য, আবার এগিয়ে যায়, এসব বুঝিয়ে দিয়ে সে যদি শান্তি এনে দিতে পারত কৈলাসের মনে!

কৈলাসও রাতটা ছটফট করে কাটায়!

নিজের সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে যে থিয়োরি সে দাঁড় করিয়েছে তার মধ্যে সে কোন ভুল খুঁজে পায় না অথচ তার সহজ বাস্তববোধ তাকে পীড়ন করে। কেবলি মনে হয়, কোথায় যেন একটা মস্ত গলদ থেকে যাচ্ছে!

ধর্ম নিয়ে তার মাথাব্যথা নেই। লোকে তাকে হিন্দু বলেই জানুক আর মুসলমান বলেই জানুক, নিজেকে সে নিছক মানুষ বলেই জানবে। ভালো কথা। কিন্তু সেটা যেন এ ব্যাপারের আসল কথা নয়।

আত্মীয়বন্ধু দেশগাঁ ছেড়ে লক্ষ্মীর সাথে নতুনভাবে জীবন আরম্ভ করলে মানুষের অধিকারের জন্য লড়াই করার সৈনিক হিসাবে তাকে বরখাস্ত হতে হবে না। শুধু তার সংকীর্ণ এলাকাটুকুতে সে লড়াই সীমাবদ্ধ নয়। কিন্তু এই বিশেষ ব্যাপারে সেটাও যেন আসল কথা নয়!

হলে এরকম আতঙ্ক জাগবে কেন? কেন অনুভব করবে যে কাজটা ঠিক হবে না, নিজেকেও সে ফাঁকি দেবে মানুষকেও ফাঁকি দেবে? এমন একটা মারাত্মক ভুল করে বসবে যার সংশোধন নেই?

একি শুধু সংস্কার? যাই সে ভাবুক নিজের সম্পর্কে, তার মধ্যে গোঁড়ামি রয়ে গেছে?

সকালে আবার যখন দেখা হয় দুজনের, পরস্পরের মুখে রাত-জাগা ক্লিষ্টতার ছাপ যেন অপমানের মত মনে হয় পরস্পরের।

জোর করে মুখে হাসি এনে কৈলাস বলে, সেই কথাই ঠিক রইল তো ?

লক্ষ্মীও হাসবার চেষ্টা করে বলে, নিশ্চয় !

কৈলাস বলে, রাতে তাই আর গেলাম না। আর কটা দিনের তো ব্যাপার।

১১

শুভ জীবনকে নবশিল্প মন্দিরে কাজ দিয়েছে।

জীবন এখন বারতলাতেই সপরিবারে বাস করে। মানুষটার মধ্যে একটা পরিবর্তন ঘটে গেছে যেন রাতারাতি। কংগ্রেসী কর্তাদের বিরুদ্ধে তার জন্মেছিল দারুণ বিক্ষোভ, তারা তার জন্য কিছু না করে থাকলেও শুভর কারখানায় চাকরি পেয়েই তার যেন সমস্ত ক্ষোভ উপে গেছে।

শান্ত প্রসন্ন হয়ে উঠেছে মানুষটা।

সেই সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা জন্মেছে ত্রিভুবন দত্তের সঙ্গে এবং গলায় তার উঠেছে একটি স্ফটিকের মালা।

কপালে ও বাহুতে আজকাল রক্তচন্দনের তিনটি রেখাও দেখা যায়। তবে খুবই অস্পষ্ট দাগ—সংকোচটা ঠিক যেন কাটিয়ে উঠতে পারছে না।

রাজনীতিতে ধর্মগত গোঁড়ামি আমদানি করার তীব্র বিরোধিতা করে এসেছে আজীবন। বোধ হয় সেইজন্যই সংকোচ।

নিজে থেকে এর কাছে ওর কাছে কৈফিয়তও বোধ হয় সেই জন্যই দেয় যে. বয়স হল, এখন একটু পরকালের চিন্তা তো দরকার ?

গোঁড়ামির ধার ধারি না। মুক্তি-টুক্তিও চাই না। মনটা একটু শান্ত রাখা, এই আর কি ! মরার পরে ওতেই আত্মার শান্তি হবে।

এলোমেলো যেটুকু আন্দোলন এদিক ওদিক হচ্ছিল, জীবন তাতে যোগ দিত, সভায় যেত। আজকাল নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে। ডেকেও তাকে পাওয়া যায় না।

কৈলাস একটু ভড়কে যায়। জীবনের অশান্তির কারণ সে জেনে রেখেছিল অভাব এবং সারা জীবন যে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করে এসেছে সেটা পাওয়া গেছে জানার পর ভুল ভাঙার প্রতিক্রিয়া। শুভ নিদারুণ অনটন থেকে মোটামুটি রেহাই দিতেই সব অশান্তি কেটে গেল! আজ শুধু তার দরকার আধ্যাত্মিক শান্তি!

মত ও বিশ্বাস যাই হোক, কিছুটা ভেজালও থাক, মোটামুটি মানুষটার দেশপ্রেমের আন্তরিকতায় কৈলাশের সন্দেহ ছিল না। ধর্মকর্ম ও পরকালের চিন্তা করা প্রয়োজন মনে হয়েছে, তার মানে বোঝা যায়। তাতে কারো আপত্তি করার কিছু নেই। কিন্তু দেশের এই ভয়ানক দুর্দিন তার মধ্যে যে ক্ষোভ জাগিয়ে রাখবে সেটা মিটে গেল কি করে?

দেশের জন্য তার দরদ কি সবটাই ছিল ফাঁকি? কিন্তু তার দীর্ঘকালের দেশসেবার আন্তরিকতায় আজও তো অবিশ্বাস করতে মন চায় না!

কৈলাস তাকে প্রশ্ন করে, সব ছেড়ে দিলেন যে? শনিবার অতবড় সভা হল, যাবেন বলে গেলেন না?

জীবন অত্যন্ত বিব্রত বোধ করছে বোঝা যায়। বয়সের দোহাই দিয়ে সে বলবার চেষ্টা করে, বুড়ো হয়ে পড়লাম—

কৈলাস বলে, এটা কাজের কথা নয় জীবনবাবু। আপনাকে আমি ভালো করে জানি। বয়স হয়েছে বলে আপনি কি দেশকে ছাড়তে পারেন?

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে জীবন বলে, কি জান বাবা, আসলে একটা মুশকিলে পড়েছি। শুভও আছে তোমাদের সঙ্গে, আমায় চাকরি দিয়েছে। সভায় গেলে কংগ্রেসের নিন্দা না করে উপায় নেই। তাতে আপত্তি ছিল না, চাকরিটার জন্য হয়েছে বিপদ। সারা জীবন কংগ্রেসের গুণ গেয়েছি, আজ শুভর কাছে চাকরি নিয়ে উলটো সুর গাইলে লোকে কি বলবে বল?

এইজন্ম ?

কি করি ? নইলে প্রাণটা কি ব্যাকুল হয় না ? চাকরিটা নিয়ে হয়েছে সংকট। ও পক্ষের লোকেরা ভাববে, নিজেকে তোমাদের কাছে বেচে দিয়েছি। যাদের পক্ষ নিয়ে বলতে যাব, তারাও কি খেলো ভাববে না আমাকে ? এ কথা মনে আসবেই যে লোকটা কি সুবিধাবাদী—একটা চাকরির জন্ম ডিগবাজি খেয়ে আমাদের দিকে ভিড়েছে !

ক্লিষ্ট বিষণ্ণ দৃষ্টি জীবনের। বোঝা যায়, ত্রিভুবনের কাছে কালী-সাধনায় শান্তি খুঁজতে গেলেও প্রাণটা তার অশান্তিতে ভরে আছে।

তার শান্ত প্রসন্ন ভাবটা শুধু বাইরের।

কৈলাস যেন নতুন আলোকের সন্ধান পায়।

এ কথার সবটা হয়তো সত্য নয় যে নিছক আদর্শের খাতিরে কংগ্রেসের ভুল সংশোধন করা কর্তব্য মনে করে জীবন নতুন পথ বেছে নিয়েছে। সারা জীবনের ত্যাগ ও দেশসেবার পুরস্কার বাগিয়ে নেবার সুযোগ এলে সে কিছুই করতে পারেনি, মানুষটা সে ধাঁচের নয়। তাই বলে সে কি আর আশা করেনি কিছুই ? তার ধারণা ছিল, দীর্ঘকালের ত্যাগস্বীকার জেলখাটার পুরস্কার স্বাভাবিক নিয়মে এবার আপনা থেকেই তার জুটে যাবে !

জুটে যদি যেত পুরস্কার তবে হয়তো সাধারণ মানুষ আর পাত্তা পেত না তার কাছে। দেশের অবস্থা দেখে হয়তো কান্না পেত জীবনের, মনে মনে সে কামনা করত প্রতিকার হোক—কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে সে আর ভিড়ত না।

লোকে কি বলবে ভেবে আজ যেমন ছুটি নিয়েছে, এমনি ভাবে গা বাঁচিয়ে ডুব দিয়ে রেহাই খুঁজে নিত।

আবার দেশের মানুষের জন্ম প্রাণটা তার কাঁদলেও একেবারে কোন আশা না নিয়েই কি আর সে তাদের পক্ষে ভিড়ে পড়েছিল ! শুভরা এ পক্ষে না থাকলে হয়তো সে মন স্থির করে উঠতেই পারত না।

তবে মঙ্গল সে চায় বৈ কি দেশের লোকের। এ চাওয়ার মধ্যে ভেজাল

নেই। অন্য অনেক কিছু চাওয়ার মত এ চাওয়াটাকেও তাকে খানিকটা নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। নইলে উপায় কি?

প্রকাশ্যভাবে শুভর কাছে চাকরি করতে না হলে, অন্যভাবে তার প্রাণান্তকর অভাব ঘুচাবার ব্যবস্থা হলে নিজেকে সে গুটিয়ে নিত না, সভায় দাঁড়িয়ে জোর গলায় ঘোষণা করত সাধারণ মানুষকে ভালবাসে বলেই কেন সে তার মত ও পথ পালটে দিয়েছে বুড়ো বয়সে।

নন্দ সায় দেয়। তা বৈ কি।

শুভও সায় দেয়। কিন্তু মুখ গোমড়া করে বলে, দু-চারমাস দেখব, তারপর খেদিয়ে দেব। স্ফটিকের মালা ঝুলিয়ে কৈলাসের বাবার শিষ্য হবার জন্য আমি যেন ওকে দুশো টাকা মাইনে দিয়ে রেখেছি। ও কাজের জন্য যাট-সত্তর টাকার লোক পেতাম।

কৈলাস আর নন্দ মুখ চাওয়া চাওয়ি করে।

নতুন আলোটা আরও স্বচ্ছ হয় কৈলাসের কাছে। বাস্তবের যে হিসাব কষেছে জীবন সেটা তার মনগড়া নয়। শুভ তার অতীত জীবনকে খাতির করে তাকে চাকরি দেয়নি, তার অনুষ্ঠিত কংগ্রেস-বিরোধী সভায় সে তার স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করবে—তার মতকে সমর্থন করে বক্তৃতা করবে—শুভও এই প্রতিদান আশা করছে জীবনের কাছে!

শ-তিনেক উদ্বাস্তু সেদিন ট্রেন থেকে বারতলা স্টেশনে নেমে স্টেশন আর শুভর কারখানার আনাচে কানাচে মাথা গুঁজেছে খবর পেয়ে কৈলাস কোথায় ছুটে যাবে স্টেশনে, তার বদলে সে গজেনের বাড়ি গিয়ে রান্নাঘরের চালায় সরু দাওয়ায় পিঁড়ে টেনে নিয়ে জমিয়ে বসে আবদার জানায়, এক কাপ চা খাওয়াবে লক্ষ্মী?

গাঁদা বলে, লক্ষ্মীদি তরকারি কুটছে। আমি চা করে খাওয়াই?

হাঁ হাঁ। তোর চা তো চিনি ছাড়াই মিষ্টি হয়!

তরকারি কোটার সরঞ্জাম নিয়ে বাইরে রোয়াকে তার সামনে এসে বসে লক্ষ্মী গভীর উদ্বেগের সঙ্গে বলে, আবার কি হল ?

মোদের মতলবটা ফেঁসে গেল।

আস্তে কথা কও। কেন ?

নিজের সুবিধার জন্য ধর্ম পালটানো যায় না। ধর্মটাও দশজনের জিনিস।

লক্ষ্মী মুখ তোলে না, বঁটির ফলাটার দিকে তাকিয়ে থেকেই সে বলে, তা হবে না, আমি মন ঠিক করে ফেলেছি।

কৈলাস মাথা নাড়ে, সে হয় না। হিসেবে মস্ত ফাঁকি রয়ে গেছে। আমি চালাক বাবুদের মত হিসেব কষে বসেছি। থিয়োরিটা খাড়া করেছি ভিন্ন করে, অবস্থাটা যাচাই করেছি ভিন্ন করে, দুটো মেলাইনি। মেলাতে গিয়ে দেখছি, বাবা, এ যে বিষম ফাঁদ। ধর্ম শিকড় গেড়ে জাঁকিয়ে রয়েছে দেশে, তুমি আমি বললেই তো বাতিল হবে না। ধর্ম পালটালে নতুন ধর্মকে তুলে ধরতে হবে, গুণগান করতে হবে। মোরা সত্যি সত্যি নিজেদের সুবিধার জন্য ধর্ম পালটাব, লোকে যাতে সেটা না ভাবে সেজন্য আরও বেশী করে গলা চড়িয়ে গুণগান করতে হবে। নইলে খেলো হয়ে যাব লোকের কাছে। ধর্মটর্ম যদি নাই মানি মোরা, ধর্মকে কাজে লাগাতে যাব কোন মুখে ? লোকে ছি ছি করবেই।

ধারালো বঁটিতে ভাড়ালি কুটে যায় লক্ষ্মী।

কৈলাস বলে, জীবনবাবুর মতই দশা হবে মোর। শুভর চাকরিটা নিয়ে বেচারাকে মুখ বন্ধ করতে হয়েছে। ধর্ম পালটে তোমায় পেলে মোকে হতে হবে সাম্প্রদায়িক। না হলে, লোকে জানবে, এ মানুষটা শস্তা সুবিধাবাদী।

লক্ষ্মী বলে, তবে থাক।

লক্ষ্মী একদিকে পরম স্বস্তি বোধ করে, আবার প্রাণটা তার জ্বলেও যায় কৈলাসের আচরণে। কৈলাস নিজেই বুঝেছে যে, যেভাবেই হোক নিজের সুখটা বাগিয়ে নেবার উপায় তার নেই। তাতে নিজেরই খাঁটি সুখে বাদ সাধা হবে—এতে স্বস্তি লক্ষ্মীর। আবার তাকে এমন করে নাচিয়ে এমন আচমকা

কৈলাস পিছিয়ে গেল—এতে তার জ্বালা। মেয়েমানুষ সে রাজী হল, কৈলাসের এত হিসাব কেন, এত ভয় কেন, এত স্পর্ধা কেন?

লক্ষ্মী নিজেই আবার নিজেকে বলে, ধিক মোকে। আমি দেখছি মধুর মারও বাড়া, মরতে বসেও গেঁয়োমি যায় না।

মধুর মা মারা গেল। একরকম না খেয়েই—যদিও একটা রোগ হয়ে। খাত্ত পেলে অখাত্ত খেয়ে এ রোগটা মানুষের বরণ করতে হয় না। কিন্তু মরতে মরতে রসিকের মা বলে, কপাল গো, কপাল! কত জম্মো পাপ করেছি তাই পেটের ছেলে খেতে দেয় না—বৌ নিয়ে থাকে।

তার জ্বালাটা একটু কমাবার জন্যই লক্ষ্মী বলেছিল, তোমার ছেলেও খেতে পাচ্ছে না গো। বৌটাকে হাসপাতালে ঢুকিয়েছে অনেক কষ্টে, বাঁচবে কিনা ঠিক নেই।

মধুর মা ক্ষীণস্বরে বলে, হবে না? হবে না? ভগোমান নেই? মাকে না দেখলে বৌ মরবে না হাসপাতালে? মরুক! মরুক!

বলতে বলতে কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তার। মরবার আগে ভগবানের নাম তবু উচ্চারণ করা হয়ে গিয়েছিল ছেলের উপর ঝাল ঝাড়বার ছলে—কেউ কেউ তাতেই তুষ্ট হয়েছিল।

যেভাবে হোক নাম করলেই হল।

তার নয় মনের আগুনে ওসব বালাই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, সবার তো যায়নি। সবার সাথে থাকতে গেলে গোঁয়াতুর্মিও চলে না একেবারে কিছুই না মানার। পোড়া সংস্কারের ছাইগাদাতেও তাই চারা গজায়, বিশ্বাসের পোড়া ডালে গজায় নতুন পাতা!

বিচার-বিবেচনা করেই কৈলাস তার ঢালাও নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছে।

প্রিয়ার ডাকে পুরুষ সাড়া না দিলে দশজন বলবে ভালবাসার অভাব।

কিন্তু লক্ষ্মী জানে এটা ভালবাসারই প্রমাণ কৈলাসের। তারই ইচ্ছাকে তারই বিচার-বিবেচনাকে সে সম্মান করেছে।

তবু, জেনেও তার ভালো লাগে না। মনে হয়, ভালবাসা ঝিমিয়ে গেছে কৈলাসের—নইলে দিনের পর দিন এভাবে কৈলাস কাটায় কি করে?

প্রত্যাখ্যান-পাওয়া উপযাচিকার মতই জ্বালা বোধ করে লক্ষ্মী! যার ফলে প্রায় অকারণেই কৈলাসের সঙ্গে সে ঝগড়া করে বসে। অন্তত তাদের কাছে যেটা অকারণ হওয়াই উচিত ছিল। কৈলাস আর গঙ্গা সেবার একসঙ্গে কলকাতা গিয়েছিল। গঙ্গা একাই যেত। মাঝে মাঝে তাকে যেতে হয়। দু-তিন সপ্তাহ সে জামা সেলাই করে, উলের জিনিস বোনে। কলকাতায় তার এক জা-এর বাসায় দু-একদিন থেকে সেগুলি বিক্রির ব্যবস্থা করে আসে।

এবার কৈলাস আর সে একদিনে এক গাড়িতে একসঙ্গে কলকাতা গিয়েছিল নিছক ঘটনাচক্রে।

তাই নিয়ে কী রাগ লক্ষ্মীর!

তোমার কি বুদ্ধি-বিবেচনা লোপ পাচ্ছে দিন দিন? মাথা বিগড়ে যাচ্ছে? এটুকু খেয়াল থাকে না তোমার এটা কলকাতা নয়, পাঁড়াগাঁর লোকে শহুরে বাবু-বিবি বনে যায়নি?

কী করলাম আমি?

ওই সোমখ মাগী, সোয়ামীর ঘর করে না, কি বলে ওকে তুমি একলাটি সাথে নিয়ে গেলে?

আমি নিয়ে গেলাম?

গেলে না? হাসিগল্প করতে করতে গেলে না সবার চোখের সামনে দিয়ে? ওর পুঁটলিটা বয়ে নিয়ে গেলে না? তাও যদি ইস্টিশানে বুদ্ধি করে মেয়েগাড়িতে তুলে দিতে—

আমি মেয়েগাড়িতে তুলে দেব কি রকম? উনি একলা গেলেও পুরুষের গাড়িতেই যান।

লক্ষ্মীর ক্রুদ্ধ মুখের দিকে তাকিয়ে কৈলাস বুঝবার চেষ্টা করে হঠাৎ তার মাথা খারাপ হবার কারণ কি। তার ধীর শান্ত ভাব আরও রাগিয়ে দেয় লক্ষ্মীকে।

সে বলে, উনি একলাই যদি যান, ওনার সাথে এঁটে রইলে কেন সারাক্ষণ? হাসিগল্পে গদগদ হয়ে রইলে কেন? সবাই তো দেখল কী ভাব তোমাদের—তোমার সাথে একলাটি গাঁ থেকে বেরিয়ে দু-রাত্তির বাইরে কাটিয়ে মাগী ফিরল—দেখল তো সবাই?

কৈলাস প্রায় স্তম্ভিত হয়ে শোনে! এ যেন তার এতদিনের চেনা লক্ষ্মী নয়, গাঁয়ের এক কুঁদুলে মেয়ে কথা কইছে!

লক্ষ্মী বলে যায়, অন্যে যা করে করুক, তোমার কত সাবধানে গা বাঁচিয়ে চলতে হবে খেয়াল নেই? সত্যি হোক মিথ্যে হোক, লোকে যাতে মিথ্যে বদনাম দেবার সুযোগ না পায় দেখতে হবে না তোমার?

এবার কৈলাস একটু চটে বলে, কেন? কি দোষটা করেছি যে মিথ্যে বদনামের ভয়ে চোর বনে থাকব? খাপছাড়া ব্যাপার কিছু করতাম, তা হলে বরং কথা ছিল।

তোমার কাছে না হোক, গাঁয়ের দশজনের কাছে খাপছাড়া। তাই তো বলছি, তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাচ্ছে দিন দিন। গাঁয়ের মানুষের মতিগতি ভুলে যাচ্ছ। গাঁয়ের দশজনকে নিয়ে তোমার কারবার, দশজনের মন বুঝে চলতে হবে না?

দশজনের খাতিরে চোর বনে থেকে? অমন খাতিরে কাজ নেই আমার।

বদনাম কিনবে?

কিনব। দুজনেই কলকাতা যাচ্ছি, একসঙ্গে কথা বলতে বলতে গিয়েছি বলে যদি বদনাম হয়, হবে।

লক্ষ্মী ফুঁসে ওঠে, তাই নাকি! আমার জন্যে বদনাম কিনবার বেলা দেখি কেঁচোটি বনে যাও?

বলে সে দাঁড়ায় না, গটগট করে চলে যায়।

তাই বটে, তাই বটে। মাথা বেঠিক হয়ে গেছে লক্ষ্মীর। কৈলাসেরই বেঠিক হয়ে যায় মাঝে মাঝে!

পুরুষ মানুষ, শহরে খাটে, গ্রামে শহরে মানুষের নানা লড়ায়ে যোগ দেয়, তবু!

বিস্বাদ নয়, ক্ষোভ আর জ্বালায় মাঝে মাঝে এমন বিষাক্ত মনে হয় জীবনটা যে মুক্তির জন্য দিশেহারা দুর্দান্ত ঝোঁক চেপে যায়! হয় বৈরাগ্যে, নয় স্বার্থপর আত্মসুখের চরম ব্যভিচারে - যে ভাবেই হোক এ পীড়ন থেকে মুক্তি চাই। হয় সমান হয়ে যাক শূন্যতা আর জীবন। নয় পরিণত হোক পশুর জীবনে। কী অভিশাপই সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে তাদের জন্য যুগযুগান্ত ধরে! জ্ঞান বুদ্ধি অভিজ্ঞতা দিয়েও প্রভাব কাটিয়ে ওঠা যায় না একেবারে।

নন্দর সঙ্গে কথা বলে কৈলাস। নন্দ তাকে আশ্বাস দেয়।

শুধু এই একটা কেন, আরও শত শত দুর্বলতাও তাদের অপরাধ নয়। জীবনকে শুষে পিষে শুষ্ক জীর্ণ ব্যর্থ করে রাখার সঙ্গে শূন্যতার মোহ আর পশুত্বের লোভ অবলম্বন দেওয়া হয়। ফাঁকা মোহ ফাঁকা লোভ নয়। আধ্যাত্মিক সুখ আর পাশবিক সুখের বাস্তব ব্যবস্থা সমেত।

মানুষের বাস্তব জীবনের বাস্তব সুখ তো তাদের জন্য নয়! তারা মানুষ বলেই না এত ঝঞ্ঝাট!

আধ্যাত্মিক অমানুষ আর পাশবিক অমানুষ বানিয়ে রাখার এত ব্যবস্থা সত্বেও নিজেদের মনুষ্যত্ব নিয়ে তাদের এত বিভ্রাট!

শুধু নিজেদের জীবন তো নয়, সমস্ত বঞ্চিত জীবনও তাদের পীড়ন করে, আত্মীয় মানুষের ছিবড়ে-বানানো জীবন।

এসব যারা মোটেই বোঝে না? কৈলাস জিজ্ঞাসা করে নন্দকে।

নন্দ বলে, তাদেরও করে। সব জীবন জড়ানো—সমগ্র জীবনে রোগ থাকলে নিজের জ্বালা-যন্ত্রণা ছাড়াও সেটা প্রত্যেককে পীড়ন করবে—বোকা হোক বুদ্ধিমান হোক, কিছু বুঝুক আর না বুঝুক। দুর্ভিক্ষ এলে অচেতন মূর্খ বলেই কারো শুধু নিজের পেটটাই কি জ্বলে? দশজনের খিদের জ্বালা তার প্রাণটাকেও জ্বালায়।

কৈলাস যে লক্ষ্মীর ও তার সমস্যা নিয়ে পরামর্শ করতে এসেছে তার সঙ্গে,

নন্দ তাতে আশ্চর্য হয়নি। পরস্পরকে তারা বন্ধু ভাবে না—তারা জানেও না তাদের মধ্যে কি ধরনের বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে এবং দিন দিন ঘনিষ্ঠতর হচ্ছে। না জানার কারণ এই যে বন্ধু বলতে দুজনেই ধারণা পুষে রেখেছে, নিঃসংকোচে যার সঙ্গে ইয়ার্কি ফাজলামি করা চলে—যে শুধু ইয়ার!

ছেলেবেলাও তারা প্রাণ খুলে মিশত কিন্তু হাল্‌কা ইয়ার্কি, নিষিদ্ধ বদ কথা নিয়ে গোপন আলাপ তাদের মধ্যে চলত না—সেজন্য দুজনেরই ভিন্ন ইয়ার ছিল, পরস্পরকে বন্ধু না ভেবে যাদের তারা বন্ধু বলে জানত।

কামারের ছেলে নন্দ আর তান্ত্রিক সাধক ত্রিভুবন দত্তের ছেলের মধ্যে যতই ঘনিষ্ঠতা হোক একটু গাম্ভীর্য বজায় থেকে যেত তাদের সম্পর্কে। অল্প-শিক্ষিত কম্পোজিটার কৈলাস আর বিদ্বান ডাক্তার নন্দ যতই একাত্ম হোক, সেই গাম্ভীর্যটুকু বজায় থেকে গেছে। এবং সেইজন্যই তারা যেন বন্ধু নয়!

নন্দ আবার বলে, একটা কথা সবাই বলে, এ দেশটা খুব পিছিয়ে আছে। পিছিয়ে আছে সত্যি কিন্তু এমনভাবে বলা হয় কথাটা যেন পিছিয়ে আছে মানেই অমানুষ হয়ে আছে দেশের লোক। শুনলে এমন গা জ্বালা করে আমার! পিছিয়ে থাকলে, কুসংস্কারে বদ্ধ হলে, দারিদ্র্যে পিষে গেলেই যেন মনুষ্যত্বেও ঘাটতি পড়ে মানুষের। জানো কৈলাসদা, এদেশে আজ পর্যন্ত এমন একজন নেতা জন্মালেন না যিনি দেশের পিছিয়ে-থাকা মানুষগুলিকে ষোল আনা মানুষ বলে শ্রদ্ধা করতে পারলেন। এটাও এদেশের বাস্তবতার একটা ফল। নেতা হবার মত শিক্ষাদীক্ষা পেয়ে গড়ে উঠতে গেলেই গরীব মূর্খ সেকেলে মানুষগুলির জন্য শ্রদ্ধা কমে যায়। নেতারা ভাবেন, বুকভরা দরদ থাকলেই হল, এদের জন্য জীবন পণ কবতে পারলেই হল—শ্রদ্ধার অভাবটা পর্যন্ত টের পান না। ভেবো না আমি খাঁটি নেতাদের খাটো করছি। ভালবাসায় ভেজাল নেই, দেশের লোকের ভালো করা ছাড়া অন্য চিন্তা নেই, কাজ নেই—এমন নেতাও ছিলেন, আজও আছেন। কিন্তু এসব তো যথেষ্ট নয়—শ্রদ্ধা চাই। এ যেন শিশুর জন্য পীড়িতের জন্য সমবেদনা, তাদের জন্য প্রাণপাত করা। শুধু স্নেহ নিয়ে আর প্রাণপণে চেষ্টা করে বাপ

ছেলেকে মানুষ করতে পারে না, ভবিষ্যৎ মানুষ বলে ছেলেকে শ্রদ্ধাও করতে হয়।

কৈলাস বলে, আজকাল কিন্তু নতুন নেতা উঠছেন, মানুষ বলেই শ্রদ্ধা করতে পারছেন মুখ্যু গরীবদের। পুরানো নেতারাও কেউ কেউ শিখেছেন শ্রদ্ধাটা—

নইলে যে আর নেতা হবার উপায় নেই! পিছিয়ে থাকলেও দেশের মানুষরাই তো নেতা গড়ে নেয়। আজ তাদের শুধু ভালবাসা নয় শ্রদ্ধাওয়ালা নেতা দরকার হয়েছে।

লক্ষ্মী ও কৈলাসের সমস্যায় ফিরে এসে নন্দ বলে, তোমাদের মুশকিলটা নৈতিক নয়। শাস্ত্রে নিষেধ আছে বলে, দশজনের নীতিবোধে ঘা লাগবে বলে তোমরা একসাথে থাকলে দশজনে ঘেন্না করবে—এটা স্রেফ বাজে কথা। তোমাদের মিলনটা হবে বে-আইনী, এই হল আসল মুশকিল। রাতারাতি সবার নীতিবোধ তো পাল্টায় না? আজ একটা আইন পাশ হোক, কাল তোমরা আইনীভাবে একসাথে থাকো—কিছু গুজগাজ ফিসফাস চলবে, দু-চার জন চটবে, কিন্তু সাধারণভাবে লোকে তোমাদের অশ্রদ্ধা করবে না। সংস্কারের ভিত আলগা হয়ে গেছে সাধারণ মানুষের। জোর করে পুরানো পচা ব্যবস্থা টিঁকিয়ে রাখা হয়েছে তাই। ব্যবস্থা পালটে দিলেই যে কত সংস্কার শুকিয়ে যাবে! চাষীরা জমির মালিক হোক, কত প্রথা কত বিশ্বাস নিজে থেকে খারিজ হয়ে যাবে। ভাত-কাপড়ের সমস্যা-টমস্যাগুলি মেটার আগে তোমাদের সমস্যা মেটার ভরসা নেই ভাই। মানুষের স্বাধীনতা নেই, প্রেমের কি স্বাধীনতা থাকে?

কৈলাস সায় দিয়ে বলে, আমিও তাই ভাবছিলাম। ওকে কিভাবে বুঝিয়ে বলব ঠাহর পাচ্ছিলাম না। অত তলিয়ে তো বুঝিনি ব্যাপারটা! মিথ্যে উপায় খুঁজছিলাম।

কৈলাস ভাবে, লক্ষ্মী শুনলে থ বনে যাবে। চটেও যাবে নিশ্চয়। কৈলাস ধৈর্যহীনা ভেবেছে তাকে! কৈলাসের অস্থিরতায় উতলা হয়ে তবেই না সে

আত্মসমর্পণ করতে রাজী হয়েছিল এবং রাজী হয়েছিল বলেই না কৈলাসের অবহেলায় আহত হয়ে একদিন শুধু একটু ঝগড়া করেছে গায়ে পড়ে।

তবু কৈলাস তাকে সব শোনায়!

তাদের গোপন প্রেমের সমস্যা নিয়ে নন্দর সঙ্গে সে পরামর্শ করেছে শুনে কিন্তু রাগ হয় না লক্ষ্মীর, লজ্জায় গায়ে কাঁটাও দেয় না।

বরং তাদের কি কথা হয়েছে শুনতে শুনতে স্বস্তি বোধ করে লক্ষ্মী। স্বস্তি বোধ করে এইজন্য যে দেশের কোটি কোটি মানুষের বেঁচে থাকার সমস্যাগুলি বজায় থাকতে তাদের সমস্যার কোন সমাধান সম্ভব নয়—এটা কৈলাস এবার স্পষ্ট পরিষ্কারভাবে বুঝেছে।

একটা বিশেষ কথা কৈলাস বুঝেছে কিনা সে বিষয়ে তার একটু খটকা থেকে যায়। কৈলাস নিজেই কথাটা তুলে তাকে নিশ্চিন্ত করে।

বলে, ছাখো, থানার ঘড়িতে দশটা এগারোটা বাজিয়ে তোমার কাছে আসতে পারি। আমরা তাতে মন্দ হয়ে যাব না।

হৃদয়ে তোলপাড় ওঠে লক্ষ্মীর। টের পায় সর্বাঙ্গ তার ঘামতে আরম্ভ করেছে।

কৈলাস বলে, লুকিয়ে এলাম, শ্যাল-কুকুরও টের পেল না। ভগবান যদি থাকেনও তবু তাঁর দুটি চোখ কানা! কিন্তু একটা দিন দুটো দিন এলেই কি মোরা ধন্যি হয়ে যাব, সাধ মিটে যাবে? মদের স্বাদ পেলে নেশা চড়তে থাকে, মোদের হবে আরও বিষম নেশা। জানাজানি হয়ে যাবেই।

লক্ষ্মীর যেন ঘাম দিয়ে জর ছাড়ে।

কৈলাস বলে, সবাইকে ডোণ্ট কেয়ার করে তোমায় নিয়ে ঘর বাঁধা আর রাতের বেলা লুকিয়ে আসা এক কথা। তার চেয়ে তুমি আমি বুক বাঁধি এস। মহিমটা জেলে পচছে, গাঁদাকে তাই বুক বাঁধতে হয়েছে। সারা দেশের লোকের সাথে আমি জেলের চেয়ে বড় ফাঁদে আটক পড়েছি ভেবে তুমি বুক বাঁধবে।

কপালের ক্ষতচিহ্নটা আঙুলে টিপে লক্ষ্মী বলে, আর তুমি?

কৈলাস বলে, আমি? আমার বুক বাঁধাই আছে!

পুরুষ মানুষ, তাই তার কথা আলাদা। কৈলাসকে যদি কেউ বলে দিত এদেশে বুদ্ধদেব থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত শুধু পুরুষরাই আদর্শের জন্য কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করার অধিকার পেয়ে এসেছে,—এ ব্যাপারটার সঙ্গে তার বুক বাঁধাই আছে বলার ধরনের বড্ড বেশী মিল—তার ফুলে-ওঠা বুকটা নিশ্চয় চুপসে যেতে খানিকটা!

গাঁদাকে পাশে নিয়ে লক্ষ্মী রাতে শান্ত হয়ে ঘুমায়, ছেলেমানুষ গাঁদার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঘুমায়। সে যেন প্রমাণ দেয় যে সংযম না ছাই, সংযম মানেই বঞ্চিত বিকারগ্রস্ত মানুষের অসংযমের তাড়নার সঙ্গে লড়াই করে ক্ষতবিক্ষত হওয়া—সুস্থ স্বাভাবিক জীবন হলে মানুষের কাছে সংযম কথাটার মানেই দাঁড়িয়ে যেত অন্য রকম। ওই রকম জীবনের জন্য মানুষের বড় লড়াইকে শুধু ঠিকমত খাতির করেই নিজের জ্বালায় ছটফটানোর বদলে মানুষ দিব্যি অচেতন হয়ে ঘুমোতে পারে!

মন শান্ত হয় না কৈলাসের। লণ্ঠনের আলোয় তার চোখে পড়ে বেড়ায় টাঙানো বাংলা ক্যালেণ্ডারের রঙিন ছবিটার দিকে—বটতলার একটি জনপ্রিয় ছবি ছাপানো হয়েছে—ঘুমন্ত বৌকে ছেড়ে রাত্রে নিমাই-এর গৃহত্যাগ। খাটে ঘুমন্ত বিষ্ণুপ্রিয়া। এ ছবি দেখে কৈলাসের শুধু মনে হত, পাঁচ ছ-শো বছর আগে একালের তাঁতের শাড়ী বিষ্ণুপ্রিয়ার দেহে কি করে উঠল, একালের ঢং-এ শাড়ী পরাই বা তাকে কে শেখাল, এরকম সাজসজ্জা করে তখনকার বৌদের বিছানায় শুয়ে ঘুমানো রীতি ছিল কিনা।

ছবিটা আজ তাকে মনে পড়িয়ে দেয় অন্য কথা।

চৈতন্যদেবের আদর্শ কি ছিল আর কেমন ছিল সে কথা নয়, প্রায় তারই মত বৌ না হলেও বৌয়ের বাড়া লক্ষ্মীকে সে যে আজ আদর্শের জন্য ত্যাগ করেছে, একথাও নয়।

সন্ন্যাসী হওয়ার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল চৈতন্যের। দেশ প্রস্তুত ছিল, সময়

ছিল উপযুক্ত, তার শিক্ষায় বন্যার মত ভেসে গিয়েছিল দেশ। আজ এত প্রয়োজন তবু নতুন ভাবের বন্যা আসে না কেন দেশে?

প্রয়োজন চরমে উঠেছে, কিন্তু দেশ কি প্রস্তুত নয়? বন্যা এনে দেবার মানুষ নেই?

একদিন কোথা থেকে স্টেশনে নামে নেংটি-পরা ছাই-মাখা সন্ন্যাসী। বেশী দিনের সন্ন্যাসী নয় বোঝা যায়, চুল সবে জট পাকাতে আরম্ভ করেছে। মুখভরা আধ ইঞ্চি গোঁপদাঁড়ি।

ছাই ভেদ করে চোখে পড়ে তার দেহের মলিন গৌরবর্ণ।

হাতে একটা ভাঙা কাঁসার থালা, এক টুকরো পোড়া কাঠ দিয়ে সেটা পিটিয়ে লোক জড়ো করে চেঁচিয়ে বলে, আমি কলির অবতার, তোমাগো মুক্তি দিতে আইছি। স্বর্গে ভগবানরে বিনাশ কইরা মর্তে নামছি, আমি তোমাগো অধর্ম শিখামু, মুক্তি দিমু। ডর নাই, কোন ডর নাই। আমি তোমাগো বাঁচামু।

হেলেদুলে মাথা নেড়ে পাক খেয়ে অঙ্গভঙ্গি করে। কাঁসার ভাঙা থালাটা ঠং-ঠং করে পিটিয়ে দেয়।

বলে, কলিকালে সব উল্টা। আমি উল্টা অবতার হইছি, তোমাগো শিখাইতে আইছি। তোমাগো বুঝাইতে আইছি। তোমরা আমারে পূজা করবা, অধর্ম করবা। ভুইলো না, যত পাপ করবা তত সুখ পাইবা।

কেউ খেতে দিলে খায়, না দিলে চায় না। প্রশ্ন করে জবাব মেলে না। এ-গাঁ ও-গাঁ ঘুরে বেড়ায় আর থালা পিটিয়ে লোক জড়ো করে নিজের কথা বলে যায়। ওই এক কথা, ভগবানকে সে বিনাশ করেছে, ভগবানের সে বিপরীত অবতার, এবার থেকে সকলে তাকে পূজা কর, অধর্ম কর, পাপ কর। সুখ পাবে, মুক্তি পাবে।

খবর শুনে ত্রিভুবন বারতলায় গিয়ে তাকে পাকড়াও করে। তাকে কথা বলাবার জন্য, প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য তিন-চার ঘণ্টা চেষ্টা করে গলদঘর্ম হয়ে যায়। পাগল সন্ন্যাসী তাকে পাত্তাও দেয় না।

ত্রিভুবন শেষে ভয় দেখিয়ে বলে, তোমায় পুলিসে ধরিয়ে দেব।

এবার সে বলে, দাও! বলেই থালা পিটিয়ে চেঁচাতে শুরু করে।

ত্রিভুবন বলে, ভাত খাবে?

নীরবে মাথা হেলিয়ে সে সম্মতি জানায়।

ত্রিভুবন বলে, আমার বাড়ি এস।

সে নিজের মনে মাথা দুলিয়ে যায়।

একজন বলে, কারো বাড়ি যাবে না দত্ত মশাই। অনেকে চেষ্টা করেছে, পারেনি।

বাজারের কাছে গাছতলায় বসেছিল। বারতলায় বাজার বসে একবেলা—সকালে। বেলা বেড়েছে, বাজারের কেনাবেচা শেষ হয়েছে, অন্যদিন এতক্ষণে স্থানটি ফাঁকা হয়ে আসত। আজ অনেক লোক গাছতলায় ভিড় করে আছে।

শুধু পাগলটার জন্য নয়। ত্রিভুবন এসেছে পাগলের কাছে, কি ঘটে দেখবার জন্য।

হবেন দাসের বাড়ি কাছেই। সে ত্রিভুবনকে জিজ্ঞাসা করে, মোদের ঘরের ভাত দিলে পাপ হবে না তো দত্ত মশায়?

ত্রিভুবন হেসে বলে, পাপ করতেই তো বলছে।

হরেন বলে, পাগল হোক, সন্ন্যাসী তো। আপনি অনুমতি করলে ভাত এনে দিই। এক ঘরের ভাতে হবে না, এত বেলায় কার ঘরে ভাত আছে কে জানে। কয়েক ঘর থেকে জুটিয়ে এনে দিতে হবে।

তোমাদের খুশি হলে দাও।

কোনমতে পাগল সন্ন্যাসীকে বাগাতে না পেরে বিরক্ত হয়ে ত্রিভুবন বাড়ি ফিরে যায়।

ভাত তরকারি ডাল আর পুঁটিমাছের ঝোল আসে পাগল সন্ন্যাসীর জন্য। কয়েক বাড়িতে এবেলা আধপেটা ভাতেও কম পড়বে।

ভাতের থালার দিকে খানিকক্ষণ কটমটিয়ে চেয়ে থেকে সন্ন্যাসী বলে, অন্নগত প্রাণ? অন্নগত প্রাণ? কলিতে অন্নগত প্রাণ? যা, খাম্ না তর ছালির অন্ন। ঘাস খাম্।

বলে মাটির থেকে ঘাস ছিঁড়ে ছিঁড়ে থালায় ছড়িয়ে দিয়ে ঘাস মেশানো ভাতে ডাল তরকারি ঝোল এক সাথে মেখে ফেলে ছড়িয়ে খেতে আরম্ভ করে।

নানা গল্প, নানা গুজব ছড়ায় চারিদিকে। পাগল সন্ন্যাসীর অদ্ভুত আচরণ অদ্ভুত ক্ষমতা আর অত্যাশ্চর্য কাণ্ডকারখানার গল্প।

সব আবার শোনা কথা হয় না। প্রত্যক্ষদর্শীও পাওয়া যায়।

একজন চোখের সামনে সন্ন্যাসীকে শূন্যে মিলিয়ে যেতে দেখেছে। গভীর রাত্রে সন্ন্যাসীর চারিদিকে কিম্ভূতকিমাকার আবছা আবছা সব জীবকে ঘিরে থাকতে দেখে আরেকজনের মূর্ছা যাবার উপক্রম হয়েছিল। বারতলার সাত মাইল উত্তরে মাঝেরপাড়া গ্রামে যে রাতে যাত্রা হয়েছিল এবং সমস্ত রাত সন্ন্যাসী যাত্রার আসর ছেড়ে এক পা নড়েনি, সেই রাতে রসিক ছিল শহরে তার কুটুমবাড়ি।

রসিক কুটুমের সঙ্গে সন্ন্যাসীর গল্প করছে, হঠাৎ সশরীরে সন্ন্যাসী তাদের সামনে উপস্থিত!

যাত্রা শুনছিলাম একটু, স্মরণ করেছিস কেন?

লক্ষ্মী বলে, ও যেমন পাগল, তুমিও তেমনি পাগল। বানিয়ে বানিয়ে এসব গপ্পো ছড়িয়ে কি সুখটা হয় বল তো?

সারদা বলে, যেমন তেমন পাগল নয় গো, এ অন্য পাগল। মহাপুরুষদের শুনেছি এমনি অবস্থা হয়।

তোমার মুণ্ডু হয়।

কয়েকদিন পরে জানা যায় পাগল সন্ন্যাসীর পরিচয়। আকুলিয়ার উদ্বাস্তু শিবিরে বাস করত। বৌ ছেলে মেয়ে মরে যাবার পর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

সন্ন্যাসী হয়ে ঘুরে বেড়ায়।

আরও দিন কয়েক পরে দেখা যায় অন্য এক গ্রামের গাছতলায় পাগল সন্ন্যাসী মরে পড়ে আছে।

১২

জগদীশের কাছে কিছু টাকা পাবার আশায় এই তো সেদিন জীবন নেমেছিল বারতলা স্টেশনে। পরিবার নিয়ে বিব্রত জীবন। তারপর কত মানুষ এল গেল পাগল সন্ন্যাসী পর্যন্ত। সকলেই যেন এল বহুরূপী ব্যাপক সংঘাতের বিচিত্র সূত্র ধরে, ঘরোয়া জীবনের নোঙর যেন কারো নেই। বাইরে থেকে তফাত থেকে বড় জোর একটু উঁকি দেওয়া হল দু-একটা পরিবারে—পারিবারিক জীবন বলে যেন কিছুই এদের নেই। বারতলায় দেশী খাবার তেলেভাজার দোকানী সনাতন ঘর বেঁধেছে সুরমাকে নিয়ে, দোকানের পিছনের অংশটুকুতে, সুরমার বাচ্চা হবে—কিন্তু বিয়ে-করা বৌ তো সুরমা নয়! তা হোক। তবু ওদের এইটুকু কাঁচা ঘরের ঘরোয়া জীবন যেটুকু বর্ণনা পেল, আর কারো ভাগ্যে তার সিকিটুকুও জুটল না!

একেবারে আড়ালেই রয়ে গেল প্রথম পুরুষ জীবনের পরিবার। পা মচকে লোচনের বাড়িতে উঠল জীবন, মহিম ছাড়া প্রায় সমস্ত পরিবারটিকে দেখা গেল লোচনের, নিরুদ্দেশ মহিমেরও পরে আবির্ভাব ঘটল তার জেলে যাবার কাহিনী জানা যাওয়ায়, লক্ষ্মী গাঁদা গজেনেরা কতবার এল গেল—কিন্তু এ বাড়ির মানুষগুলিরও পরস্পরকে নিয়ে দিনযাপনের ছবি পর্যন্ত পাওয়া গেল না।

মহিম বাড়ি নেই জেলে পচছে, তাই কি গাঁদাকে নিয়ে এত কথা? ঘনরাম ঘরে আছে বলে দয়া একবার উঁকি দিয়েই হারিয়ে গেল? আনন্দ বেদনা হাসি কান্নার তরঙ্গ কি ওঠে না তাদের জীবনে?

সেই কাহিনীই বলে আসছি এতক্ষণ। এবার অল্পে অল্পে কাহিনী গুটিয়ে আনবার পালা, তাই সোজাসুজি বলে নিলাম ঘরে বাইরে জীবনের গতি আজ একমুখী। সমস্ত সংঘাতের সেটা মোট ফল। কোন জীবনে গতিটা স্পষ্ট, কোন জীবনে ইঙ্গিত মাত্র। কিন্তু সেই ইঙ্গিতটুকুতে নিহিত আছে

ভবিষ্যৎ। কচু বনে মাথা তুললেও মহীরুহের চারাটিতে আগামী বিরাটত্বই আসল কথা।

গাঁয়ের কোণে বেড়ার আড়ালে যার জীবন কাটল তার জীবনেও সমগ্র জীবনের একমুখী গতির সঞ্চারটুকু বড় কথা।

দয়াকে ধরেই দেখা যাক। অনেক শতাব্দীর জমাট অন্ধকারের জীব দয়া।

গাঁদার বয়সী একটি সতীন হয়েছিল দয়ার। তার ডাক নাম ছিল খেড়ি। যে কটা বাস্তব কারণে চাষীর ছেলে একটা বৌ থাকতেও আবার বিয়ে করে তার মধ্যে খুব জোরালো কারণটাই ছিল ঘনরামের স্বপক্ষে।

দয়ার ছেলেমেয়ে হয়ে বাঁচত না। এমনি দয়াকে পছন্দই করত ঘনরাম কিন্তু ছেলেমেয়েকে জন্ম দিয়ে বাঁচাতে না পারায় ঘনরাম বড়ই অসুখী হয়েছিল, বড়ই বিরক্ত হয়ে উঠেছিল দয়ার উপর।

গর্ভে সন্তান এসেও জন্মলাভের পর যার সন্তান বাঁচে না তার চেয়ে অভিশপ্ত স্ত্রীলোক জগতে আছে কি?

সে যদি পুরুষত্ব হারাত, সন্তানের জন্ম দেবার ক্ষমতা হারাত তাহলে অন্য কথা ছিল। এ তো দেখাই যাচ্ছে যে সে ঠিক আছে—গর্ভ সঞ্চার করতে পারছে দয়ার। দয়ার দোষেই নিশ্চয় বাঁচে না ছেলেমেয়ে।

সুখদা ছিল একটু তেজী ধরনের মেয়ে। লক্ষ্মী বা গাঁদার মত না হলেও তার তেজ ছিল। এই তেজটুকু না থাকলে হয়তো সে নির্জন পুকুরঘাটে হাতমুখ নেড়ে কথা কইতে যেত না একটা ব্যাটাছেলের সঙ্গে—হোক সে ব্যাটাছেলেটা তার ছেলেবেলা থেকে জানাশোনা মানুষ।

আসলে সুখদার এই তেজটুকুও পছন্দ হচ্ছিল না ঘনরামের। সে গিয়েছিল কৃষ্ণের মত প্রেম করতে তার রাধিকার সঙ্গে, সুখদা কোথায় জগৎটা দেখবে ঘনরামময়, কেঁদে গলে গিয়ে বলবে দিনরাত তোমার সাথে থাকতে না পেয়ে মরে যাচ্ছি গো, তুমি আমার বাঁচন-মরণ সর্বস্ব—তার বদলে সে করত হাসি তামাসা ছল চাতুরী।

ছুতো পেয়েই সে তেজী মেয়েটাকে বাতিল করেছিল। ঝাল ঝেড়েছিল

তার নামে মিথ্যা বদনাম রটিয়ে। যার ফলে রাজায় রাজায় যুদ্ধ বাধার মত শত্রুতা বেধেছিল লোচন আর রাজেনের পরিবারের মধ্যে। ভীরু নিরীহ সরলা অবলা অর্থাৎ বোকা নম্র দয়াকে ভাল লেগে গিয়েছিল ঘনরামের। এতটুকু তেজ নেই। আমি তোমারই দাসী। তুমি যা বলবে তাই সই। মারলে কাটলে অনাদর করলে কাঁদব—আর কি করব বলো? কাঁদা ছাড়া আমার গতি কি আছে? তুমি আমার দেবতা।

দয়া নিজেই বলত, আবার বিয়ে কর।

সাধ করে কি আর কেউ সতীন বরণ করে? দয়া আতঙ্কের চাপে বলত। এমনিভাবে ছেলেপিলে হয়ে মরতে মরতে মরতে চললে কোথায় গিয়ে চড়বে ঘনরামের বিরক্তি আর আক্রোশ তার ঠিক কি?

তবু অনেক বিষয়ে তার মান রেখে চলত ঘনরাম, তার সঙ্গে পরামর্শ করত সংসারের সমস্যা নিয়ে, এখনো করে। তাকে যে খুসী রাখতে চায়, তার জন্য যে দরদ আছে লোকটার তার ঢের-ঢের প্রমাণ মেলে, কষ্টকর জীবন যাপনের দিন-রাত্রে। কিন্তু এক একটা সন্তান মরেছে আর বৈরাগ্যে স্বামীর মন যে কতদূর সরে গেছে তা কি আর টের পায়নি দয়া। কবে শুরু হয়েছিল তাদের একত্র জীবনযাত্রা? মনে করতে পারে না দয়া। এত বছরের হিসাব কেউ রাখতে পারে? সন্তানের বয়স দিয়ে যে ধারণা করবে তাও তার হবার নয়, বিয়ের চার-পাঁচ বছর পরে মানতের সন্তান এসেছিল, বাঁচেনি। আরেকটা এসেছিল কতদিন পরে? কে জানে, সে ব্যবধান স্রেফ ভুলে গেছে দয়া। সেটাও বাঁচেনি। আর মানত করেনি দয়া।

গান্ধী মহারাজ তখন ডাক দিয়েছেন খাজনা দিও না পাপী ইংরেজ রাজাকে, ভগবানের বিধান হয়েছে স্বরাজ হবে। ঘনরাম বড় উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল। জেলে যাবার আগে বলেছিল এক দিন, দেবতার কাছে আর মানত উঠেছিল। জেলে যাবার আগে বলেছিল এক দিন, দেবতার কাছে আর মানত কোরো না বৌ। দেবতা দেয় দিক, না দেয় না দিক, দিয়ে দিয়ে কেড়ে নিক, যা করবার করুক দেবতা মানত ছাড়াই।

বলেছিল, ছেলে হয়ে বাঁচে না বলে ফের বিয়ে করব? মাইরি না!

বলে জেলে গিয়েছিল দু'মাসের জন্ম।

বিরূপ দেবতাটার কাছে আর মানত করেনি দয়া। দু-দুটো শোকার্ত বীভৎস ফাঁকিতে তার ভক্তিশ্রদ্ধা টুটে গিয়েছিল সেই দেবতার ওপর। তবে একেবারে মানত না করে সে পারেনি। সাতনালির বড় শাসমলদের ছোট মন্দিরের মেয়ে-দেবতার নামে মানত করেছিল—দুটো সন্তান মরে যাওয়ায় কি ভয়ঙ্কর বিদ্রোহ দয়ার!—মানত করেছিল এক দলা মাটি, একশো তেঁতুলবীচি, দশটি কলকে-ফুল আর ছেলে হয়ে যদি বেঁচে-বর্তে থাকে তবে তার পাঁচ বছর বয়সে একটি কাঁচা-কুমড়ো। এখন মাটি খাও বীচি খাও ফেল্না ফুল খাও দেবী, যদি খাবার সাধ থাকে তবে তার কোলে ছেলে দিয়ে পাঁচ বছর বাঁচিয়ে রাখো, কুমড়ো মিলবে! দেবী হও আর যাই হও, ফাঁকি দিলে চলবে না দয়াকে।

জেল থেকে বেরিয়ে স্বরাজ ফসকে যাবার হতাশার প্রতিক্রিয়ায় কিনা বলা যায় না, আরেকটা বিয়ে করবার মতলব ঘনরাম স্থির করে ফেলেছিল।

দয়ার অনুমতি নিয়ে তো বটেই, অনেকটা তার তাগিদেই ঘনরাম বিয়ে করেছিল রামপুরের কার্তিকের মেয়ে বেঙিকে। বড় মধুর ক্ষমাশীল প্রকৃতি দয়ার। কিন্তু সতীন আসবার সব ঠিকঠাক হবার পর হঠাৎ কেমন বিগড়ে গিয়েছিল দয়া, থেকে থেকে গালাগালি করেছিল ঘনরামকে, স্পষ্ট ঘোষণা করেছিল সে যে ভাবে হোক মারবে সতীনকে, মারবেই। কেঁদেছিল, অভিশাপ দিয়েছিল অদৃষ্টকে।

ঘনরাম বলেছিল, তবে নয় থাক্!

থাক্! ভেঙিয়ে বলেছিল দয়া।—বিয়ে যেন ঠেকে থাকবে! মাঝ থেকে মরণ হবে মোর। মোকে মেরে ড্যাংডেঙিয়ে বৌ আনবে তুমি।

তার সম্বন্ধে দুর্ভাবনা ছিল সকলের কিন্তু বৌ নিয়ে ঘনরাম ফিরে আসতে দেখা গেল তার এতটুকু রাগ নেই, ঝাঁঝ নেই। তারপর একদিনও আর সে হিংসায় পাগলের মত ছটফট করে নি ওই কয়েকটা দিনের মত। বেঙিকে সে কাছে ডেকে বসাত, তাকে দিয়ে উকুন বাছাত, তেলের অভাবে শুধু জল

দিয়ে চুল বেঁধে দিত। কোন রাতে শোয়ার আগে ঘনরাম বসে তার সঙ্গে দুদণ্ড কথা কইত সংসারের নানা বিষয়ে, ভাব দেখাত। যেন বেঙির দিকে নজরও নেই, খেয়ালও নেই বেঙির কথা। দয়া হাই তুলত, ঘুম পেয়েছে জানিয়ে শাশুড়ীর বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ত। বেঙিকে বলে যেত, যা যা, শো গে' যা কালামুখী। বছর ঘুরতে যদি কোল খালি রয়, তোর মাথা ছেঁচে দেব।

তিন বছর পরে দশ মাসে ছেলে হতে গিয়ে বেঙি মরে গিয়েছিল। তখন মানতে হয়েছিল ঘনরামকে যে ছেলে হয়ে না বাঁচাটা দয়ার দোষ নয়। তারই ছেলেপিলে বাঁচবে না এটাই অদৃষ্টের বিধান।

ঘনরাম প্রাণপণে চাষ করে, উদয়াস্ত সংসারে কাজ করে দয়া। ভারি ভারি সব কাজ। ম্যালেরিয়া কাবু করেছে লোচনের বৌকে—সে বেশী খাটতে পারে না। তবু মনে হয় গাঁদাকে সামলে চলা ভুলিয়ে রাখা চোখে চোখে রাখাই যেন দয়ার আসল কাজ। গাঁদাকে দিয়ে সে হাল্‌কা কাজ করায়, তার সাথে ঘাটে যায়, এক সাথে খায়, তার চুল বেঁধে দেয়—আর বুঝিয়ে সুঝিয়ে বকুনি দিয়ে শাসিয়ে তাকে আয়ত্তে রাখতে চায়।

জ্বালার তার শেষ নেই ছোট জা-টিকে নিয়ে। তার অবাধ্যতা আর ধিঙ্গিপনা গায়ে তার জ্বালা দেয় রোজই।

ভাসুরের সঙ্গে সে কথা বলবে যে বলবেই! ঘোমটা টেনেই কথা বলে বটে, কিন্তু কি দরকার তার সোজাসুজি ঘনরামের সঙ্গে কথা বলার? কিছু বলার থাকলে দয়ার মারফতে বললেই হয়!

একলা এবাড়ি ওবাড়ি যাবেই—নন্দ ডাক্তারের বাড়ি পর্যন্ত যাবে! দয়াকে কিছু না বলে এক ফাঁকে চলে যাবে। তোর ভয়ডর নেই পোড়ামুখী? একলাটি পেয়ে একদিন তোর দফা যে নিকেশ করবে কেউ।

তত বুকের পাটা নেই কারো। ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে না গাঁয়ের মানুষ?

শ্বশুর-শাশুড়ী কিছু বলে না। শাসন করতে বললে বলে, না না বাছা,

শাসন-টাসনে কাজ নেই। দিনের বেলা একটু ইদিক উদিক যায় যদি তো যাক। লক্ষ্মী টো-টো করে বেড়াবে, দিন নেই রাত নেই, এইটুকুর জন্যে ওকে কি বলে শাসন করবে গো?

ওমা! লক্ষ্মীর সাথে ওর তুলনা?

লোচন বলে, তুমিই শুধু অবুঝ রইলে বাছা। ঘনরাম বলছিল এবার ধান কেড়ে নিতে এলে হাঙ্গামা হবে দর নিয়ে। ছুঁড়ি যদি বেঁকে বসে, যদি বলে ধান পাহারা দেব, সোয়ামীর কাছে জেলে যাব? কী বলে তুমি ঠেকাবে ওকে? বেঁধে রেখে ঠেকাতে পারবে?

ঘনরামকে বলতে গেলে সে খানিকক্ষণ নিজের মনে হুঁকোই টেনে যায়।

হুঁকো নামিয়ে বলে, নাঃ, কিছু বলতে হবে না। নিজের মনে আছে থাক, নজর তো রাখাই হচ্ছে।

দয়া রেগে বলে, আমি পারব না নজর রাখতে। তুমি সামলাবে তোমার ভায়ের বৌকে।

তাই সামলাব নে, তোর অত মাথাব্যথায় কাজ নেই।

খুব মজা লাগবে না?

এক থাব্ড়া মারব কিন্তু দয়া। যার বৌ সেই নিজে বলে পাঠিয়েছে, মোদের অত বাহাদুরি কিসের।

শুনে সব ভুলে যায় দয়া।

বলে, বলে পাঠিয়েছে? ছোট কত্তা নিজে? কবে গো বলে পাঠাল?

ঘনরাম ধীরে ধীরে বলে, ধান নিয়ে বিষম হাঙ্গামা হতে পারে। বাবা বললে কি, নিজেও ভাবলাম কি, বাপের বাড়ি নয় তো অন্য কোথাও পাঠিয়ে দেব নাকি জিজ্ঞেস করলে হত মহিমকে। পাগলাটা জানিয়েছে কি জানো? ওর বৌ যদি পালায়, জীবনে আর মুখ দেখবে না বৌয়ের।

দয়া ধাঁধায় পড়ে বলে, কি করে খবর দিলে? মোদের না খবর দেয়া-নেয়া বারণ? জেলে গেছে মোরা জানি টের পেতে দেওয়া চলবে না ঠাকুরপোকে?

কৈলাস কিভাবে যেন চিরকুট পাঠিয়েছে, জবাব আনিয়েছে। মোরা যেন জানতে চাইনি, কৈলাস নিজে শুধিয়ে পাঠিয়েছিল।

দয়া মুখ বাঁকিয়ে বলে, কী যে কাণ্ড তোমাদের বুঝিনে বাবা। বাপ রয়েছে, বড় ভাই রয়েছে—বৌকে বাপের বাড়ি পাঠাবো কিনা হুকুম চাইতে হয়!

তা শুধোতে হবে না? মনের খেদে ছোঁড়া রোজগার করতে ঘর ছেড়েছিল, সেটি ভুললে চলবে না কি? বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেব—ছোঁড়া ভাববে এই অজুহাতে ভাতকাপড় দেবার দায় কাটিয়েছি।

দীপের আলোয় তারা কথা কয়। ঘনরাম ভাবে কে জানে কিভাবে বাপের ঘরের মায়া একেবারে কেটে গেছে দয়ার! আগে বাপের বাড়ি যাওয়ার জন্য সে যেন উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকত, এই নিয়েই তাদের ঝগড়া হত সবচেয়ে জোরালো। আজ কতকাল সেই দয়া বাপের বাড়ির নামও করে না! এ মাসেই তার নিজের বোনের বিয়ে, ঠিক ধান কাটার সময়। বোনের বিয়ে সোজা ব্যাপার! আগে হলে দয়া কমপক্ষে এক মাস আগে বাপের বাড়ি যাবার জন্য পাগল হয়ে উঠত।

এবার সে নিজেই ঠিক করেছে ঘনরামের সঙ্গে ঠিক বিয়ের সময় দু-চার দিনের জন্যে যাবে, তার সঙ্গেই ফিরে আসবে। যদি অবশ্য যাওয়া হয় ঘনরামের। জোর করে ধান কেনা নিয়ে ও সময়টা হাঙ্গামা হলে হয়তো তার যাওয়াই হবে না শালীর বিয়েতে।

দয়াও যাবে না তাহলে!

গাঁদার জন্য খুঁতখুঁতানি হয়তো একটু আছে তার মনে। ঘনরাম যে সে-রকম মানুষ নয় একেবারে, গাঁদাকে নিয়ে কোন রকম কুচিন্তা মনে আসা দূরে থাক এরকম বীভৎস চিন্তার ছায়াটুকু মনে এলে গা যে ঘিন-ঘিন করবে—এটা দয়ার ভালো করে জানা আছে, তবু। পুরুষ সম্পর্কে ওই যে একটা কথা হয় যে মুনিরও মতিভ্রম ঘটে, পুরাণে যার অনেক কাহিনী আছে, সে কথাটা বেচারা একেবারে বাতিল করে দিতে পারে না। আগে থেকে কিছু ভেবেচিন্তে নয়, তিলমাত্র কামনা কখনো স্বপ্নেও জেগেছে বলে নয়, কোন এক অলক্ষুণে মুহূর্তে ঘটনাচক্রে হঠাৎ যদি অঘটন ঘটে যায়!

হ্যাঁ, ওরকম ঘটতে পারে। শুদ্ধ পবিত্র ব্রাহ্মণ গুরুঠাকুর, বিয়ের আগে সেদিন পর্যন্ত যার মনে কোন রকম মন্দ ভাব আসা সত্যসত্যই অসম্ভব ছিল—পুকুরঘাটে তাকে নাইতে দেখে সেই দেবতা মানুষটার মাথাও হঠাৎ বিগড়ে গেল।

দয়া নিজেই ঘনরামকে বলেছে যে, নাঃ, এটা দোষ নয় পুরুষ মানুষের। ভগবান এমনি ধারা বিধান করেছেন, যত পুরুষ আছে সবার জন্য করেছেন, পুরুষেরা করবে কি?

কিন্তু এই খুঁতখুঁতানিটাই সব নয়, আসল কারণ নয়। লক্ষ্মী আছে, শাশুড়ী আছে, গাঁদা নিজে শক্ত তেজী মেয়ে, ঘটনাচক্রে যদি কিছু ঘটে শুধু সেই সুদূর সম্ভাবনাকে খাতির করে দয়া বাপের বাড়ি যাওয়া খারিজ করত না। একটু খুঁতখুঁতানি নিয়েই কবে সটান রওনা দিত।

ঘটনার পর ঘটনা ঘটেছে। শুধু গাঁয়ে নয়, আশেপাশে নয়। শুধু গজেনের পা খোঁড়া হওয়া নয়, লক্ষ্মীর গায়ে কাঁটা দেবার ব্যাপার নয়, মহিমের ঘর ছাড়া নয়! একেবারে বাদ যাক না এই বড় বড় বিশেষ ঘটনাগুলি—ধরা যাক এসবের একটাও ঘটেনি কোনদিন।

সেদিন রাতে হঠাৎ জীবন এলে যা কিছু ঘটেছিল, জীবনের পায়ের জন্য চুন-হলুদ গরম করে ভাত আর মাছের ঝোল রেঁধে খাওয়াতে হয়েছিল—তাও নয় বাতিল হোক।

আজ রাতের মতই সাধারণ ঘটনা কত রকমভাবে যে ঘটে আসছে কতকাল ধরে।

ঘনরাম কি ভালবাসে দয়াকে? জোয়ান চাষার জবর ভালবাসা বুঝি সময় সময় জমির জন্যে নিরেট ভালবাসাকেও ছাড়িয়ে যায়। কথা কইতে কইতে কলকের তামাকটুকু পুড়ে গেলে ধীরে ধীরে সে আরেক চিলুম তামাক সাজে, চোখ তুলে তুলে দীপের আলোয় সে দয়ার দিকে চায়। কলকের আগুনে ফুঁ দিতে দিতে তাকায়। আগুনের মৃদু রাঙা আলোয় এবার যেন ছবির রাজার মুখের মত তেজবীর্যে ভরা মনে হয় শ্রান্ত মুখখানা দয়ার কাছে—চাউনি দেখে তার রোমাঞ্চ হয়।

কিছু বলে দিতে হয় না দয়াকে। তারই নিয়ম রীতি ব্রত উপোসের খাতিরে খাতিরে সাত দিন সাত রাত ঘনরাম তাকে আঙুল দিয়ে ছোঁয়নি। শান্ত চোখে চেয়েছে, অক্লেশে শ্রান্তি নিয়ে ঘুমিয়েছে, তার মধ্যে তিন রাত্রে চোর ধরা পড়ার হাঙ্গামায়, কলেরা রোগে একজন মারা যাওয়ার হাঙ্গামায় আর পল্লী সহায়ক সংঘের বাঁদর কটার হাঙ্গামা বাঁধানোর হাঙ্গামায় উঠে গিয়ে দু-চার ঘণ্টা বাইরেও কাটিয়ে এসেছে।

বাঁচবে না জানা কথা, তবু কোলে নিতে হয় মাই দিতে হয় মানুষ করতে হয় পেটের নতুন বাচ্চাটাকে। কোলের ঘুমন্ত ছেলেটাকে শুইয়ে দেবার ছলেই যেন আলুথালু হয়ে যায় দয়ার পরনের ছেঁড়া কাপড়খানা। কতকাল ঘনরাম তাকে নতুন একটা কাপড় দেয়নি ভেবে হঠাৎ রাগ করতে গিয়ে সে থেমে যায়।

নিজের কাপড়ের কথা ভাবতে গিয়ে এতক্ষণে তার চোখে পড়েছে যে অঘ্রান মাসে ঘনরামের পরনে শুধু একখানি গামছা।

দুধ খায় না, মাছ খায় না, দু-বেলা পেট ভরে খায় না, গায়ে একটু তেল মাখে না—হাড় বেরিয়ে আছে কণ্ঠার—তবু রোগা শিবের মত কী জমকালো চেহারা মানুষটার!

ঘনরাম বলে, জানো, কাগজে নাকি এক খবর বেরিয়েছে মজাদার। কেউ কেউ ফের বলছে ভীষণ খবর। দুপুরবেলা রসিক খুড়োর দাওয়ায় খুব জটলা হয়েছে।

কী খবর?

ছেলেপিলে হওয়া বন্ধ না করলে নাকি মোদের দুর্দশা ঘুচবে না। বড্ড বেশী লোক বেড়ে গেছে দেশে—এত লোকের খাবার নেই। তাই দুর্ভিক্ষে লোক মরে। এটা শুধু খবর এসেছে—এবার নাকি হুকুম হবে—ছেলেমেয়ে হতে পারবে না কারো, কণ্ট্রোল ব্যবস্থা হবে।

হঠাৎ হা-হা করে গলা ছেড়ে হাসে ঘনরাম। হুঁকোটা রেখে দিয়ে এগিয়ে গিয়ে উবু হয়ে বসে দয়ার পা ধরতে যায়।

পায়ে হাত দিও না!

পরে মোকে দশ বার প্রণাম করিস। হাজাটা দেখি।

দয়া আর কথা কয় না। স্বামীকে পায়ে হাত দেবার অবাধ অধিকার দেয়। পায়ের পাতা দুটো তার হাজায় পচে যেতে বসেছে। বর্ষাকালে তো মনে হয়েছিল হাজায় পচা পা দুটো কেটে বাদ দিলেই বুঝি বাঁচা যায়।

প্রদীপ থেকে তেল নিয়ে পায়ে মাখিয়ে দিতে দিতে বলে, এ রোগের চিকিচ্ছে নেই।

জল না লাগালেই সেরে যায়—হয় না।

তাই তো বলছি চিকিচ্ছে নেই।

তা যদি বল তবে কোন্ রোগটার চিকিচ্ছে আছে গরীবের? হাজায় পা শুধু একটু পচে—বনমালীর বৌটা?

স্মরণ করেই চোখ বুঁজে শিউরে ওঠে দয়া—ঘনরামের ভালবাসার চাউনি দেখে যে রোমাঞ্চ হয়েছিল ঠিক তার বিপরীত শিহরণ। আঁতুড়ে পচে যাচ্ছে বনমালীর বৌ,—পচতে পচতে মরে যাবে। আজ দুপুরে দেখতে গিয়েছিল দয়া। পচনধরা দেহটার সে কী দুর্গন্ধ—নিশ্বাস আটকে যায়।

এক রকম ওষুধ আছে—গা ফুঁড়ে দিতে হয়। পুজোর আগে তার দু-পা ভীষণ ফুলিয়ে উঠলে নন্দ ডাক্তার তাকে দিয়েছিল। রবারের মোটকা আঁটা সুন্দর ছোট শিশির ওষুধ। খালি শিশির একটাতে গজেন নস্যি রাখে।

দু-এক টাকায় হবে না—কয়েকটা দিতে হবে—বনমালীর সে সাধ্য নেই। বৌটা মরবে? উপায় কি!

ঘরে ঘরে অমন কত মরছে।

যা কিছু বেচবার ছিল বনমালী বেচে দিয়েছে। অঘোরের সোমথ মেয়েটা মরল কেন অবিরাম জ্বরে? অব্যর্থ ওষুধ আছে, জ্বর সারিয়ে দেয়। কিন্তু ওষুধ থাকলে হবে কি? একটার দামই তিরিশ টাকার মত।

দয়া কিন্তু একটা খুঁত বার করে। বলে, তা কতকটা বটে। কিন্তু মেয়ে বলেই পারল না অঘোর। ছেলের হলে গয়না বেচে ওই ওষুধটাই দিত।

গয়না বেচতে হয়েছে! এমনি চিকিচ্ছের কম খরচ?

বৌয়ের হাতে বালা আছে। ছেলের হলে ওটাও বেচে দিত।

এ কথায় সায় দেয় ঘনরাম। দয়া তার আসল কথার প্রতিবাদ করেনি, সে বলছে অন্য কথা, সংসারে ছেলে আর মেয়ের জীবনের দামের তফাতের কথা। রোগের অব্যর্থ ওষুধ থাকলেও, আপনজনের প্রাণ বাঁচানোর সুনিশ্চিত উপায় আছে জানলেও, অঘোরের মত সাধারণ অবস্থার মানুষ পর্যন্ত সে সুযোগ নিতে পারে না। দশ দিকের টান সামলে চলতে হয় তাকে, পঞ্চাশ-ষাট টাকা চালের দরের মত সব মারাত্মক টান। গরীবের আর কথা কি।

এ নিয়ে তার সঙ্গে মতভেদ নেই দয়ার।

কাল-পরশুই যে ক্ষেতের ধান কাটা শুরু করতে হবে এ বিষয়েও নয়। তাই ধান আর ধান সিজ করা নিয়ে গোলমালের সম্ভাবনার কথা বলতে বলতে তারা ঘুমিয়ে পড়ে।

দুজনেই ভালবাসা ভুলে গেছে!

কত স্থূল নীরস জীবন দয়ার!

জাঁকালো প্রতিবাদসভা হবে ওবেলা, গাঁদার প্রাণে পর্যন্ত উৎসাহের সঞ্চার হয়েছে টের পাওয়া যায়, দয়ার মধ্যে যেন কোন সাড়া নেই। পা টেনে টেনে সে সংসারের কাজ করে যায়, মাঝে মাঝে চিন্তিত ভাবে গাঁদার দিকে তাকায়।

বলে, তোর সভায় গিয়ে কাজ নেই আজ, বুঝলি? হাঙ্গামা হবে। অত মদ্দানি দরকার নেই।

গাঁদা কথা কয় না।

দয়া তার মানে জানে। ফাঁক পেলেই তার চোখ এড়িয়ে গাঁদা সভায় পালাবে, মেয়েদের মধ্যে যতদূর সম্ভব: সামনে এগিয়ে বসবে, মন দিয়ে বক্তৃতা শুনবে যাত্রা শোনার মত! ক্ষমতা থাকলে চ্যালাকাঠ দিয়ে গাঁদার পিঠের চামড়া দয়া তুলে নিত।

লক্ষ্মীর পাত্তা পেয়েই সে ঝেঁঝেঁ ওঠে, কি যে আরম্ভ করেছিস তোরা, মেয়ে-বৌ ঘরে থাকতে দিবি না।

লক্ষ্মী বলে, তোমাকে আবার কে ফুসলাবার ফিকিরে আছে গো ?

গাঁদাকে চোখে চোখে রাখে, দুপুরে পাশে নিয়ে একটু শোয়।

গাঁদা বলে, এই মুখপুড়িটার জন্তে তোমার এত দরদ কেন দিদি ?

দরদ না তোর মাথা। বিগড়ে না যাস দেখতে হবে তো। যার জিনিস সে এসে অনুযোগ দিলে কি বলব ?

ঘাট থেকে আসি বলে গাঁদা যথাসময়ে গিয়ে লক্ষ্মীর আঁচল ধরে। লোচন যাবে না বলেছিল, তার শীত করে জ্বর এসেছে। শেষ মুহূর্তে সেও গুটি-গুটি সভার দিকে রওনা দেয়। জ্বর তো লেগেই আছে, ঘরেও শুয়ে বসে থাকতে হবে, তার চেয়ে ভাল করে কাপড় গায়ে জড়িয়ে সভার এক ধারে গিয়ে বসলেই বা ক্ষতি কি ! বাড়িটা যেন খাঁ খাঁ করে সভার সময় ঘনিয়ে এলে।

দয়া হাই তোলে। পচাটে পা দুটোর দিকে তাকিয়ে সুর করে একটা ছড়া বলার ছলে একটু চোখের জল ফেলে নেয়। খানিকটা পাট টেনে নিয়ে পায়ে জড়িয়ে বাঁধতে আরম্ভ করে।

পায়ে পাট বেঁধে বাচ্চাটাকে কাঁখে তুলে নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে দয়া সভার দিকে রওনা দেয়। হাঁটতে কষ্ট হয় কিন্তু কষ্ট ঘরের কাজের জন্য হাঁটতেও যথেষ্ট হয়।

কৈলাস আর লক্ষ্মীর মাঝখানে দুস্তর বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে মানুষের মনের যুগযুগান্তরের সংস্কার আর কুসংস্কারের স্তূপ, জনতাকে না ডিঙিয়ে তাদের মিলনের উপায় নেই।

কিন্তু শুভর হল কি ? মায়াকে নিয়ে ঘর বাঁধার এত সাধ বুকে নিয়ে তার ঠেকেছে কিসে ? বাপের আছে জমিদারি, ব্যাঙ্কে আছে টাকা, নিজের আছে দামী ডিগ্রি আর মায়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে রাতজাগা প্রেম।

মায়াও যে দিন গুনছে, তার টালবাহানায় তার মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে, এটাও তো স্পষ্ট প্রত্যক্ষ ব্যাপার।

রাত্রে একা ঘরে এক একদিন মায়ার জন্য শুভর ব্যাকুলতা এমন গভীর হয়,

বহু রাত্রি পর্যন্ত নিদারুণ অস্থিরতার পর এমন একটা কষ্টকর হতাশা আর অবসাদ নেমে আসে যে বৈজ্ঞানিক মানুষটা বাইরে গিয়ে আকাশের সবচেয়ে দূরের তারাটির শেষ তারাটির ওপরে যে মহাশূন্যতা আছে তার মানে এবং সচেতন মানুষের জীবনের মানে একসঙ্গে ভাববার চেষ্টা করে।

পরদিন শরীরটা রীতিমত অসুস্থ মনে হয়।

অথচ মায়ার কাছে গিয়ে একবার মুখ খুললেই হয়। একটা দিন ঠিক করে বিয়েটা চুকিয়ে দিলেই হয়।

কিন্তু শুভর ভরসা হয় না হঠাৎ কিছু করতে। নিজে কি করবে জীবনে ঠিক করতে পারেনি। তার মানে তার জীবনের কোন ভিত্তিই এখনো নেই। কোন্ সাহসে সে আরেকটা জীবনকে নিজের জীবনের সঙ্গে জড়াবে? তার যদি এই অনিশ্চয়তা, জীবনে কি করবে মায়া সেটা তো জানাই সম্ভব নয়।

দুজনের ভিত্তিহীন জীবনের এই অনিশ্চয়তা কি অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে কে জানে!

বাসনের কারখানার ঝোঁক তার কেটে গিয়েছে। ওটা এখন দাঁড়িয়ে গিয়েছে একটা ফাঁদে।

মনটা তার বিগড়ে গেছে, পাল্টে গেছে। কেন যে কাঁসার বাসনের কারখানা খোলার ঝোঁক চেপেছিল এখন সে নিজেই বুঝতে পারে না!

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক জ্ঞান কুড়িয়ে নিয়ে এসে অন্তত প্ল্যাসটিকসের বদলে কাঁসার বাসনের কারখানা খোলা! যে কাজ অনেক গেঁয়ো মূর্খ মানুষও পারত!

মনে মনে সে ভাবে, একেই বলে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের অভিশাপ! চোখকান বুঁজে দেশকে ভালবাসার কুসংস্কার। ভেবে নিজেকে ধিক্কার দেয় যে ছি, আমিও এ কুসংস্কার থেকে মুক্ত নই!

মনে হবে এ তো সত্যই তাজ্জব ব্যাপার! স্বাধীন দেশের ছেলেদের সঙ্গে গণতান্ত্রিক পরীক্ষার কম্পিটিশনে এত বড় ডিগ্রি ছিনিয়ে নিয়ে এল, অথচ তার

একবার খেয়াল হল না যে দোষটা জাতীয়তাবাদেরও নয়, দেশকে ভালবাসার কুসংস্কারেরও নয়, কোনদিকে তার কোন সুযোগ না থাকাটাই আসল কথা? তার এত দামী বিদ্যাকে সত্যিকারের কাজে লাগাবার কোন সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা থাকলে তো বলাই যেত যে অন্তত সামনে-দোয়ানো খাঁটি দুধের মত খাঁটি স্বাধীনতা পাওয়া গেছে!

গোরুকে মুখ দিয়ে বিশেষ বিশেষ খাদ্য খাইয়ে আইনসঙ্গত উপায়ে দুধটা জোলো করে বাড়িয়ে নেবার প্রক্রিয়াটা না হয় মার্জনীয় হত।

বাসনের কারখানা সম্পর্কে শুভর বিরাগ টের পেলেও তার মনের কথাটা কেউ জানতে পারেনি। শুভ মুখ ফুটে কিছুই বলেনি কাউকে। কোন্ মুখে বলবে? কি ভাববে সকলে?

লোকসান দিয়ে চালাতে হলেও বাসনের কারখানা বন্ধ করে সকলের কাছে সে খামখেয়ালী বনতে পারে না, হার মানতে পারে না। এটা থাকবে, একটা আনুষঙ্গিক প্রচেষ্টা হিসাবে, সাইড লাইন হিসাবে থাকবে। এবার ভেবেচিন্তে সে এমন কিছুতে হাত দেবে যা তার জীবন ও প্রতিভা দুয়ের সঙ্গেই খাপ খায়। সেটা কি সে জানে না। কবে জানবে তাও জানে না। এই শেষের অনিশ্চয়তাই তাকে পীড়ন করছে সবচেয়ে বেশী।

আজকাল সে ঘন ঘন কলকাতায় যায়। কোনদিন ফিরতে রাত্রি গভীর হয়, কোনদিন রাত্রে ফেরে না। আত্মীয়বন্ধুর বাড়িতে অথবা হোটেলে রাত কাটিয়ে দেয়।

তবে পরদিন কাজ আরম্ভ হওয়ার আগেই নব-শিল্প-মন্দিরে হাজির হয়! বেশীক্ষণ থাক বা না থাক কারখানায় সে প্রতিদিন একবার যায়।

কৈলাসের বেলা বলা যায় যে সে শহরে থাকে বেশী, গাঁয়ে থাকে কম। কিন্তু প্রাণের টানটা তার গাঁয়ের দিকেই বেশী এবং সেটা কেবল লক্ষ্মীর টান নয়।

শুভও উভচরে পরিণত হয়েছে শহর-গাঁয়ের। তার বেলাতেও বলা যায় যে নব-শিল্প মন্দিরের ফাঁদে আটকে থাকতে হলেও প্রাণের টানটা তার শহরের দিকে এবং সেটা কেবল মায়ার টান নয়।

গাড়ি নিয়ে প্রায় রোজ কলকাতায় যায় কিন্তু মায়ার সঙ্গে তার দেখা হয় মাঝে মাঝে। তাও অল্প সময়ের জন্য।

শহরে সে খুঁজে বেড়াচ্ছে নিজের জীবন ও প্রতিভা সার্থক করার সঠিক পথ। তাকে ঘুরতে হয়, নানা লোকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা করতে হয়, নানা সম্ভাবনার বিষয় যতটা পারে যাচাই ও বিবেচনা করতে হয়—নিজের মনে গভীরভাবে চিন্তা করতে হয়। সে যে খুব ব্যস্ত তাতে সন্দেহ নেই।

কিন্তু তাই বলে মায়ার জন্য আরও বেশী সময় যে সে খরচ করতে পারে না তা নয়। জোরালো ইচ্ছা যে জাগে না তাও নয়। আসলে, মায়ার সঙ্গে বেশীক্ষণ কাটালে তার ব্যাকুলতা বেড়ে যায়। ভিতরের অস্থিরতা বেশী রকম কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়।

মায়া কাছে থাকলে প্রতিটি মুহূর্তে সে অনুভব করে যে মায়া আশা করছে, একটু অধীরভাবেই আশা করছে যে এবার সে কিছু করবে। সেটা বড়ই পীড়াদায়ক হয় তার পক্ষে।

সাত দিন দেখা হয়নি দুজনের। রাত্রে হোটেল থেকে সে মায়াকে ফোন করে দেয় যে পরদিন সকালে সে তাদের বাড়িতে চা খেতে যাবে।

কোথা থেকে কথা বলছ? হোটেল? হোটেল কেন?

সকালে কাজ আছে তাই ফিরে গেলাম না।

বেশ তো, কিন্তু হোটেল কেন? এখানে আসতে পারলে না? চলে এস, রাত বেশী হয়নি।

শুভ বিব্রত হয়ে বলে, সকালে এখানে একজনের সঙ্গে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট আছে।

বেশ তো, এখানে খেয়ে তুমি তোমার হোটেলেই ফিরে যেও। খানিকক্ষণ গল্প করা যাবে।

সারা দিন ঘুরেছি, বড় টায়ারড্ ফীল করছি মায়া।

টায়ারড্ ফীল করছ নাকি। আচ্ছা, আমিই আসছি গল্প করতে।

ক্রোধে যে ব্যঙ্গের জন্ম তার সুরটা মায়ার গলায় এত স্পষ্ট হয় যে তার বেয়ে এসে শুভর কানে বাজে।

পথ হয় না। মায়া একরকম এসে পৌঁছেই জিজ্ঞাসা করে, এত ঘুরছ কেন? ফ্যাক্টরির কাজে?

না। বড় একটা প্ল্যান করছি।

মায়া আশ্চর্য হয়ে বলে, ওটা চালাবে না?

চালাব বৈকি। ওটা তো একটা ছোটখাট সামান্য ব্যাপার, একটা একস্‌পেরিমেন্টের মত! আমি আসল যেটা ধরব সেটা হবে আরও বড় সায়ান্টিফিক ব্যাপার। তোমরা বুঝি ভেবেছিলে, আমি সারা জীবন বাসন নিয়ে মেতে থাকব?

মায়া ঠোঁট কামড়ায়। বেশ জোরের সঙ্গেই কামড়ায়।

এমন কিছু করব যা দেশটাকে এগিয়ে দেবে।

কি করবে? এমন কিছুটা কি?

মেজাজ সত্যি ভালো নেই মায়ার। নইলে এমন সুরে কথা কয়। বাসনের কারখানায় সেদিন লক্ষ্মীকে নিয়ে মায়ার মেজাজের কথা শুভর মনে পড়ে যায়।

শুভরও মেজাজ একটু চড়ে যায়।

এখনো ঠিক করিনি কিছু।

কবে ঠিক করবে?

জানি না। তুমি এভাবে কথা বলছ কেন মায়া? আমার প্রবলেমটা বুঝবার চেষ্টা না করেই রাগ করছ। কিছু ঠিক করতে পারছি না কেন, তুমি হয়তো আমায় বলে দিতে পারবে!

মায়া স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বলে, আমি? আমি বুঝিয়ে দিলে তুমি বুঝবে তো, মানবে তো? তোমার আসল প্রবলেম কি জানো? গেঁয়ো জমিদারের ছেলে, বেশী বিদ্যা শিখে মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোমার। কাল সকালেই একজন ব্রেন স্পেশালিস্টের কাছে যেও, তিনি হয়তো তোমার প্রবলেম সলভ করে দিতে পারবেন।

বলে সেদিনকার মত আজও মায়া গটগট করে তাকে যেন চিরতরে ত্যাগ করেই চলে যায়।

কয়েক মিনিট চুপচাপ বসে থেকে শুভ ভাবে, তবে আর কি, হাঙ্গামা তো চুকেই গেল। এবার একটু ড্রিঙ্ক করা যাক।

বয়কে ডেকে সে পেগ আনতে হুকুম দেয়, একটার পর আরেকটা। এবং অনভ্যস্ত দ্রব্যটার প্রভাবে ক্রমে ক্রমে তার মগজে ঘনিয়ে আসে একটা অদ্ভুত রকম মরিয়া ভাব। আরেকটা পেগ গিলে টলতে টলতে হোটেল থেকে বেরিয়ে সে গাড়ি হাঁকিয়ে দেয় ভূদেবের বাড়ির দিকে।

মায়াকে শাসন করতে হবে। বড় বেড়ে গিয়েছে মায়া। জীবনে সে যে বড় কিছু করতে চায় সেটা বুঝবে না, বুঝবে না যে তার মত মানুষ আর দশটা বাজে ছেলের মত শুধু মায়ার জন্যই যাহোক একটা কিছু আঁকড়ে ধরতে পারে না—বিয়েটা কোন রকমে হলেই যেন সব হয়ে গেল।

ভূদেব মুখ থেকে সিগার নামিয়ে বলে, ও এই ব্যাপার! এস এস।

জিজ্ঞাসা করতে হয় না। শুভকে দেখেই সে ব্যাপার টের পায়।

শুভ জড়িয়ে জড়িয়ে বলে, মায়ার সঙ্গে কথা আছে।

ভূদেব সায় দিয়ে বলে, হবে-খন, হবে-খন। খবর পাঠাচ্ছি। ঘরে এসে বোসো।

টেবিলেই দামী বিলাতি বোতল ছিল কিন্তু গেলাস ছিল মোটে একটা! খুব ছোট একটা গেলাস—যাতে ফোঁটা গুনে গুনে ঢেলে ঢেলে ভূদেব ধীরে সুস্থে বোতলের জিনিসটা খায়। না খেয়ে যে উপায় নেই তারই বিরুদ্ধে যেন তার এই সংগ্রাম।

নাঃ খাব না—আচ্ছা, অগত্যা খাচ্ছি—কিন্তু কয়েক ফোঁটার বেশী নয়!

যতক্ষণ না ঘুম আসে। যতক্ষণ না মুক্তি পাই।

এজন্য বয় তাকে বোতল গেলাস আর সোডা সাইফনটি দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে পালিয়ে যায়। সাব আর তাকে ডাকবে না।

ভূদেব তা জানে। তাই নিজেই সে একটা গ্লাস এনে তাতে কয়েক ফোঁটা

বোতলের জিনিসটা ঢেলে অনেকটা সোডা মিশিয়ে ভাবী জামাইয়ের দিকে এগিয়ে দেয়। বলে, তোমার গুরুজন প্রেজুডিস নেই আশা করি!

শুভ বলে, আমি কি কচি খোকা? এতটা সোডা ঢেলে দিলেন?

সরি। ভূদেব বোতল কাত করে শুভর গ্লাসের জলীয় পানীয়ে খানিকটা রঙ এনে দেয়।

আর দেব?

সেই ঘরে একটি শয্যা প্রস্তুত থাকে। ফোঁটা ফোঁটা করে খেলেও যেদিন ভূদেব বিগড়ে গিয়ে বোতলটা গলায় কাত করতে আরম্ভ করে সে রাত্রে হঠাৎ কোন এক সময়ে শয্যাশায়ী হয়ে ঘুমোবার জন্য।

সেই শয্যায় রাতটা কাটে শুভর। মায়ার সঙ্গে ঝগড়া না করেই। নেশা চড়িয়ে তার মরিয়া ভাবটা ঝিমিয়ে দিয়ে ভূদেব যে তাকে কত বড় লজ্জার হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে শুভর সেটা খেয়াল হয় পরদিন সকালে।

বেলায় দেখা হয় মায়ার সঙ্গে।

মায়া বলে, থাক, কৈফিয়ত দিতে হবে না। নতুন কিছুই করনি, এর মানে সবাই বোঝে। এক হিসাবে অবশ্য আমার খুশি হওয়াই উচিত কিন্তু ভালবাসার এসব সেকেলে পচা প্রমাণ সত্যি আমার ভালো লাগে না। খিদে পেয়েছে, খাবাব রেডি, তুমি উপোস করছ কেন সেটা বরং বুঝিয়ে বল। আমিও খিদে নিয়ে উপোস করে চলেছি মনে রেখো কিন্তু।

শুভ জোর দিয়ে বলে, সেজন্য নয়। অত সহজ ব্যাপার হলে আমিই টের পেতাম। তুমি তো জানই আমি কেন ইতস্তত করছি। কি করব ঠিক করিনি, এমন কিছু যদি আমাকে ধরতে হয়—

যদি!

শুভর হাসিটা বড়ই ম্লান দেখিয়েছিল।

যদির জন্য ভাবনা ছিল না। কয়েক রকম করার আছে, তার মধ্যে কোনটা বেছে নেব ঠিক করতে পারছি না—মুশকিলটা তা নয়। ক্রমে ক্রমে

আমার কি মনে হচ্ছে জানো? পলিটিকস ছাড়া আমার বোধ হয় অন্য গতি নেই—কিছুই করার নেই।

মায়া প্রায় চমকে গিয়ে বলেছিল, কেন?

আর কিছুই করার নেই বলে।

বুকটা সত্যিই ধড়াস করে ওঠে মায়ার!

শুভ পলিটিকস করবে শুনে নয়। করুক না যত খুশি পলিটিকস, সে তো ভালো কথাই। কিন্তু পলিটিকস ছাড়া আর কিছুই তার করার নেই, এ ঘোষণা শুনে মায়ার শক লাগে।

আবার কিসের ঝোঁক চাপল তোমার? কোন পলিটিকস করবে ভাবছ? যাতে হয় গুলি খেয়ে নয় ফাঁসি গিয়ে মরতে হয়?

তার মুখ তুলোট কাগজের মত পাংশু দেখায়। দেখে শুভর হয় অন্য প্রতিক্রিয়া। হঠাৎ যেন রসাবেশের জোয়ার আসে তার চিন্তাক্লিষ্ট প্রাণে, খুশির সীমা থাকে না। লক্ষ্মীদের সঙ্গে মায়ার সে মস্ত এক মিল খুঁজে পেয়েছে। হঠাৎ আবিষ্কার করেছে এক আশ্চর্য বাস্তব সত্য! বুদ্ধিসর্বস্ব পরিবারে ও পরিবেশে মানুষ হয়ে থাকলেও মায়া নিজে বুদ্ধিজীবিনী নয়—তারও জীবনের কারবার দেহগত আর হৃদয়গত।

বাপের পয়সা আছে, চাইলে কালকেই সে ভালো চাকরি পাবে—তবু শুভকে অবলম্বন করা ছাড়া তার সত্যিকারের জীবন নেই।

সে হাসিমুখে বলে, ওসব নয়। তুমি তো জানো আমি কি চাই। এমন কিছু ধরব যাতে দেশও এগিয়ে যাবে, আমার কোয়ালিফিকেশনও সার্থক হবে। এ দেশে এরকম কোন পথ বোধ হয় খোলাই নেই আমার জন্য। সেই জন্যই খুঁজে পাচ্ছি না, বোধহয় পাবও না।

তাই বল! তাতে এত বিচলিত হবার কি আছে? আর কিছু না পাও, পলিটিকস করবে! বড় নেতা হয়ে দেশকে পথ দেখিয়ে এগিয়ে নেবে—

শুভর হাসিটা বড় ম্লান দেখায়।

কিন্তু এটা যে অগত্যার পথ হচ্ছে মায়া। আমার জীবনেয় ফার্স্ট চয়েস তো

ওটা নয়। মানুষ হয়েছি এক ভাবে, নিজেকে তৈরী করলাম এক ভাবে—আজ আবার একেবারে অন্য পথ ধরা কি সহজ কথা? আমার কি করতে হবে পলিটিকস ধরতে হলে জানো? যে ভাবে বিজ্ঞান শিখেছি তেমনি ভাবে মেতে যেতে হবে, মনপ্রাণ দিয়ে যাতে ভালবাসতে পারি পলিটিকস, ওটাই যাতে জীবনে সবচেয়ে বড় ওঠে। যে ধাত আমার নয়, সে ধাত গড়ে তুলতে হবে। এ বড় কঠিন কাজ।

অর্থাৎ যদি তোমাকে পলিটিকস করতে হয়, জীবনে অন্য কিছুই থাকবে না?

কি করে থাকবে বল? সে তো শখের ব্যাপার হবে না, ছেলেখেলা হবে না? মনের মত কাজ পেলেও কিছু কিছু পলিটিক্যাল ওয়ার্ক করতাম, কিন্তু সেটা হত আলাদা ব্যাপার। শুধু পলিটিকস সম্বল করলে বিজ্ঞান শেখার মত শিখতে হবে, নিজেকে বদলে নিতে হবে।

কথাটা বলা কঠিন নয়। সজ্ঞানে নিজেকে ফাঁকি দেবার মানুষ সে নয়। বিজ্ঞান সে শিখেছে সাধনার মতই, রাজনীতি করতে নামলে সেটাও সাধনা করে তুলতে হবে বৈকি। ঝঞ্ঝাট এড়িয়ে জীবনটা সহজ করে মেনে নিতে পারলে তার আর সমস্যা কি থাকত!

বাসনের কারখানা করেছে, আরও কতদিকে কত কিছু করার আছে—কিন্তু নিজেকে ফাঁকি দেওয়া হবে না এমন কিছু খুঁজছে বলেই তো মুশকিল!

মায়ার মুখও তাই ম্লান হয়ে যায়!

মায়া অবশ্য হাল ছাড়ে না। দু-দিন পরেই শুভকে বাড়িতে ডেকে বলে, বাবার সঙ্গে পরামর্শ কর।

তাতে লাভ কি হবে?

পরামর্শ করলে কখনো ক্ষতি হয় না।

পরামর্শ যে তর্ক হয়ে দাঁড়ায় এবং তর্ক থেকে কলহ আর মনান্তর ঘটে থাকে, এটা মায়া ভুলে যায় একেবারেই। কথা শুরু হতে না হতে ভূদেব গভীর আপসোসের সঙ্গে বলে, একটা সাধারণ লক্ষণ দাঁড়িয়েছে তোমাদের মত ছেলেদের। ছাঁকা পলিটিকস ছাড়া জীবনে করার আর কিছুই খুঁজে পাও না।

তার মানে কি শুনবে? সমাজে নিজেদের পজিশন তোমরা জানো না। নিজেদের কর্তব্য আর দায়িত্ব ভুলে তোমরা জীবনে রোমান্স আর রোমাঞ্চ আনতে ব্যাকুল।

কথাটা তো বুঝতে পারছি না! রোমান্স আর রোমাঞ্চের জন্যে আমরা পলিটিকস করি?

মায়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায়। ব্যঙ্গের সুরটা তার কানে বাজে।

ভূদেব চশমাটা খুলে রুমালে মুছে নেয়।

শান্তভাবেই বলে, ভ্যাখো, অ্যাজ এ ক্লাশ আমরা উচ্চ-শিক্ষিত মানুষেরাই হলাম দেশের সমাজের সেরা মানুষ। আমরাই গোড়া থেকে এদেশে নতুন চিন্তা নতুন কালচার নতুন সভ্যতা গড়ার কাজে নেতৃত্ব দিয়েছি। পলিটিকস বাদ দিলে আমাদের চলে না—আমাদের মধ্যে কেউ যদি পলিটিকস করে সেটাও দোষের কিছু নয়! কিন্তু অন্যান্য দিকেও তো আমাদের নেতৃত্ব দিতে হবে, পথ দেখাতে হবে। আমরাই সেটা পারি। কারণ একমাত্র আমাদের সে চেতনা আছে, সেই দরকারী একনমিক ফ্রিডমও আছে।

একনমিক ফ্রিডম? আমাদের? আমরা বুদ্ধি বেচে ক্যাপিটালিস্টদের মুনাকার একটু অংশ ভিক্ষা পাই, স্রেফ পয়সার জন্য আমরা দর্শন-বিজ্ঞানে পণ্ডিত হই—

ছি ছি শুভ, তোমার মধ্যে এমনি গোঁড়ামি? পয়সা? দুশো বছর ধরে আমরা কি নতুন কালচার সৃষ্টি করে এসেছি পয়সার জন্য? পয়সার জন্য শিল্প সাহিত্য জ্ঞান বিজ্ঞান আর রাজনীতি সব দিকে নেতৃত্ব দিয়েছি, নতুন সভ্যতা গড়েছি? পয়সা আমাদের কাছে বড় ছিল না শুভ, আজও নেই। আমরা পয়সা চাই মানুষের মত বাঁচার জন্য। নেতৃত্ব দিতে হলে মাথা ঠিক থাকা চাই, সুস্থ জীবন চাই। জীবনে যদি আনন্দ না থাকে, অবসর না থাকে, পেটের চিন্তাতেই দিন কেটে যায়—নতুন কিছু সৃষ্টি করতে পারে মানুষ?

নতুন সৃষ্টি পেটের দরকার থেকেই আসে।

পেটের দরকার থেকে আসে—পেটের চিন্তায় মেতে থাকলে আসে না।

শিক্ষার সঙ্গে ওই স্বচ্ছলতাটুকু পেয়েছি বলেই আমরা সব বিষয়ে এগিয়ে যেতে পেরেছি।

দেশকে পিছনে রেখে ওরকম এগোনোয় কতটুকু দাম? আরামে থাকব, জীবনটা ভোগ করব—এটাই আমাদের কাছে প্রধান কথা। অন্য সব আনুষঙ্গিক।

ভূদেব একটু চটে বলে, শুভ, দেশে স্বাধীনতার কামনা আর চেতনাও আমরা সৃষ্টি করেছি, স্বাধীনতার আন্দোলন গড়েছি। মিছেই তুমি দেশ-বিদেশে জ্ঞান কুড়িয়েছ, সংস্কার কাটিয়ে উঠতে পারনি। দেশটা গরীব কিনা তোমার কাছে, তাই গরীব না হওয়াটা অপরাধ! কত আর পয়সার মালিক আমরা! মনে রেখো, রাজা মহারাজা কোটিপতি মাড়োয়ারীর জীবন দেখে আমরাই কেবল নাক সিটকোতে পারি।

সে তো ওদেরি দয়ায়!

মায়া বিরক্ত হয়ে বলে, কী বলছ তুমি শুভ?

শুভ বলে, আমরা যা করেছি সব আপোসে—সুবিধা পেয়েছি বলে। তার দাম থাকতে পারে কিন্তু সেজন্য অ্যাজ এ ক্লাশ নিজেদের সেরা মানুষ ভাববার ক্ষমতা আমার নেই।

তুমি নিজেও তো আপোসের পথেই কিছু করতে চাইছ?

চাইছি বৈকি! আমি ভালো রোজগার চাই, জীবনে হাসি আনন্দ সুখ চাই, সেই সঙ্গে দেশকে এগিয়েও নিয়ে যেতে চাই। নিজেকে আমি তাই মানুষ ভাবি—মহাপুরুষ ভাবার ধাপ্পাবাজি আমার নেই।

শুভ! বাবাকে তুমি ধাপ্পাবাজ বলতে পারলে?

না, তা বলিনি।—শুভ জোর দিয়ে বলে—উনি ধাপ্পা দেননি, নিজের বিশ্বাসমত কথা বলেছেন! আমি বলছি আমার কথা।

পাইপটা সামনেই ছিল, ধরিয়ে নিয়ে ভূদেব বলে, কিছুই বোঝা গেল না তোমার বিশ্বাসের ব্যাপারটা! তুমি নিজের জীবনেও ওলোট-পালোট চাও না, দেশেও ওলোট-পালোট ঘটাতে চাও না—অথচ যা করা যায় তাও

তোমার পছন্দ নয়। এক হিসেবে তোমাকে বয়াটে বলাই উচিত—তুমি সিরিয়াস বয়াটে।

মায়া ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি শুভকে মিনতি জানায়, শুভ! তুমি মুখ খুলো না। আর আলোচনায় কাজ নেই।

শুভ বলে, বেশ। আমি চুপ করলাম।

মায়া ভাবে, আলোচনায় কথা-কাটাকাটিই সার হল। শুভকে না ডাকলেই ভালো হত!

শুভও তাই ভেবেছিল। বারতলা ফিরতে ফিরতে মনের জ্বালা জুড়িয়ে এলে তার খেয়াল হয় যে ভূদেবের সঙ্গে কথা-কাটাকাটি নিছক লোকসান দাঁড়ায়নি। একটা লাভ হয়েছে। একটা দামী কথা এসেছে এই আলোচনা থেকে।

সে তার বক্তব্য ভূদেবকে বুঝিয়ে দিতে পারেনি। ভূদেবের কথাও তার কাছে ঠেকেছে যুক্তিহীন, অর্থহীন! কী অদ্ভুত ব্যাপার এটা? শিক্ষাদীক্ষা রুচিরীতি নীতি আর জীবনের মূল্যবোধ ইত্যাদির হিসাবে নিজের শিক্ষিত জমিদার বাপের চেয়ে ভূদেব বরং তার ঢের বেশী নিকট মানুষ, আপন মানুষ। বিলাতে ভূদেবের চেয়ে সে বিজ্ঞান খানিকটা বেশী শিখেছে আর ফিরবার পথে বিজ্ঞানের উন্নতি দেখে আসবার জন্য মাসখানেক সোভিয়েট দেশটা বেড়িয়ে এসেছে। এ ছাড়া এমন কি দুস্তর ব্যবধান আছে তাদের মধ্যে? দু-দিন আগেও ঝোঁকের মাথায় ড্রিঙ্ক করে হঠাৎ গিয়ে হাজির হওয়ার পর প্রমাণ হয়ে গিয়েছে তারা আত্মার আত্মীয়, পিতাপুত্রের মত আপন!

তাদের আসল পার্থক্য শুধু এইটুকু যে তারা এক পুরুষ আগের আর এক পুরুষ পরের মানুষ।

কিন্তু আজ তো জীবনের অতীত ভবিষ্যৎ আদর্শ আর উদ্দেশ্য নিয়ে কথা বলতে গিয়ে প্রায় স্পষ্টই দেখা গেল তারা দু-জগতের মানুষ! নিদারুণ অমিল তাদের চেতনায়। বাস্তব জীবন নিয়ে পরস্পরের কথা তারা বুঝতে পারে না।

শুভর মনে হয় সে সূত্র পেয়ে গেছে—তার সব সমস্যার সমাধানের সূত্র। গাছের ফলটা উপরে না উঠে মাটিতে পড়ল কেন প্রশ্ন জাগার মধ্যে যেমন

একজনের জুটেছিল বিরাট এক সমাধানের সূত্র, ভূদেব আর তার বোঝা-পড়ার খেই কেন হারিয়ে গেছে এই প্রশ্নের মধ্যে সে খুঁজে পায়ে তার সমস্যা বুঝতে পারার সূত্র।

মীমাংসা খুঁজে পাবে কিনা এখন তার জানা নেই। তা হোক, ব্যাপারটা বুঝতে পারলে এই অনিশ্চয়তা আর ব্যাকুলতা থেকে তো সে রেহাই পাবে। জীবনের বিরাট সমারোহ চারিদিকে, তার মধ্যে কেন নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছে না, যা চায় তা অসাধারণ কিছু না হলেও বাস্তবে কেন তার হদিস পাচ্ছে না, এটা না বোঝা পর্যন্ত তার শান্তি নেই।

আর একটা লাভ হয়েছে আজ এবং সেটা তুচ্ছ হওয়া উচিত নয় কোন কারণেই। অথচ হিসাবটা মনেও আসে না শুভর! মায়ার হৃদয়মনের অজানা পরিচয় জেনে ফেলে আজই সে অপূর্ব রসালো পুলক বোধ করেছিল কয়েক ঘণ্টা আগে, মায়াকে নতুন করে ভালবাসার মত। মায়ার জন্য টানটা কেমন শুকিয়ে হয়ে উঠেছিল দড়ির বাঁধনের মত, ছাতি-ফাটা তৃষ্ণার সময় হঠাৎ এক গেলাস জল খেতে পেলে যেমন লাগে তেমনি সুখ আর আরাম সে পেয়েছিল নিবিড় মমতার অনুভূতিতে মনটা সরস হয়ে ওঠায়।

এই রসটুকু প্রেমের আসল বস্তু, জীবনে বাস্তব কাব্যের মূল উৎপাদন। এটা সত্যই অমূল্য লাভ, কিন্তু এ রসের স্বাদটা কখন যে মন থেকে চলে গেছে!

শুভ সোজা বাড়ির দিকে রওনা হয়। টানটা বাড়ির নয়, কয়েকখানা বইয়ের। দশ-বার দিন বই ক-খানা কিনেছিল, নানা ঝঞ্ঝাটে পড়া হয়নি। বিশেষভাবে দু-খানা বই পড়ার জোরালো তাগিদ সে বোধ করছে। ভূদেব আর তার মত ও চেতনার অমিলটা কি আর কেন বুঝতে হয়তো সাহায্য হবে।

বইয়ের টান, নিজের ঘরে একান্তে মন দিয়ে বই পড়ার তাগিদ, মায়ার জন্য নাড়ীর টান ভুলিয়ে দিয়েছে।

বারতলা লেভেল ক্রসিং-এ সে যখন পৌঁছল, তখনও খানিকটা বেলা অবশিষ্ট আছে। ট্রেন আসবে বলে লেভেল ক্রসিং-এর গেট বন্ধ ছিল। শেষবেলার

সোনালী আলোয় স্টেশনের কাছে মাঠে বড় জমায়েত দেখে সেইখানে গাড়ি রেখে শুভ পায়ে হেঁটে এগিয়ে যায়।

সে আশ্চর্য হয়ে গেছে। এ এলাকায় এত বড় মিটিং হচ্ছে অথচ তাকে খবরটাও জানানো হয়নি! বেলা পর্যন্ত সে কারখানায় ছিল, তার পরে কি বিশেষ কিছু ঘটেছে এবং অল্প সময়ের মধ্যে এত লোকের জমায়েত সম্ভব হয়েছে?

সভায় বক্তৃতা সাময়িকভাবে বন্ধ ছিল, জমায়েতের কলরব কানে আসছিল। কয়েক পা এগোতে এগোতে বক্তৃতা শুরু হয়, মাইকের আওয়াজে বক্তৃতা কানে ভেসে আসে। এত অল্প সময়ের মধ্যে সদর থেকে মাইক আনিয়ে সভা করা সহজ ব্যাপার নয়, তবু শুভ ভাবে যে বিশেষ চেষ্টায় এই কঠিন কাজটাই সম্ভব করা হয়েছে। অসম্ভব সম্ভব হতে পারে কিন্তু তাকে না জানিয়ে আগে থেকে সভার আয়োজন করা হয়েছে এটা ভাবতে পারে না শুভ।

বক্তৃতার কথাগুলি স্পষ্ট হয়, বক্তাকেও চেনা যায়। নরেন সাঁতরা বক্তৃতা দিচ্ছে—এই সেদিন যার বিয়ে হল।

জগদীশের নাম আর প্রায় কুৎসিত গালাগালির মত একটা মন্তব্য কানে আসায় শুভ থমকে দাঁড়ায়।

এই কি তবে তাকে না জানিয়ে সভা ডাকার কারণ? এ সভায় তার বাপের মুণ্ডপাত করা হবে?

কিন্তু ইতিমধ্যে কি অপরাধ করেছে জগদীশ যে সভা ডেকে তাকে গাল দেওয়া দরকার হল?

বে-আইনী অত্যাচার করে না বলেই তার বাবাকে লোকে ভালো বলবে এ আশা শুভ করে না। জমিদারের অত্যন্ত আইনসঙ্গত কাজকর্ম আদায়পত্রটাই প্রজাদের উপর অত্যাচার—এই প্রথাটাই অতি মন্দ। কিন্তু এতদিন দরকার হয়নি, আজ কেন সভা ডেকে জগদীশকে গাল দেওয়ার দরকার পড়ল? ইতিমধ্যে বিশেষ কোন অন্যায় সে করছে বলে তো শুভ জানে না!

কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করে শুভ। এ সভায় যাওয়া কি গোয়ার্তুমি হবে না তার পক্ষে?

মন স্থির করে দৃঢ়পদে সে এগিয়ে যায়। হোক গোয়াতুর্মি, কাছে গিয়ে সে স্পষ্টভাবে শুনবে কি বলা হয় জগদীশের নামে। নন্দ বা অন্যের কাছে সভার বিবরণ সে জানতে পারবে—কিন্তু ঠিক কি ভাষায় কি ভাবে লোকে জগদীশের সমালোচনা করছে সেটা তাকে কেউ জানাবে না।

এগিয়ে গিয়ে সভার প্রান্তে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বক্তৃতার কথা থেকে সে টের পায় সে সভাটা জগদীশের বিরুদ্ধে নয়। জোর করে কমদামে ধান সীজ করার প্রতিবাদে সভা ডাকা হয়েছে।

শুভকে চিনতে পারায় সভার প্রান্তে একটু চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। একটু পরেই মঞ্চ থেকে নন্দ তার কাছ এগিয়ে আসে ; বলে, তুমি এ সভায় থেক না শুভ।

শুভ বলে, সে তো বুঝলাম। কিন্তু ধান সীজের ব্যাপারে বাবাকে জড়ানো হচ্ছে কেন ? তিনি তো এর মধ্যে নেই !

নন্দ বলে, ওদের সুযোগ-সুবিধা করে দিচ্ছেন, চাষীর স্বার্থ দেখছেন না। গোপালের ধান হয় বিশ মণ, ত্রিশ মণ ধরা হল। বলা হল, দশ মণ লুকিয়ে ফেলেছে। ভূতনাথ জেনেশুনে তাতে সায় দিলে—গোপালের কথা টিঁকল না।

বাবা হয়তো এর কিছুই জানেন না।

তুমি বুঝতে পারছ না। নায়েব গোমস্তা কর্মচারী—তারা যাই করুক সেজন্য লোকে জগদীশবাবুকেই দায়ী করবে। এরকম অবশ্য ঘটেছে দু-একবার —আসল যা করার ওরাই করছে, কিন্তু তোমাদের লোক সঙ্গে থাকে এটা তো দেখছে সবাই। বলতে বলতে হয়তো জগদীশবাবুর নামে কিছু বলে বসবে। তোমার না থাকাই ভালো।

শুভ গম্ভীর মুখে বলে, আমি বলব—নরেনের পরেই বলব।

সেটা কি ভালো হবে ?

নিশ্চয় ভালো হবে !

শুভকে মঞ্চে উঠতে দেখে সভায় সাড়া পড়ে যায়, একটা কলরব সৃষ্টি হয়। সে বলার জন্য উঠে দাঁড়ালে কিন্তু একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে যায় চারিদিক।

এ সভায় তার উপস্থিতি খাপছাড়া বলেই সে কি বলে শোনার জন্ম সকলের বিশেষ আগ্রহ হওয়া অবশ্য খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার।

শুভ বলে যে সে বক্তৃতা করতে দাঁড়ায়নি, তার শুধু একটি ঘোষণা আছে। তার বাবার বিরুদ্ধে নালিশ তার কানে গিয়েছে। তার বিশ্বাস, তার বাবার কোন কর্মচারী যদি অন্যায় করে থাকে সেটা তার বাবার অজান্তেই ঘটেছে, সভায় গাল না দিয়ে তার বাবাকে জানালেই বোধ হয় প্রতিকার হত। যাই হোক, চাষীদের স্বার্থ দেখা হবে এ ব্যবস্থা করার ক্ষমতা তার নেই কিন্তু সে কথা দিচ্ছে তাদের লোকেরা যাতে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকে সে তার ব্যবস্থা করবে।

শুভ আশা করেছিল, তার ঘোষণা শুনে সভায় অন্তত একটু সাড়া পড়বে। কিন্তু যেমন চুপ করে সবাই তার কথা শোনে, তার বলা শেষ হবার পরেও তেমনি চুপ করেই থাকে।

জমিদার অন্যায় করবে না, এ ঘোষণার কোন মূল্যই যেন তাদের কাছে নেই।

শুভ নীরবে সভা-মঞ্চ ছেড়ে যায়। সে স্পষ্টই অনুভব করে যে হাজার আবেগ আর আন্তরিকতা নিয়ে প্রাণপণে চেষ্টা করলেও অন্তত আজ এখন এই মানুষগুলির সঙ্গে আত্মীয়তা জমাতে পারবে না। জগদীশ মাঝখানে এক দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি করে রেখেছে।

বাড়ি পৌছতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। মন্দিরে সন্ধ্যারতির ঢাকঢোল কাঁসরঘণ্টা প্রচণ্ড শব্দে বাজছিল। শুভর মনে হয় এ শব্দ উন্মাদনা সৃষ্টির জন্য তোলা হয় না। দুঃখী কাতর মানুষের নিশ্বাস আর কাতরানিতে অপবিত্র পৃথিবীর বায়ু শুদ্ধ করে নেবার জন্য এত আওয়াজ দরকার হয়।

জগদীশ মন্দিরে ছিল। শুভ বাড়ি ফিরতেই তার কাছে খবর পৌছয়। তার হুকুম জারি করা আছে শুভ বাড়ি ফিরলেই তাকে জানাতে হবে। যেখান থেকে যখন বাড়ি ফিরুক।

কোষ্ঠী বলে, এ বছর বড় রকম একটা ফাঁড়া আছে শুভর। ফাঁড়া ঠেকাবার

জন্যে যা কিছু করা দরকার সবই অবশ্য করা হয়েছে। ফাঁড়া একেবারে বাতিল করার কোন প্রক্রিয়া জগদীশ করতে দেয়নি—তার বিশ্বাস, দৈব একেবারে খারিজ করা যায় না। বিপদ একটা শুভর ঘটবেই। মানুষের সাধ্য নেই ঠেকায়। তবে, বিপদের রকমটা মানুষ বদলে দিতে পারে। ছোটখাট অসুখ-বিসুখ হোঁচট খাওয়া আঙুল কাটার উপর দিয়ে কঠিন ফাঁড়া উতরে যাওয়া যায়। তবু একটা স্থায়ী আতঙ্ক আছে জগদীশের। বলা তো যায় না! যা কিছু করার করিয়েছে সে নিজে, শুভকে দিয়ে কিছুই করানো যায়নি।

ছেলেবেলা করানো গিয়েছিল বছর বছর। কলেজে পড়তে শুরু করার পর কী তাড়াতাড়িই যে অবিশ্বাসী নাস্তিক বনে গেছে ছেলেটা!

বাইরে বেরিয়ে সুস্থ দেহে শুভ বাড়ি ফিরেছে, এইটুকুই জগদীশ শুনতে চায়।

দৈবের অবশ্য ঘরে বাইরে নেই। লোহার ঘরেও দৈব সাপ হয়ে এসে মানুষকে কামড়ায়। তবে, বাইরে চোখের আড়ালে কিছু ঘটেনি এইটুকু জানার জন্য জগদীশের ব্যাকুলতা।

সন্ধ্যা-পূজার পর জগদীশ নিজের ঘরে শুদ্ধ হয়ে পবিত্র সোমরসের পাত্রটি নিয়ে বসে। জিনিসটা বিলাতী বটে কিন্তু ঢাকা-দেওয়া পাথরের পাত্রে ঢেলে শুদ্ধ করে নেওয়া হয়। যৌবনের উদ্দাম ভোগের এটা জের। কয়েকবার আনুষঙ্গিক অসুখে ভুগেছে। শরীরে আর সাধ্য নেই। সন্ধ্যার পর ঘরে বসেই পান করতে করতে একটু সতেজ বোধ করা, একটু আবেশ-উদ্দীপনা লাভ করা, এর বেশী আর কিছু চায় না জগদীশ। সাধারণভাবে খারাপ শরীরটা আজ একটু বেশী খারাপ ছিল জগদীশের। শ্বেত পাথরের গেলাসে তাই একটু ঘন ঘন ঢেলে বেশী পান করা হয়ে যায় কম সময়ের মধ্যে।

এ সময় জীবন দেখা করতে চাওয়ায় সে বড়ই বিরক্তি বোধ করে।

দেবেনও প্রার্থনা নিয়েই আসে। কিন্তু একটা পাত্রে একটু সোমরস ঢেলে এগিয়ে দিলে সে কৃতার্থ হয়ে পান করে। তাকে সহ্য করা যায়। জীবন এমন ভাব করে যে খাওয়া দূরে থাক জিনিসটার গন্ধ নাকে যাওয়ায় যেন শুধু

তার বমি আসছে না; সারা জীবন অহিংস দেশসেবার পুণ্যটা পর্যন্ত যেন পচে যাচ্ছে !

জীবনের এলোমেলো বেশ, শুকনো শীর্ণ মুখ দেখে জগদীশের আরও খারাপ লাগে। মনে হয় একটা ভিখারী যেন তার উদারতা আর আত্মীয়তার সুযোগ নিয়ে তার বিশেষ বিশ্রামের ঘরের মধ্যে ঢুকেছে।

জীবন ভূমিকা পর্যন্ত না করে বলে, আমায় কিছু টাকা দিতে হবে জগদীশ। আমার বড় বিপদ।

তোমার বিপদ তো লেগেই আছে !

তার কথা শুনে জীবন সখেদে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। ধাতস্থ হবার চেষ্টা করে বলে, আমি তোমাকে কম পাইয়ে দিইনি জগদীশ। আমি জেলে গিয়েছি। আমার নামে তুমি এটায় ওটায় অনেক টাকা করেছ। আজ দুদিনের জন্য একটু বেতাল হয়েছি বলে তোমার কি এরকম ব্যবহার করা উচিত ?

তুমি যখন যেটুকু করেছ তার দামের চেয়ে বেশী দিয়েছি তোমায়।

তুমি দশ হাজার মেরেছ, আমায় দিয়েছ দুশো টাকা।

অন্যলোক পঞ্চাশ কি বড়জোর একশো পেত।

জগদীশ শ্বেত পাথরের সুন্দর গ্লাসটি মুখে তোলে। গড়গড়ার নলটা ফেলে দিয়ে সারা দিন পরে এবার একটা সিগারেট ধরায়। জীবন পকেট থেকে বিড়ি আর দেশলাই বার করে। বিড়ি বার করে ধরাতে দেরি করছে দেখে জগদীশ সিগারেটের কেসটা তার দিকে এগিয়ে দেয়।

সিগারেট ধরিয়ে জীবন বলে, ছাখো, আমাদের অনেককে ফাঁকি দিয়ে কজন দাঁড়িয়ে গেছে। দুদিনের জন্য একটু বেতাল হয়েছি, আমিও আবার উঠব জগদীশ। আমাদের বাদ দিয়ে এরা ক-দিন চালাতে পারবে ?—দেশের লোক কমিউনিস্ট হয়ে যাচ্ছে। আমি ঠিক উঠব দেখো, আমাকে আবার তোমার দরকার হবে। এভাবে আমাকে তাচ্ছিল্য কোরো না !

জগদীশ বলে, তাচ্ছিল্য নয় হে, তুমি বুঝতে পারছ না। তোমার দাঁড়াবার জন্য দরকার হলে হাজার দু-হাজার দিতে পারি, সে দেওয়াটা সার্থক হবে।

আজ তোমার ছেলের জ্বর, কাল মেয়ের বিয়ে এসব ব্যাপারে আমি আর একটি পয়সাও দিতে পারব না।

জীবন আবার সখেদে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। বিড়ির বদলে জগদীশের সিগারেট টানতে থাকায় দীর্ঘনিশ্বাসটা বড়ই ধোঁয়াটে মনে হয় তার।

জগদীশ আবার বলে, আমার কথাও তুমি বুঝবে না। আমারও সেদিন নেই। ছেলেটাকে নিয়ে পড়েছি মহা ফ্যাসাদে। কত আশা করেছিলাম কিন্তু ওর পেছনে এখনও কেবল টাকাই ঢালতে হচ্ছে। বেশী বিদ্যা শিখে ছেলেই বোধ হয় ডোবাবে আমাকে এবার!

মনে জ্বালা ধরেছিল। জীবন তাই বলে বসে, তোমার ছেলের কথা আর বোলো না। ছেলেকে তুমি মানুষ করনি। সভায় দাঁড়িয়ে তোমায় গালাগালি দিয়ে বক্তৃতা করে।

বলেই জীবন অবশ্য অনুতাপ করে মনে মনে। যার কাছে চাকরি করে দু-পয়সা কামাচ্ছে, জগদীশকে একটু আঘাত দেবার জন্য তার নামে এভাবে বলা উচিত হয়নি। বাপে ব্যাটায় ঝগড়া হলে শুভ নিশ্চয় জানবে কার কাছে সে কথাটা শুনেছে এবং অবশ্যই তাকে কারখানা থেকে দূর করে তাড়িয়ে দেবে!

মেঘ-ঢাকা আকাশের মত থমথমে মুখে জগদীশ পাথরের পাত্র থেকে পাথরের গেলাসে অনেকটা রস ঢেলে গিলে ফেলে—এবার শুদ্ধকরা জল না মিশিয়েই।

কী বলছ তুমি পাগলের মত? সভায় দাঁড়িয়ে শুভ আমায় গালাগালি করে?

যাক গে যাক গে। যেতে দাও। ছেলেমানুষ তো!

জগদীশ চোখ পাকিয়ে বলে, জীবন, আমার সঙ্গে ছেলেখেলা কোরো না। একটু কাবু হয়েছি, কিন্তু আমি এখনো মরিনি। কবে কোথায় কোন সভায় শুভ আমাকে গাল দিয়েছে তোমায় বলতে হবে। যদি সত্যি হয় তোমার কোন ভয় নেই। সত্যি না হলে—

জীবন পড়ে যায় মহা বিপদে। কিন্তু মিছেই তো সে সারা জীবন ত্যাগের রাজনীতি করেনি! ভেবেচিন্তে বলে, ছাখো, গালাগালি করেছে মানে কি

আর তোমাকে বজ্জাত হারামজাদা বলেছে ? এমনভাবে বলেছে যাতে দশজনের কাছে তুমি হীন হয়ে যাও—

কোন সভায় বলেছে ?

জীবন মরিয়া হয়ে বলে, আজকেও বলেছে। স্টেশনের কাছে যে সভা ছিল সেখানে। অন্যেরা সোজাসুজি তোমায় গাল দিয়েছে, শুভ একটু ঘুরিয়ে বলেছে।

জগদীশ হাঁকে, গদা !

গদা নীরবে এসে দাঁড়ায়।

ভূতনাথ ফিরেছে ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। বাড়ি গেছেন।

ডেকে আন তো।

ভূতনাথ সভায় গিয়েছিল। জরুরী না হলে সন্ধ্যার পর জগদীশকে কাজের কথা বলে বিরক্ত করা বারণ। সকালে সভার রিপোর্ট দিলেই চলবে জেনে সে বাড়ি চলে গিয়েছিল। তৃতীয়বার একটি বয়স্থা মানে প্রায় পনের বছর বয়সের একটি মেয়েকে সে বিয়ে করেছে মাস খানেক আগে। মেয়েটি একটু কালো হলেও ভূতনাথের জমাট নেশা।

ভূতনাথের আসতে প্রায় মিনিট কুড়ি সময় লাগে।

ইতিমধ্যে জীবন বলতে গিয়েছিল, অত খেয়ো না। বলছিলাম কি, আজ রাতে মাথা গরম না করে—

তুমি চুপ কর। আমি কি মাতাল ? আমি সাধক আমার মাথা অত সহজে গরম হয় না।

তারপর জীবন আর মুখ খোলেনি।

ভূতনাথ হন্তদন্ত হয়ে এসে বলে, আজ্ঞে ডেকেছেন ?

মিটিংএ গিয়েছিলে ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

শুভ মিটিং-এ বক্তৃতা দিয়েছে ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

ব্যাপার ঠিক বুঝতে পারে না। প্রৌঢ় ভূতনাথের বুকটা নানা আশঙ্কায় ধড়ফড় করে।

জগদীশ হাতের সিগারেটটা অ্যাশ-ট্রেতে নামিয়ে রেখে পাথরের গেলাসটা আর একবার মুখে ঠেকিয়ে কেস থেকে নতুন একটা সিগারেট নিয়ে ধরিয়ে বলে ইনি বলছেন শুভ নাকি মিটিং-এ আমার নামে যা-তা বলেছে।

ভূতনাথ কথা কয় না। সে পাকা লোক, সে জানে শুভর মত ছেলের সম্পর্কে জগদীশের মত বাপের এরকম প্রশ্নের জবাব চট করে দিতে নেই। জগদীশ অসহিষ্ণু হয়ে বলে, কি হল, চুপ করে রইলে যে?

আজ্ঞে—

জগদীশ বোমার গর্জনে কেটে পড়ে, ইয়ার্কি দিও না ভূতনাথ, কী বলেছে শুভ?

ভূতনাথ ধীরে ধীরে হাত জোড় করে বলে, ছোটবাবুর নামে কিছু বলা উচিত নয়, আপনি হুকুম দিলেন তাই না বলেও উপায় নেই। ছোটবাবু বললেন, আপনি যদি অন্যায় করেই থাকেন, আপনাকে শাসন করে দিবেন, ভবিষ্যতে আপনি যাতে কিছু না করেন তার ব্যবস্থা করবেন। বলব কি বাবু, ছোটবাবু ওভাবে সভায় দাঁড়িয়ে বলতে পারেন আপনার নামে—

পাথরের গেলাসে আরও খানিকটা রস ঢেলেছিল জগদীশ, গেলাস মুখে না তুলে সে মাথা হেঁট করে।

বলে, আচ্ছা, তুমি যাও ভূতনাথ।

ভূতনাথ চলে যাবার পর জগদীশ শোবার ঘরে সিন্দুক খোলে।

সাবিত্রী বলে, কাকে দেবে গো টাকা?

করুণভাবে মৃদু প্রশ্নের স্বরে বলে। জগদীশ পাছে চটে যায়।

জীবনকে কয়েকটা টাকা দেব।

তুমি খালি ওকেই টাকা দাও।

ক্ষীণ অভিমান জমতে জমতে মিলিয়ে যায় শুভর মার। জগদীশ কথাও বলে না।

জীবনের হাতে পঞ্চাশ টাকার নোট দিয়ে জগদীশ বলে, আচ্ছা তুমি যাও।

নির্জন ঘরে কয়েক মিনিট জগদীশ চুপচাপ বসে থাকে। রসভরা পাথরের গেলাস মুখের মুখের কাছাকাছি নিয়েও নামিয়ে রাখে। নাঃ, আগে কর্তব্য পালন করতে হবে।

গটগট করে শুভর ঘরে যায়। শুভ মশগুল হয়ে বই পড়ছে দেখে মাথায় যেন তার আগুন ধরে যায়।

বলে, শুভ, এই মুহূর্তে তুমি আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও। আজ থেকে তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। তুমি আমার খাবে পরবে আর সভায় দাঁড়িয়ে আমায় গালাগালি দেবে! এত বড় নচ্ছার হারামজাদা ছেলে দিয়ে আমার দরকার নেই!

কী বলছেন আপনি? কাল সকালে বরং এ বিষয়ে—

এক ঘণ্টার মধ্যে যদি বেরিয়ে না যাও এ বাড়ি থেকে, চাকর-দরোয়ান দিয়ে জুতো মেরে তোমায় আমি খেদিয়ে দেব।

১৩

কলকাতায় হোটেলে নিজের ঘরখানায় বসে শুভ ভাবে, দু-তিন দিন পরেই হোটেলের পাওনা দিতে হবে। জগদীশ তাড়িয়ে দেওয়ায় এগার হাজার টাকা দামের গাড়ি চেপে সে হোটেলের ঘরে এসে উঠেছে বটে কিন্তু তার পকেটে নগদ আছে মোট সাত টাকা ছ-আনা পয়সা।

তাই বটে। এত পয়সা খরচ করে এত শিক্ষা পেয়েছে কিন্তু আজ পর্যন্ত সে একটা পয়সা রোজগার করেনি। এইবার সত্যি সত্যি যাচাই হবে তার শিক্ষার মূল্য।

ওদিকে অনেক বেলায় ঘুম ভেঙে জগদীশের মনে হয়, হায়! তাকে দিয়েই শেষ পর্যন্ত তবে ফাঁড়াটা ঘটানো হল শুভর।

দৈব সত্যই সর্বশক্তিমান!

হোটেলে কয়েকটা দিন কাটে শুভর।

তার মধ্যেই জীবনে এবার সে প্রথম ভালভাবে উপলব্ধি করে যে জগতে তার আত্মীয়বন্ধু কত আছে।

একেবারে তাক লেগে যাবার মতই চমকপ্রদ মনে হয় ব্যাপারটা তার কাছে।

তার হোটেলের ঘরে দু-একজনের পদার্পণ থেকে শুরু হয় আর কয়েক দিনের মধ্যে ঘরখানায় যেন বন্যা বয়ে যায় আত্মীয়কুটুম্ব ও বন্ধুবান্ধবের—পিতৃপক্ষীয়, মাতৃপক্ষীয় এবং বর্তমানে একটু অনিশ্চিত হয়ে গেলেও অনেক দিনের সুনিশ্চিত হবু শ্বশুরপক্ষীয়!

ছোট বড় ডাক্তার ব্যারিস্টার ডিরেক্টর অফিসার অধ্যাপক রাজা ও জমিদার!

তার নিজের চেনা মানুষ তো আছেই।

তার বাপ তাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে, এ একটা অতি আকস্মিক ও অভাবনীয় ঘটনা তার জীবনে। নিকট ও দূরের মানুষের আত্মীয়তারও তেমনি আকস্মিক ও অভাবনীয় বন্যা এসে যেন তার জীবন থেকে ধুয়ে মুছে নিয়ে যাবে ওই ঘটনা এবং সেই সঙ্গে একেবারে মোড় ঘুরিয়ে দেবে তার জীবনের!

দিন দুই সে হোটেলের ঘর ছেড়ে বেরোয়নি। অনেক কথা নতুন করে ভাবা দরকার, তাই সারা দিন শুধু ভেবেছে। সারা দিন বসে বসে একভাবে ভেবেছে, সন্ধ্যার পর মদ খেয়ে ভেবেছে তার একেবারে বিপরীতভাবে!

তৃতীয় দিন সকালে সর্বপ্রথম পদার্পণ ঘটে ভূদেবের। বেলা দশটা নাগাদ।

খবরের কাগজ পড়ার ফাঁকে ফাঁকে শুভ তখন কি ভাববে আর কি ভাবে ভাববে সেই ভাবনায় ছটফট করেছিল।

ভূদেব বলে, বাঁচা গেল, তোমাকে এখানেই পেলাম। মায়াও তাই বলছিল, তুমি তো আর ছেলেমানুষ নও যে অভিমান করে নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে।

অভিমান করে নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া? ভূদেব তবে ব্যাপার জেনেই এসেছে! সুতরাং শুভ চুপ করে।

ভূদেব বলে, জগদীশের সঙ্গে কি একটা গোলমাল হয়েছে শুনলাম? কি যে বললে জগদীশ ভালো করে বুঝতেই পারলাম না ব্যাপারটা। নেশার ঝোঁকে একটা কাণ্ড করে বসে এখন ভয়ে ভাবনায় এমন নার্ভাস হয়ে পড়েছে বেচারা!

শুভ সিধে কথায় নেমে আসে। বলে, বাবার কথা বাদ দিন। ফার্স্ট ইয়ারে পড়বার সময় ঠিক এমনিভাবে একবার আমায় তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। আজ বুঝতে পারছি সেবার বাবাকে ক্ষমা করে কি বোকামি করেছিলাম। সেবার বাবা পিছন থেকে লেলিয়ে দিয়েছিলেন মাকে। এবার আপনাকে পাঠিয়েছে।

ভূদেব সঙ্গে সঙ্গে বলে, শুভ, তোমাদের বিজ্ঞানের শিক্ষায় কি বাপ-মা বাতিল? বাপ-মা ছাড়াই ছেলেমেয়ে গজায়?

সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে।

তুমি জান না, তোমায় কোনদিন বলিনি, বলা যেতও না। মায়াকে লাথি মেরে তাড়াবার ইচ্ছা হয়নি কখনো, কিন্তু এই সেদিনও তার গালে একটা থাপ্পড় কষিয়ে দেবার সাধ হয়েছিল। মনে করে অতি চালাক আমি— আসলে ন্যাকা হাঁদা মেয়ে। খালি সমস্যা জানে তর্ক জানে আর অঙ্ক কষে কি করে সেটা সমাধান করা যায় তার থিয়োরি জানে। অথচ পাঁচ-সাত বছর ধরে ভূমিকা ফেঁদেও জীবনটা শুরু করে দিতে পারে না। ভাবটা কি জান, জগৎসংসার যেন ওরই মুখ চেয়ে আছে, ওর হিসাবে যদি ভুল হয়ে যায় যাক, জগৎসংসার উল্টে যাবে!

ভূদেব একটা সিগারেট ধরায়।

কি জান, মেয়েটাকে বড় ভালবাসি। এ জগতে আর তো কেউ নেই আমার! সারা জীবন কষ্ট করে যা কিছু সঞ্চয় করেছি সব মেয়েকেই দিয়ে

যাব। অথচ মেয়ের কাছে আমার দাম কতটুকু? মায়া স্পষ্ট বলে, আমার মেয়ে না হয়ে, আমার হাতে মানুষ না হয়ে—

ভূদেব হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে, বাপকে বাতিল করা যায় না শুভ। নিজের বাপকে মেনেই যৌবনে একজন বাপ হবে, নিজের বুড়ো বাপকে যে সম্মান দিয়েছিল নিজের ছেলের কাছে বুড়ো বয়সে আশা করবে সেই সম্মান। নইলে বাপ হবার দায় কে নেবে বল? ছেলে এগিয়ে যাবে তাই তো বাপ চায়, সেটাই তো সুখ আর সার্থকতা বাপের—বাপকে কি বাতিল করতে পারে ছেলে?

হাতের কাছেই গেলাস ছিল, শুভ ঢকঢক করে খানিকটা জল খেয়ে বলে আজ বুঝতে পারছি মায়া কেন আশা করেছিল আপনি আমার মনের গতি ঘুরিয়ে দিতে পারবেন। আর্গুমেণ্টের ভিতটা আপনি গাঁথতে জানেন।

ভূদেব সায় দিয়ে বলে, এটা কিন্তু চালাকি বিদ্যা নয়। ধারালো বুদ্ধি থাকলেই এটা হয় না। যতটা পাবি সহজ বাস্তব হিসাব দিয়ে একটা বিষয় বিচার করি—এই হল আমার প্রিন্সিপ্‌ল্‌। প্রত্যেক মানুষের একটা সহজ বাস্তববোধ থাকে। তোমার আছে, আমারও আছে। একটা মুখ্যু গেঁয়ো চাষারও আছে। একটা অ্যাক্‌সিডেণ্ট ঘটলে মুখ্যু চাষাও সেটা অ্যাক্‌সিডেণ্ট বলে মানবে, আমরাও অ্যাক্‌সিডেণ্ট বলেই মানব। ঘটে গেছে উপায় কি! অ্যাকসিডেণ্টকে তার চেয়ে বড় করে দেখা বোকামি।

একটু থেকে বলে, এ ব্যাপারটাকে তোমার অ্যাক্‌সিডেণ্ট ভাবতে হবে শুভ।

শুভ সঙ্গে সঙ্গে বলে আমি তাই ভাবছি। ঘটে গেছে উপায় কি! সম্পর্ক ঘুচে গেছে যাক। অ্যাক্‌সিডেণ্ট হয়ে যা ভাঙে তা তো আর জোড়া লাগবে না, যে মরে সেও বাঁচবে না। সেটা মানতেই হবে।

ভূদেব কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে হলে, জগদীশ সবাইকে নিয়ে কলকাতার বাড়িতে চলে এসেছে। কিরকম দেখলাম জান? একটা যেন খুন করেছে, এবার ফাঁসি যেতে হবে। আমিও জানি ওর অনেক ভালো সেণ্টিমেণ্ট মরে

গেছে। সে জন্য কাকে দায়ী করব জানি না। তোমার ঠাকুর্দাকে ভুলো না—জগদীশ তার বাড়ির আঁতুড়ে অসহায় শিশু হয়েই জন্মেছিল, তার হাতে মানুষ হয়েছিল, আকাশ থেকে পড়েনি। অন্য দোষগুণ জানি না, কিন্তু ওর পুত্রস্নেহ নেই, একথা তুমিও বলতে পারবে না। আমাদের দশজনের বরং এমন স্নেহ দেখা যায় না। লোকে ভগবানের জন্য পাগল হয়, জগদীশ তোমার জন্য পাগল। তোমার মন ভেজাতে বাড়িয়ে বলছি না, একটা মিটমাট না হলে মানুষটা সত্যি পাগল হয়ে যাবে। ভাবের পাগল নয়—যাদের দড়ি দিয়ে বাঁধবারও দরকার হয়।

শুভ পাংশু মুখে বলে, তাই কখনো হতে পারে ?

হতে পারে না। ছেলের জন্য মানুষ পাগল হয়ে যায় না ? সারা জীবন ধরে এই জন্যেই তো প্রস্তুত হয়ে এসেছে জগদীশ—তেমন একটা শক্ লাগলে ব্রেনটা বিগড়ে যাবে। তবে অন্য ভাবে ওরকম শক্ লাগবার চান্স নেই—শুধু তোমার দিক থেকে লাগতে পারে।

শুভ অসহায়েব মত চেয়ে থাকে। স্নেহাতুর পিতারূপী জগদীশকে সে যেন ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু মনে পড়লে তো আর অস্বীকার কবা যায় না এই অতি বাস্তব সত্যটাকে। কত অসংখ্য প্রমাণ আর পরিচয় স্মৃতিতে জমা হয়ে আছে জগদীশের এই অন্ধ উন্মাদ স্নেহের। আজও সে একটু বেড়াতে বার হলে জগদীশ কিরকম উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকে, বাড়ি ফেরামাত্র খবর পৌঁছলে তবে স্বস্তি পায়, এসব তো তার অজানা নয়।

এই স্নেহের লাগামেই তো এতদিন জগদীশের একেবারে জন্মগত প্রকৃতিগত জমিদারি দাপট একটু সংযত রাখতে পেরেছে।

সহজ কিন্তু ভর্ৎসনার স্বরে ভূদেব এবার বলে, নিজের বাপের জীবনের ট্রাজেডিটা কখনো চিন্তা করে ছাখো না। দুটো জীবনে পা দিয়ে চলতে হয়েছে বেচারাকে। সেকেলে জমিদারও রইল আবার আমাদের দলেও ভিড়ল। দুটো জীবন টেনে আসছে বরাবর। আর সব তাই দাঁড়িয়ে গেছে ফাঁকি—একমাত্র সম্বল তুমি। তুমি ছাড়া খাঁটি কিছুই নেই ওর জীবনে—সব মেশাল আর ভেজাল।

শুভ ধীরে ধীরে বলে, জানি। ওটা আমার ট্র্যাজেডি। আহ্লাদী ছেলে হয়েছি—বৈজ্ঞানিক হয়েও জের কাটে না।

সবটা নাই বা কাটল? যতটা কেটেছে ভালো—আরও কাটবে। দু-দিনে কি সব কিছুর সব জের কাটে? ওই তো শরীর জগদীশের, ও আর কদ্দিন বাঁচবে বল? তুমি আর এ ব্যাপারটার জের টেনো না শুভ! বেচারীকে শান্তিতে মরতে দাও।

একটু হাসে ভূদেব, রামচন্দ্রের চেয়ে পিতৃভক্তির পরিচয় দেবার সুযোগ পেয়েছ, এ সুযোগ ছেড়ো না। পিতার চেয়ে পিতৃসত্য বড় হয়, শোকে বাপ মরবে জেনেও গোঁয়ারের মত বনে যায়—

শুভ মাথা নাড়ে, দশরথ বারণ করেনি। দশরথ নিজেই সত্য চেয়েছিল, নইলে স্বর্গ ফসকে যাবে।

যাই হোক, ব্যাপারটা মিটিয়ে দাও। হঠাৎ মদের ঝোঁকে—

মদের ঝোঁকে নয়। আমি কি ছেলেমানুষ যে নেশা করে বেরিয়ে যাও বললেই বেরিয়ে আসব?

ভূদেব আশ্চর্য হয়ে বলে, সে কি কথা শুভ? শুধু জগদীশ নিজে নয়, অন্যের কাছেও শুনেছি ঝোঁকের মাথায় বেশী গিলে ফেলেছিল। জীবন টাকা চাইতে গিয়েছিল, তার সামনে খেয়েছে—জীবন নাকি বারণও করেছিল। মাতাল হয়ে কাণ্ডজ্ঞান না হারালে তোমায় কখনো ওভাবে তাড়াতে পারে জগদীশ?

শুভ জোর দিয়ে বলে, না, মাতাল হননি। বেশী নেশা টের পাওয়া যায় না? তার লক্ষণ আলাদা। নেশা বরং একটুও ছিল না। একেবারে সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ, পরিষ্কার স্পষ্ট কথা। রাগটা মাথায় চড়েছিল, স্রেফ রাগ। নেশার জন্য এরকম রাগ হওয়াই অসম্ভব। নেশা মাথায় চড়লেই বরং রাগটা এলোমেলো উল্টোপাল্টা হয়ে যেত—অন্যভাবে চেঁচামেচি হৈ চৈ করতেন।

নিজেই সেদিন নেশা চড়িয়ে শুভকে ঝিমিয়ে দিয়েছিল সে কথা বোধ হয় মনে পড়ে যায় ভূদেবের। বেশী দিনের কথা নয়। একটা আপসোসের আঁওয়াজ করে বলে, তাহলে জগদীশ পাগল হয়েই গেছে। যাকগে, একটা মীমাংসা তো

করতে হয়? জগদীশ বলেছে, জমিদারির কোন ব্যাপারে সে কথা কইবে না, হস্তক্ষেপ করবে না। তোমার যেমন ইচ্ছা ব্যবস্থা করবে, সব নষ্ট করতে চাও তাই করবে। তুমি যদি চাও, জগদীশ সব ছেড়ে দিয়ে বরাবর কলকাতায় থাকতে রাজী আছে।

বাবা বলেছেন একথা?

বলেছে বৈকি! তুমি যা চাও, যেভাবে চাও, তাই সই। তুমি শুধু একটি কথা দেবে, জগদীশ যত দিন বেঁচে আছে বাপের সম্মানটুকু বাঁচিয়ে চলবে, বাইরে ওর নিন্দা করবে না, অন্যে নিন্দা করলেও সইবে না।

ভূদেব গম্ভীর হয়ে যায়, জোর দিয়ে বলে, এ তো ঠিক কথাই শুভ। আমি এতক্ষণ একথা তুলিনি, কিন্তু প্রজাদের প্রকাশ্য সভায় নিজের বাপকে গালাগালি করা কি তোমার উচিত হয়েছিল? একেবারে অকারণে মাথা গরম হয়নি জগদীশের! তোমারও লজ্জিত হওয়া উচিত!

হায়, ভূদেবের এতক্ষণ ধরে বাস্তব বিচার-বিবেচনার গাঁথা ভিত আসল কথার গাঁথনি শুরু হতেই ভাবের চোরাবালিতে তলিয়ে যায়।

শুভ বলে, গালাগালি করে থাকলে নিশ্চয়ই লজ্জিত হতাম!

ভূদেব ভড়কে গিয়ে বলে, সে কি? এ যে উদ্ভট ব্যাপার দাঁড়িয়ে গেল! যে জন্যে এত ফ্যাসাদ তুমি বলছ সেটাই মিছে! তুমি সভায় যাওনি, কিছু বলনি জগদীশের নামে?

সভায় বাবার নামে বলা হচ্ছিল, আমি সেটা বন্ধ করতেই গিয়েছিলাম। ধান-সীজের ব্যাপারে আমাদের লোকেরা দু-চারটে অন্যায় করেছিল, আমি সভায় শুধু বলেছি, অন্যায় যদি হয়ে থাকে বাবার অজান্তে হয়েছে, ভবিষ্যতে আর হবে না।

ভূদেব বলে, ও। বলে ঠিক যেন রোগী দেখার অভ্যস্ত দৃষ্টিতে শুভর দিকে চেয়ে থাকে।

শুভ চটছিল। একি ছেলেমানুষের মত জেরা করা! কঠিন থেকে কঠিনতর

হয়ে ওঠে তার মুখের ভাব। ডাক্তার হয়েও যেন রোগ ধরতে পারেনি এমনি চিন্তিত ও বিব্রতভাবে ভূদেব কথা বলে তাই রক্ষা!

রাগ কোরো না শুভ, সেদিন তোমার কথাবার্তা বুঝতে পারিনি, আজও বুঝতে পারছি না। প্রজারা সভা ডেকে তোমার বাপকে গালমন্দ করছে, তুমি সে সভায় গিয়ে ওকথা বললে তার একটাই তো মানে হয়! সংসারে সবাই সেই মানেটাই করবে। তোমার মনে কি ছিল, তুমি কি ভেবেছিলে, তাতে কি এসে যায়?

হাত তুলে যেন মুখে হাত চাপা দিয়েই শুভকে ভূদেব চুপ করিয়ে রাখে। বলে, না শুভ, আমি তর্ক করতে আসিনি। তর্কাতর্কি বোঝাপড়ার ঢের সময় পাব—আজ রাগারাগি হয়ে যাবে! আমি তোমায় রাগাতে আসিনি, রাগ ভাঙাতেই এসেছি।

শুভও সায় দিয়ে বলে, সেই ভালো, মিছিমিছি কথা-কাটাকাটি করে লাভ নেই। আমি ঠিক করেছি না করেছি ওসব ঝঞ্ঝাটে আর যাব না, দু-রকম জীবন টেনে চলা আমার সইবে না। বাবাকে বলবেন, আমি রাগ করিনি, সম্পর্কও তুলে দিচ্ছি না। মাঝে মাঝে গিয়ে দেখা করে আসব!

ভূদেব ভাবে, মাঝে মাঝে গিয়ে দেখা করে আসব! তার মানেই যেন সম্পর্ক তুলে দেওয়া হল না!

দুপুরে আসে তার মা।

সাবিত্রীকে মোটেই উতলা মনে হয় না। বাপ-ছেলেতে বিবাদ হয়েছে, মিটে যাবে। বিশেষত জগদীশ নিজেই যখন উঠেপড়ে লেগেছে মিটমাটের জন্য।

বলে, ওঁকে জানাসনি যেন আমি এসেছি। আসতে বারণ করে দিয়েছে আমায়। আমি এলে নাকি তুই চটে যাবি! কী যে বুদ্ধি হয়েছে মানুষটার!

সাবিত্রীর কপালে তেলসিঁদুরের ফোঁটা, পরনে গরদ, পায়ে চটি আছে।

কালীঘাটে যাব বলে বেরোলাম তোকে দেখতে। মিছে কথা বলব কেন

মিছিমিছি ? কালীঘাট ঘুরেই এলাম একেবারে। তোকে যে কাহিল দেখাচ্ছে বড় ?

ও কিছু নয়।

মার সঙ্গে শুভর সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে প্রায় নীরবে তার কথা শোনা, যা বলে তাই মেনে নেওয়া, মাঝে মাঝে মুখে হাসি ফুটিয়ে তার দিকে সস্নেহ দৃষ্টিতে চাওয়া যে ছেলে তার মস্ত কেউকেটা হয়ে যায়নি, তাব ছেলেই আছে।

বাপ যেমন মন দিয়ে ছোট মেয়েটির আবোল তাবোল কথা শোনে, তার দিকে হাসি মুখে আদরভরা চোখে চায় অবিকল সেই রকম !

সাবিত্রী ক্ষুণ্ণস্বরে বলে, আমি বেশীক্ষণ বসতে পারব না শুভ।

শুভ বলে, বেশীক্ষণ বসে কাজ নেই। বাবা টের পেলে বকাবকি করবে।

সাবিত্রীর মুখে অনাবিল হাসি ফোটে। বাপ-মার আড়াল করা আদুরে ছোট মেয়ের মুখ অথবা জীবন আর জগতের সঙ্গে যাব সব দ্বন্দ্ব মিটে গেছে তার মুখে ছাড়া এ রকম হাসি ফোটা সম্ভব নয়।

বকাবকি করবে তো বয়ে যাবে। বকাবকি তো চব্বিশ ঘণ্টা করছেই ! আমি গায়ে মাখি নাকি ? এক কান দিয়ে শুনি আরেক কান দিয়ে বেরিয়ে যায়। ওঁর নেই মাথাব ঠিক, কি বলে কি কবে তারও নেই ঠিকঠিকানা। জানিস শুভ, কালীসাধক হলেই মাথাটা কেমন একটু বিগড়ে যায়। কে জানে মার কি লীলা, ভক্তের মাথা একটু বিগড়ে দেন !···সিগাবেট খাচ্ছিস না যে ? তুই আবার কবে আমায় খাতির করে সামনে সিগারেট খাসনি ?

শুভ হেসে বলে, খাব খাব, ইচ্ছে হলেই খাব। সকাল থেকে অনেকগুলি খেয়েছি কিনা—

সাবিত্রী খুশি হয়ে বলে, সেই ভালো—সিগারেটটা একটু কমা দেখি তুই ! দেখবি শুধু সিগারেট কমিয়ে শরীর কত ভালো থাকে, মাথা কত সাফ থাকে। তোর মেজমামা টিন টিন সিগারেট উজাড় করত—

নগদ গয়না এবং সম্পত্তিতে প্রায় দেড়লাখ টাকার মত একট প্রস্তাব বাতিল করে জগদীশ নাকি অতি ছোট জমিদার ও শহরের মাঝারি ব্যবসায়ী শিক্ষিত

পরিবারের এই মেয়েটিকে বিয়ে করেছিল গায়ের জোরে—বাপের অমতে।

সাবিত্রী স্কুলে পড়ত! উঁচু ক্লাসে।

দ্বিতীয়বারের বিয়ে। নইলে বাপের সঙ্গে লড়াই করার সাহস যে জগদীশের হত না তাতে সন্দেহ নেই। প্রথমবার বিয়ে করেছিল প্রায় এক রাজকন্যাকে—মেয়েটির বাপ জমিদার হলেও ছিল রাজার ক্লাসের জমিদার।

কিছু একটা বিশ্রী ব্যাপার ঘটেছিল তাকে নিয়ে। কেউ বলে খুন হয়েছে, কেউ বলে পাগল হয়ে কোথায় চলে গেছে, কেউ বলে বাপ মেয়েকে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে ফেলেছে।

ছেলেবেলা শুভকে বোঝানো হয়েছিল, জমিদারবাড়ি নিয়ে লোকে নানা কথা রটায়! ওসবে কান দিতে নেই।

কৈশোরে একবার অদম্য হয়ে উঠেছিল কৌতূহল। শুভ গিয়েছিল তার অজানা অচেনা সৎ-দাদুর বাড়ি।

বিরাট বাড়ি। ফর্সা মোটা গম্ভীর মানুষ। পরিচয় শুনে জিজ্ঞেস করেছিল, কি চাও?

ছোটমা কি সত্যি মারা গেছেন?

সত্যি মারা গেছেন মানে? তুমি ছোকরা বুঝি আজকাল উপন্যাস পড়ছ?

বসতেও বলেনি, আর কথাও বলেনি! তার এই অস্বাভাবিক বিরাগ থেকে শুভ বুঝতে পেরেছিল সত্যই স্বাভাবিক মরণ হয়নি তার মেয়ের।

তার স্থানে এসেছিল সাবিত্রী। আজও সে বেঁচে আছে—কিন্তু নিজেকে সে সুখী ভাবে না দুঃখিনী ভাবে শুভ জানে না। বহুবার তার মনে হয়েছে সুখ-দুঃখের কথা যেন ভাবেই না সাবিত্রী। তার কাছে হাসিকান্না নিছক জীবন-ধারণের নিয়ম পালন!

সাবিত্রী ঘণ্টাখানেক নিজের মনে বকে যায়। এলোমেলো কথাগুলিকে জোড়া দেওয়ার চেষ্টা পর্যন্ত করে না। শুভ আনমনে শোনে আর মার জীবনের কথা ভাবে। করতে পারে অনেক কিছুই, মাকে মুক্তি দিতে পারে, আড়াল

করে দাঁড়াতে পারে—যেখানে খুশি যেভাবে খুশি বাকি জীবনটা কাটাবার ব্যবস্থা করে দিতে পারে।

কিন্তু মা চাইলে তবেই তো সে কিছু করবে তার জন্যে ? মুক্তি দূরে থাক, কিছুই সে চায় না ছেলের কাছে। আগেও কোনদিন চায়নি, আজও চায় না।

ঘণ্টাখানেক পরে কি কারণে যেন কথার খেই হারিয়ে ফেলে খানিক চুপ করে থেকে সাবিত্রী বলে, এবার যাই শুভ, কেমন ?

শুভই যেন তাকে ডেকে এনেছে আর এতক্ষণ আটকে রেখেছে।

শুভর খেয়াল হয়, মেজমামার সিগারেট ছেড়ে স্বাস্থ্য ও সুখসম্পদ লাভের কাহিনী থেকে শুরু করে আবোল তাবোল হাজার রকম কথা সে টেনে এসেছে কিন্তু বাপের সঙ্গে তার বিবাদের কথাটা উল্লেখ পর্যন্ত করেনি।

মাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে আসতে শুভ নীচে নামে না। কথাটা মনেও পড়ে না তার। শুধু জানালায় দাঁড়িয়ে রাস্তাব অপর দিকে দাঁড় করানো গাড়িতে তাকে উঠতে দেখে সে নিশ্চিন্ত হয়।

সোফায় বসে একটা সিগারেট ধরিয়ে তার খেয়াল হয় আরেকটা কথা। ঘণ্টাখানেক ধরে এলোমেলো বকে যাওয়ার অদ্ভুত বিশেষত্ব।

কেবল তার মেজমামার গল্প নয়, সাবিত্রী তাকে আজ আরও অনেকগুলি পুরুষমানুষের কথাই শুধু শুনিয়ে গেছে। আত্মীয়বন্ধু ধনী দরিদ্র জানাশোনা পুরুষ থেকে পুরাণের গল্পের পুরুষ পর্যন্ত অনেকের কথা। অনেক লড়ায়ের পর জীবনে নানা ধরনের জয়লাভ করে যারা সবাই স্বাস্থ্য আর সুখসম্পদ আয়ত্ত করেছে !

শুভ স্তব্ধ হয়ে থাকে।

বইয়ে হোক তর্কে হোক বক্তৃতায় হোক যেভাবে বক্তব্য তুলে ধরার সঙ্গে তার পরিচয় মা সেভাবে বলতে পারেনি বলে, ওইভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে প্রাণের কথাটা বিজ্ঞান বা আর্টের ভাষায় তুলে ধরতে পারেনি বলে নিজের মায়ের এত

সহজ আর মোটা প্রাণের কথাটা এমন মোটা ভাবে বলা হলেও সে এতক্ষণ ধরতে পারেনি!

ভেবেছে, তার মা নয়, জমিদার জগদীশের বৌ বুঝি এক ঘণ্টা আবোল তাবোল বকেছে!

অথচ মা তাকে প্রাণপণে একটা কথাই বুঝিয়ে গেছে যে ব্যাটাছেলে মানেই বীর। ব্যাটাছেলে মানে জীবন আর জগতের রাজা। যেমন জগদীশ তেমনি আর সকলেই, তার ছেলেও! কখনো কোন অবস্থাতে ব্যাটাছেলে ভয় পায় না, ভড়কে যায় না, হতাশ হয় না। রাজ্য আর রাজকন্যা সে জয় করে নেবেই জগতে। ব্যাটাছেলে বলেই শুভ যেন কিছু না ভাবে—সব ঠিক হয়ে যাবে। বাপ কেন, স্বয়ং ভগবানের সঙ্গে লড়াই করে ব্যাটাছেলে জিতে যায়!

তাই বটে। সেইজন্য দেবতার সঙ্গে যুদ্ধ করে হরিশচন্দ্রের জয়লাভের কথাটা সংক্ষেপে বলেই তাদের গোমস্তা হরিশরণের কথাটা মা তুলেছিল।

ঘুমন্ত হরিশরণের গলায় কাটারি দিয়ে কোপ বসিয়েছিল তার বৌ। যত বজ্জাত হোক বৌ তো, কাটারি দিয়ে গলা কাটতে শেখেনি, কেঁপে গিয়ে বুঝি অবশ হয়ে গিয়েছিল তার হাত, পাপের নেশায় উন্মাদিনীর হাত। তাদের তদানীন্তন নায়েব ভবতারণ নিজে অনায়াসে ধারালো কাটারির এক কোপে কেটে ফেলতে পারত হরিশরণের গলাটা। বেশী চালাক বলে আর মহাপাপী মাত্রেই বেশী চালাক হয় বলে সে চেয়েছিল বৌটাই নিজের হাতে গলা কাটুক স্বামীর, বিপদ হলে সে অন্তত বলতে পারবে আমি খুন করিনি। বলে ফাঁসির দায় থেকে রেহাই পাবে। গলা দু-ফাঁক হয়নি। বেশ খানিকটা কেটে গিয়েছিল। রক্তে ভেসে গিয়েছিল বিছানা।

তবু সে লাফিয়ে উঠে বৌয়ের হাত থেকে সেই কাটারি কেড়ে নিয়ে এক কোপে ফাঁক করে দিয়েছিল ভবতারণের গলা।

তারপর এসে জগদীশের পা জড়িয়ে ধরেছিল। সব শুনে জগদীশ বলেছিল, বেশ করেছিস।

জগদীশের তখন বয়স ছিল তেজ ছিল উৎসাহ ছিল। জগদীশ নিজে গিয়েছিল নিজের চোখে ব্যাপার দেখতে।

ব্যাপার দেখে হুকুম দিয়েছিল, যা, হারামজাদাটাকে শ্মশানে ফেলে দিয়ে আয় গে। শকুনে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে—

আইন-ভীরু কে যেন কেঁউ করে উঠেছিল, আজ্ঞে?

জগদীশ বলেছিল, তোদের ভয় কি? ওকে তো খুন করেছি আমি। ফাঁসি হয় আমার ফাঁসি হবে, তোদের কি?

বলে কাটারিটা তুলে নিয়ে ভবতারণের রক্ত হাতে মেখে বলেছিল, যা, নচ্ছারকে ফেলে দিয়ে আয় শ্মশানে। আর শোন হরিশরণ, তুমি আমার এক নতুন কাজে বাহাল হলে। নতুন যে নায়েব হবে তুমি তার কাজকম্মো হালচাল দেখে আমার কাছে রিপোর্ট করবে। দুজনে তোমরা মাইনে পাবে সমান।

জানিস শুভ? বৌটা কোন প্রায়শ্চিত্ত করেনি, কোন ঠাকুরদেবতার পূজো করেনি। সকালে বিকেলে শুধু স্বামীর চরণামৃত খায়। যা রাঁধে নিজের জন্য কিছু রাখে না। হরিশরণ হুকুম দেয় তবে মাছ-ভাত খায়। হরিশরণ দোতলা বাড়ি করেছিল তুই তো দেখেছিস।

এমনিভাবে পুরুষকারের কাহিনী শুনিয়ে গেছে সাবিত্রী। সেজমামার সিগারেট ছাড়ার বীরত্বের সঙ্গে হরিশচন্দ্রের সর্বস্ব দান করা থেকে তাদের গোমস্তা হরিশরণের আততায়ীর গলায় কাটারি মারা—এমনি সব এলোমেলো বাস্তব অবাস্তব কাহিনী।

মোট কথাটা বুঝে শুভ যাতে বুকে বল পায় যে ব্যাটাছেলের কখন কি অবস্থা হবে শুধু দৈবই জানে, ব্যাটাছেলে কিন্তু সব অবস্থাতেই শক্ত থাকে।

আরেকটু মনোযোগ দিয়ে যদি মার কথাগুলি শুনত! জীবনের কত শত শত ঘণ্টা সময় নিষ্ফল বাজে চিন্তায় নষ্ট করেছে, একটি ঘণ্টা ধৈর্য ধরে যদি ভোঁতা সাধারণ সেকেলে মার কথাগুলি বুঝবার চেষ্টা করত! কে জানে মা তাকে নিজের ভঙ্গিতে আরও কত দামী দামী কথা বলে গেছে?

তারপর আরম্ভ হয় আত্মীয়বন্ধুর অভিযান! তারা আসে, বসে, কথা বলে চলে যায়—কেউ করে চায়ের নিমন্ত্রণ, কেউবা ভোজের। সাবিত্রীর মতই জগদীশের সঙ্গে তার বিবাদের প্রসঙ্গ কেউ তোলে না। একটু সাবধানে সংযত-ভাবে কথা বলে সকলেই। অনুমান করা যায়, জগদীশ সকলকে শিখিয়ে পড়িয়ে সতর্ক করেই পাঠিয়েছে!

এদের ভিড় করে আসা-যাওয়ার মধ্যে নতুন এক আশ্বাস খুঁজে পায় শুভ। তার বড় প্রয়োজন ছিল এ আশ্বাসের।

জগদীশ পাঠিয়েছে বলেই কয়েকটা দিনের মধ্যে এমন ভিড় করে সকলে আসতে শুরু করে থাক, এরা তার আপনজন সন্দেহ নেই।

এবং এদের কাছে তার সবটুকু মূল্য কেবল এই নয় যে সে জগদীশের ছেলে।

গরীবের ঘরে জন্মেও সে যদি নিজেকে এতখানি গুণবান করতে পারত, গোড়ায় এতগুলি আপন-জন তার থাকত না বটে কিন্তু এদেরই দু-একজন তাকে তুলে নিত নিজেদের স্তরে, এদের সঙ্গেই গড়ে উঠত অনেকটা এই ধরনেরই আত্মীয়তা।

জগদীশ আর তার টাকা জীবন থেকে একেবারে ছাঁটাই করে দিলেও তার পড়বার ভয় নেই। নিজেদের প্রয়োজনেই শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত সমাজ তাকে নিজেদের স্তরে প্রতিষ্ঠিত করবে, তার মত প্রতিভাবান শিক্ষিত কর্মঠ মানুষকে বাদ দিলে এদের চলবে না।

সে বিশেষভাবে শিক্ষিত বৈজ্ঞানিক। বিজ্ঞানকে ভাড়া খাটিয়েই ধনোৎ-পাদন হয়। বৈজ্ঞানিকের মূল্য আছে।

শুভর কোষ্ঠি যে তৈরি করেছিল তার নাম প্রণবেশ্বর—বিখ্যাত পণ্ডিত আর জ্যোতিষী। তাব ভক্ত ও গ্রাহকদের মধ্যে অনেক বড় বড় রাজা মহারাজা ও ধনী ব্যবসায়ী আছে। সত্তর বছর বয়সে আজও তার স্বাস্থ্য দেখলে সত্যই অবাক হয়ে যেতে হয়। মাথাব চুল এখনো পাকেনি। কোনদিন নাকি পাকবেও না! কারণটা তার কালো-রং-করা চুলের দিকে চেয়ে খুব কম

লোকেই ধরতে পারে। তার বেশ ও চেহারায় শুদ্ধ সাত্ত্বিক ভাবটা অতিশয় প্রকট।

প্রণবেশ্বর পর্যন্ত পায়ের ধুলো দেয় শুভর হোটেলের ঘরে।

অন্যেরা সযত্নে যে প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়েছিল, প্রণবেশ্বর তাই নিয়েই কথা শুরু করে।

বলে, জগদীশের কাছে সব শুনলাম। তোমরা পিতাপুত্র কেউ দোষী নও, কেউ দায়ী নও এ ঘটনার জন্য। তোমাদেব সাধ্য ছিল না ঠেকাও! এবছর তোমার যে ফাঁড়ার কথা লিখে দিয়েছিলাম, এটা হল সেই ফাঁড়া।

বলে, ফাঁড়াটা ছিল গুরুতর। জগদীশ অনেক চেষ্টায় গুরুত্ব কমিয়ে সামান্য ব্যাপারে দাঁড় করিয়েছে। তোমার বিশ্বাস নেই, থাকলে হয়তো একেবারে এড়ানো যেত।

শুভ প্রশ্ন করে, আচ্ছা পণ্ডিতমশাই ফাঁডা তো ছিল আমার, বাবার ক্ষতি হল কেন?

প্রণবেশ্বর আশ্চর্য হয়ে বলে, জগদীশেব ক্ষতি কিসের? ত্যাজ্যপুত্র করে দিলে তুমি কোথায় দাঁড়াতে ভাব দেখি?

শুভ বলে, ও।

সকলেই আসে, আসে না শুধু মায়া।

শুভ তাকে টেলিফোন কবে। বলে, তুমি বাদ গেলে যে? এসে কিছু সদুপদেশ দিয়ে যাও?

মায়া বলে, কেন যাইনি শুনবে? তোমায় সামনে দেখে গায়েব জালা বেড়ে যাবে বলে।

শুভ বলে, ও!

জানাচেনা যে যেখানে ছিল সকলকে জগদীশ ছেলের কাছে পাঠায় এক ভেবে, ফল হয় তার বিপরীত।

সমবেতভাবে ওদেরই অনুচ্চারিত আশ্বাসে শুভর যেটুকু দ্বিধা ছিল তাও কেটে যায়।

সকালে সে দেখা করতে যায় জগদীশের সঙ্গে।

শুভ এসেছে শুনে মেরুদণ্ড সোজা হয়ে যায় জগদীশের, মুখে প্রশান্ত হাসি ফোটে। কত যুগের কত রাজা-বাদশার দম্ভ যে লুকানো থাকে সেই হাসির আড়ালে।

সেদিন রাত্রে বাড়াবাড়ি করে ফেলার জন্য অনুশোচনার অন্ত ছিল না, এখন মনে হয়, হয়তো বাড়াবাড়ি হয়নি মোটেই! বড় বেড়ে যাচ্ছিল শুভ, ওরকম একটু কড়া তাগড়ানিই হয়তো তার দরকার ছিল।

এবার থেকে শুভ একটু সামলে-সুমলে চলবে।

ছেলের সামনে মুখোমুখি বসে কিন্তু জগদীশের উল্লাস ঝিমিয়ে আসে।

শুভর শান্ত মুখে দৃঢ় সংকল্পের ছাপ। জগদীশ টের পায় সেদিনের ব্যাপারটা মিটিয়ে দিতেই শুভ এসেছে কিন্তু তার সঙ্গে মিটমাট করতে আসেনি। তাই বটে, অত সহজে নত হবার ছেলে তো তার নয়!

জগদীশ নিজেই কথা শুরু করে। বলে, তুমি এসে ভালো করেছ, তোমার আমার দুজনেরই মান রেখেছে। এটুকু আশা করছিলাম তোমার কাছে। বুড়ো বাপকে দিয়ে মাপ চাওয়ালে ছেলের মান বাড়ে না।

শুভ বলে, আমার রাগ বা অভিমান নেই, সেদিনের ব্যাপার তুচ্ছ করে দিয়েছি। কিন্তু—

তার 'কিন্তু' শুনেই মনের আকাশ আঁধার হয়ে যায় জগদীশের।

আমার কথাগুলি বুঝবার চেষ্টা করবেন, আমি যা ঠিক করেছি তার সঙ্গে সেদিনের ব্যাপাবের কোন সম্পর্ক নেই।

শুভ বলে, জগদীশ শোনে। কারো দোষে নয়, স্বাভাবিক নিয়মেই তারা দুজনে দু-জগতের মানুষ হয়ে গেছে—ছেলের মুখে একথা শুনবার অনেক আগে থেকেই জগদীশ অনুভব করে তারা শুধু দু-জগতের মানুষ নয়, দুটি অনেক দূরের জগতের মানুষ!

শুভর কথা শেষ হলে জগদীশ খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকে।

তোমার কথার মানে বুঝলাম না। তুমি ভিন্ন থাকবে, আমার কাছে পয়সাকড়ি নেবে না, তবু সম্পর্ক থাকবে কি করে? সে সম্পর্কের মানে কি?

কি বলবে ভেবে পায় না শুভ। জমিদারির সঙ্গে সম্পর্ক তুলে দিয়েও সম্পর্ক বজায় রাখার মানে সত্যই জগদীশ বুঝবে না।

সে ভেবেচিন্তে বলে, আসল কথা, আমাদের কোন মনোমালিন্য নেই, পরেও থাকবে না।

মনোমালিন্য নেই? তুমি আমার ছেলে, আমি চোখ বুজলে সব ধনসম্পত্তি তোমার হবে—তবু তুমি আমার পয়সা ছোঁবে না বলছ। এ তো মনোমালিন্যেরও বাড়া! সব সম্পর্ক চুকিয়ে দেওয়া। ভিন্ন থাকতে চাও সে আলাদা কথা, তোমার খুশির কথা। তুমি এ বাড়িতে থাকতে পার, নতুন বাড়ি কিনতে পার—

প্রশ্নটা তা নয়। আপনার টাকা নিলে আমাকে খানিকটা জমিদারের ছেলে হতেই হবে। আপনি অনেক স্বাধীনতা দিয়েছেন, আরও হয়তো দিতে রাজী হবেন, কিন্তু সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আমি পাব না।

স্থির দৃষ্টিতে ছেলের দিকে থেকে শুভ জগদীশ জিজ্ঞাসা করে, তুমি আমায় ঘৃণা কর?

না। আপনি যে ফাঁদে জড়িয়ে আছেন সেটাকে ঘৃণা করি।

কয়েক মুহূর্ত মাথা নীচু করে থেকে শুভ মুখ তুলে বলে, একটা সহজ মীমাংসা আছে বাবা।

বাবা! এখনো শুভ তাকে এমন সহজভাবে বাবা বলে ডাকে! দেহে রোমাঞ্চ হয় জগদীশের। সাগ্রহে সে বলে, কী মীমাংসা?

জমিদারি বিক্রি করে দিন। আমি আপনার টাকাও নেব, আপনার সঙ্গেও থাকব।

তোমার অনেক অনুগ্রহ। জমিদারি বিক্রি করে তোমায় নগদ টাকা দেব,

তুমি শিল্পোন্নতির নামে টাকাগুলি উড়িয়ে দেবে। এই কি তোমার শেষ কথা?

শুভ চুপ করে থাকে। জগদীশ নীরবে উঠে যায়।

শুভ ভাবে, এখন অন্য কারো সঙ্গে দেখা করে বিদায় নিতে গেলে হয়তো সেটা চিরবিদায় নেওয়ার অভিনয়ে দাঁড়িয়ে যাবে! তার চেয়ে নিঃশব্দে সরে পড়াই ভালো। দেখা সকলের সঙ্গে হবে বৈকি।

জগদীশ দাঁড়িয়ে ছিল গাড়িবারান্দার নীচে। শুভ গাড়িতে উঠতে যাবে, সে বলে, এ গাড়িটা আমার টাকায় কেনা শুভ।

গাড়ির দরজাটা কেবল খুলেছিল, সেটা আবার বন্ধ করে দিয়ে শুভ নীরবে গেটের দিকে হাঁটতে থাকে।

একবার সাধ হয় যে বলে তার হাতের ঘড়ি থেকে পরনের জুতো, পোশাক সবই জগদীশের পয়সায় কেনা, এসবও কি খুলে রেখে যাবে?

হীন হবার লোভটা শুভ প্রাণপণে জয় করে।

জগদীশ সেই দিনই সপরিবারে বারতলায় ফিরে যায়। কয়েক দিন পরে শুভ খবর পায়, জগদীশ নবশিল্পমন্দির বন্ধ করে তালা এঁটে দিয়েছে।

আরও খবর পায়, হঠাৎ যেন পাগলের মত শুরু করে দিয়েছে অত্যাচার। কারণে অকারণে যাকে তাকে ধরে মারছে, ঘরের চালায় আগুন লাগাচ্ছে, হাঙ্গামা বাধিয়ে ডেকে আনছে পুলিস।

নন্দ এসেছিল। সে বলে, সামলাবার চেষ্টা করবি না? নিজেই তো মারা পড়বেন?

শুভ ম্লানমুখে বলে, উপায় কি!

বারতলার গেঁয়ো মানুষগুলির জন্য শুভর মন কেমন করে। বিশেষভাবে লক্ষ্মীর জন্য।

ছেলেবেলা থেকে তার জীবন কেটেছে শহর আর ওই গ্রামে। কিন্তু গেঁয়ো মানুষগুলির কাছাকাছি থেকেও সে তো কোনদিন এক হয়ে যেতে পারেনি ওদের সঙ্গে, কোনদিনও তলিয়ে জানতে পারেনি ওদের জীবন। আধখানা

জানা চেনা মানুষগুলি তাকে টানে ওদের আরও আপন করার জন্য তারই কামনা দিয়ে। ওদের চালচলন ধরনধারন আর জীবনযাপনের রকমটা জানাই শুধু নয়, ওদের চেতনার অলিগলির সন্ধান জানার আগ্রহ তার চিরদিনই ছিল, এবার সেটা আরও জোরালো হয়েছে।

চাষী মেয়ে তার কাছে ছিল পাপড়ি-বোজা ফুলের মত। তার কাছেও কোন ফুল কখনো দল মেলবে দু-একটি করে, এ আশা শুভর ছিল না। লজ্জা আর ভীরুতার দুর্ভেদ্য আবরণে কিনা অনেক ফাটল ধরেছে লক্ষ্মীর, তার সঙ্গে মেশার সুযোগ পেয়ে ওই চিররহস্যময়ী ফুলটির দুটি একটি পাপড়ি খুলে যেতে শুরু করেছে, লক্ষ্মীর টানটা তাই সে অনুভব করে সবচেয়ে বেশী।

জগদীশ যেন পিতৃত্বের অধিকার খাটিয়ে এ টানটা দমিয়ে রেখেছিল, বাপের সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচিয়ে দিতেই জোরালো এবং বাস্তব হয়ে উঠেছে। আরেকটা আতঙ্কও ঘুচে গেছে তার। এই টান যেন বংশগত সেই রোগটাও তার সারিয়ে দিয়েছে—লক্ষ্মীর মত চাষীর ঘরের মেয়ে-বৌকে গায়ের জোরে ভোগ করার হঠাৎ-জাগা দুর্দান্ত কামনা।

গাঁয়ের এই টান, লক্ষ্মীর এই টান, ভারি খুসি করে শুভকে। সে তবে সত্যিই দেশকে ভালবাসে!

কর্তব্য হিসাবে ভালবাসা নয়, সত্যই তার তবে প্রাণের টান আছে!

পৃথিবীতে সবচেয়ে অগ্রসর জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েও, বৈজ্ঞানিক হিসাবে পৃথিবীর সবচেয়ে অগ্রসর মানুষগুলির একজন হয়েও, সত্য সুন্দর মার্জিত জীবনযাপনের সুযোগ পেয়েও সে দেশের শিক্ষাদীক্ষা-হীন গরীব নোংরা অসভ্য মানুষগুলির জন্য দরদ ভুলে যায়নি!

একি সহজ আত্মপ্রসাদের কথা একজন মানুষের পক্ষে!

চারিদিকে তোলপাড় চলেছে বাপের সঙ্গে তার বিচ্ছেদ নিয়ে, জগদীশ নতুন করে তাণ্ডব জুড়েছে অত্যাচারের, এসময় কিছু দিন তার পক্ষে বারতলায় যাওয়াটা সঙ্গত হবে না। গেলে সোজাসুজি শত্রুতায় নামতে হবে জগদীশের সঙ্গে—প্রজাদের পক্ষ নিয়ে তার অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে।

জেনেও শুভ সাত দিনের বেশী ধৈর্য ধরতে পারে না।

মায়া শুনে আশ্চর্য হয়ে বলে, সে কি! তোমার যাওয়া কি ঠিক হবে?

একটু ঘুরে চলে আসব।

লোকে কি ভাববে? তোমার বাবা শুনে কি ভাববেন? মনে মনে অস্বস্তি বোধ করলেও শুভ কথাটা তুচ্ছ করে উড়িয়ে দেয়।

মায়া কড়া স্বরে জিজ্ঞাসা করে, কেন? বারতলা যাবার এত তাগিদ কেন তোমার?

দেখেশুনে আসব চারিদিকের অবস্থা।

কি দেখেশুনে আসবে? অবস্থা সব তো জানাই আছে তোমার।

শুভ গর্বের সঙ্গে হেসে বলে, আসল কথা কি জানো, গাঁয়ের জন্য আমার মন কেমন করছে।

তাই নাকি।

শুভ ভেবেছিল, যাদের জন্য সে নিজের বাপকে ছেড়েছে, একটা জমিদারি ছেড়েছে, বারতলা স্টেশনে পা দেওয়া মাত্র তাদের মধ্যে নিশ্চয় সাড়া পড়ে যাবে। লোকে বিস্ময় আর কৌতূহল নিয়ে তার দিকে তাকাবে আর নিজেদের মধ্যে গুজগাজ ফিসফাস আলোচনা চালাবে।

সে তো আর জমিদারের ছেলে নয়, এবার তাকে আত্মীয় ভাবতে কারো অসুবিধা হবে না। স্টেশন থেকে নন্দর বাড়ি পর্যন্ত সে হেঁটে যাবে, পথে চেনা অচেনা সকলের সঙ্গে কথা বলবে, আরও অবাক হয়ে যাবে সকলে। জগদীশের বিলাতফেরত ছেলে এতখানি নিরহঙ্কার। এমন সহজ সাদাসিদে ভাবে সে তাদের আপন হতে চায়! আগে সে যে তাদের আত্মীয় হতে চেয়েছিল তার মধ্যে সত্যাই কিছুমাত্র ফাঁকি ছিল না।

এ তো একটা খাঁটি মানুষ! তাদের আপন মানুষ!

কিন্তু এই গাঁয়েও যেন এত ব্যতিব্যস্ত মানুষ যার যার নিজের জীবনযাত্রা নিয়ে স্টেশনে গাড়ি থেকে নেমে পথ দিয়ে হাঁটতে শুরু করেও কয়েকটির বেশী

কৌতূহলী চোখ তার দিকে পড়ে না, দু-একজন চেনা মানুষ ছাড়া বেশী লোকের সঙ্গে হাসিমুখে সহজভাবে কথা বলার সুযোগ জোটে না।

জগদীশের সঙ্গে তার যে এত কাণ্ড হয়ে গেল সেজন্য উত্তেজিত হয়ে মাথা ঘামাবার সময় যেন গাঁয়ের বেশীর ভাগ লোকের নেই। কেবল তার নিজের প্রয়োজনে কেবল তার নিজের জীবনে সে যেন ওই নাটকটা ঘটিয়েছে—তার সঙ্গে গাঁয়ের লোকের সম্পর্ক নেই।

দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে সনাতন আর গজেন কথা বলছিল। তাকে দেখেই ওরা সাগ্রহে এগিয়ে আসে।

শুভ খুশি হয়ে হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করে, কেমন আছ তোমরা?

গজেন গোমড়া মুখে বলে, রাখছেন কই যে থাকব? আপনি কারখানাটা সায়েব আর মাড়োয়ারীকে বেচে দেবেন, মোদের উচ্ছেদ করবেন, এ তো ভাবতে পারিনি ছোটবাবু!

সনাতন বলে, আপনে না মোদের ভাল চাইছিলেন? মাগীটার আঁতুড় যেতে লাগবে আরও কটা দিন, বলছেন কিনা তিন দিনের মধ্যে উঠে না গেলে ঘরটা ভেঙে দেবেন, মেরে খেদিয়ে দেবেন! এ কেমন কথা ছোটবাবু?

দেশে ফিরে বিমানঘাঁটি থেকে জগদীশের সঙ্গে গাঁয়ে ফেরার দিনটির কথা শুভর মনে পড়ে। ছেলের জন্য অভ্যর্থনা ও সংবর্ধনা আশা করে হতাশ হয়েছিল জগদীশ। জনা লেভেল-ক্রসিং-এ ভিড় দেখে উৎফুল্ল হয়েছিল। কিন্তু ভিড়টা জমেছিল ভুলা বাগদীর ছেলে বলাই ট্রেনে কাটা পড়েছিল বলে! মনটা বিগড়ে যায় কিন্তু হাসিও পায় শুভর।

আমায় দোষী করছ? তোমরা জান না বাবা আমায় ত্যাগ করেছেন, খেদিয়ে দিয়েছেন?

কথাটা বলেই শুভর খেয়াল হয় ইচ্ছে করে না হলেও সে মিথ্যা কথা বলেছে। জগদীশ তো তাকে ত্যাগ করেনি, তাড়িয়ে দেয়নি। সে-ই ত্যাগ করেছে জগদীশকে, সেই তাড়িয়ে দিয়েছে জগদীশকে তার স্বাধীন স্বতন্ত্র আগামী জীবনের বর্তমান সীমানারও বাইরে।

গজেন ধীরভাবে বলে, বিবাদ হয়েছে শুনছিলাম। তাড়িয়ে দিয়েছেন? তাই বটে, আপনি কি এ কাজ পারতেন!

সনাতন কিছুই বলে না। তাদের নিস্পৃহ ভাব এবার দমিয়ে দেয় না শুভকে, ব্যাপারটা স্পষ্ট ও স্বচ্ছ হওয়ায় বরং সে স্বস্তি বোধ করে। তাকে পুরোপুরি আপন ভাবতে এখন অনেক সময় লাগবে এদের—চিরদিনের জন্যই কার যে বিচ্ছেদ হয়ে গেছে বাপের সঙ্গে অনেকদিন ধরে তার অনেক প্রমাণ দরকার হবে। বিবাদ হয়েছে? কিন্তু বিবাদ তো বাপ ব্যাটাতে—বিবাদ হলেই তো এ সম্পর্ক ঘুচে যায় না!

ঝগড়া মিটে গিয়ে একদিন তাদের আবার মিল হবে না কে বলতে পারে? সংসারে অমন কত হচ্ছে! ভদ্রঘরের অহেতুক ছাঁকা অভিমান শুভর অনেকখানি কেটে এসেছিল। এদের মনোভাব টের পেয়ে আহত হবার বদলে সে বরং খুশিই হয়।

শুধু সাময়িক ত্যাগ দিয়ে এদের কেনা যায় না, হাজার পিছিয়ে থাকলেও এরা শিশু নয়, এদের সাংসারিক সহজ বাস্তববোধ আছে—এটুকু না জানলে সে কোনদিন এদের আপন হতে পারত না।

সে প্রশ্ন করে, তোমরা কি করবে ঠিক করেছ?

মোরা উঠব না।

ঠিক। ন্যায্য অধিকার ছাড়বে কেন? দেখি, আমি কতটুকু কি করতে পারি।

আরও কিছুক্ষণ কথা বলে শুভ এগিয়ে যায়। দুপুর রোদে হাঁটতে তার ভালো লাগে। মনটা হঠাৎ শান্ত হয়ে গেছে। যত ভাবে ততই সে আশ্চর্য হয়ে যায় যে কত সহজ একটা কথা সে ধরতে পারেনি এতদিন! সংসারে বাপ-ছেলেতে বিবাদ হয়, বাপ ছেলেকে ত্যাগও করে—যে কারণেই হোক। একটা আদর্শের জন্য বাপের সঙ্গে তার লড়াই হয়েছে, ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে, তাতে এদের কি আসে যায়? তার নিজের ব্যক্তিগত জীবনের আদর্শের লড়াই সম্পূর্ণরূপে তারই নিজস্ব ব্যাপার। এদের জীবন-সংগ্রামের সঙ্গে তার সম্পর্ক

কিসের? কত কি ত্যাগ করে সে কতখানি মহৎ হয়েছে এদের লাভ-লোকসানের হিসেবে সে প্রশ্নটাই অবান্তর!

এদের লড়াইকে সে যতটুকু এগিয়ে দেবে এদের কাছে তার মূল্য শুধু সেইটুকুর।

সেজন্য তার নিজের প্রয়োজন থাকতে পারে আদর্শের এবং ত্যাগস্বীকারের—সেটা একেবারেই আলাদা কথা!

নন্দর বাড়ি যাবে ভেবেছিল, তালতলার মোড়ে এসে সে বাঁ দিকে পাক নেয় লক্ষ্মীর বাড়ির দিকে।

লক্ষ্মী খুশি হয়ে সাগ্রহে অভ্যর্থনা জানায়, দাওয়ায় পাটি বিছিয়ে বসতে দেয়।

বলে, আমি জানতাম আপনাদের বনবে না। মানুষের দোটানা সয়, তেটানা মানুষ সইতে পারে?

তেটানা?

জ্ঞানী মানুষ, জ্ঞানচর্চার একটা টান। দেশের সব মুখ্যু মানুষের জন্য একটা টান। ঘরের টানটা খাপ খেল না কোনটার সঙ্গে। এরকম অবস্থায় পড়লে মানুষকে ঘর ছাড়তেই হয়। মানুষ সন্ন্যাসী হয়েই যাক আর অন্য যা করতেই যাক।

কত সোজা ব্যাখ্যা!

লক্ষ্মী এবার যেন আরও সহজ আর খোলাখুলিভাবে আলাপ করে। গজেন আর সনাতনেরা না করুক, বাপের সঙ্গে ঝগড়া করার জন্য লক্ষ্মী তাকে আরও আপন করে নিয়েছে সন্দেহ নেই।

জগদীশের কথাও বলে লক্ষ্মী। বলে, যাদের সঙ্গে ভাব করেছিলেন, বেছে বেছে তাদের উপরেই ঝাল ঝাড়ছেন বেশী করে। আমাদের ডাক্তারের বাড়ি দুবার চুরি, একবার আগুন দেবার চেষ্টা হয়েছে। তারপর দুটো মিথ্যে মামলা জুড়েছেন।

নন্দ তো সেদিন বললে না কিছু?

তখনও বোঝা যায়নি। এমনি চোর এসেছে, কেউ হিংসে করে আলায় আগুন দেবার চেষ্টা করেছে। ডাক্তার মানুষের তো শত্তুরের অভাব নেই। চিকিৎসা করে কাউকে বাঁচানো গেল না, দোষ হল ডাক্তারের। কেউ মিথ্যে সার্টিফিকেট চেয়ে পায়নি, তার হল গায়ের জ্বালা। মামলা দুটো শুরু করাতে বোঝা গেল গায়ের জ্বালাটা কার। একদল ছেলে আর চাষীরা মিলে পাহারা দেবার জন্যে দল বেঁধেছে, সারারাত ডাক্তারের বাড়ি পাহারা দেয়। ওদিক দিয়ে সুবিধে হল না, মামলা জুড়ে হয়রান করো!

লক্ষ্মী হঠাৎ সুর পালটে বলে, কিছু মনে করছেন না তো? যতই হোক বাবা তো আপনার!

শুভ গম্ভীর হয়ে বলে, গাল দিলে নিশ্চয় রাগ করতাম।

তা হলে আপনাকে বলেই রাখি। চারদিকে সবাই কিন্তু গাল দিচ্ছে, যাচ্ছে-তাই বলে গালাগাল করছে।

তা করুক। আমার সামনে আমাকে শুনিয়ে না করলেই হল।

তবেই দেখুন সম্পর্ক তুলে দিলাম বললেই সম্পর্ক ঘুচে যায় না।

শুভ মাথা নেড়ে বলে, আমার কথার অন্য মানে। সম্পর্ক আছে কি নেই সে আলাদা কথা, আমার সামনে কেউ যদি বাবাকে গাল দেয় সে আমাকেই অপমান করার জন্য দেবে।

লক্ষ্মী ফস করে বলে বসে, তবে তো মুশকিল! আজ না দিই, দু-দিন বাদে দেখা হলে হয়তো আপনার সামনেই গাল দিয়ে বসব!

শুভ আপসোসের সুরে বলে, বাড়াবাড়ি সইছে না, না?

লক্ষ্মী বলে, এমনি নয় সয়ে গেলাম, আমায় বে-ইজ্জত করার চেষ্টা হচ্ছে যে। শহর থেকে কতগুলি গুণ্ডা এনে ছেড়ে দিয়েছেন, ওরাই সব তছনছ করে বেড়াচ্ছে। আমি তো একলাই এখানে ওখানে যাই, পরশু সন্ধ্যেবেলা পাকা রাস্তায় দুজন ধরবার চেষ্টা করেছিল। দুজন বলে বাগাতে পারেনি, দলে ভারী হলে কি রেহাই পেতাম? তাহলে আপনার সামনেই গাল না দিয়ে কি থাকতে পারতাম আজ?

শুভ নিশ্বাস ফেলে বলে, না, তুমি প্রাণভরে গাল দাও, আমি রাগ করব না। সাবধান হয়েছো তো ?

হয়েছি বৈকি।

ঘণ্টাখানেক বসে শুভ। লক্ষ্মী আর কি দিয়ে আতিথ্য করবে, শুভকে সে একগ্লাস ডাবের জল খাওয়ায়। গাঁদা ডাবের জলটা এনে দিয়ে আবার তফাতে সরে যায়। লক্ষ্মী ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তি কেউ যে তার সঙ্গে কথা কইতে আসে না সেটা মোটেই খাপছাড়া মনে হয় না শুভর। লক্ষ্মীর কাছে সে খবরাখবর জানছে, লক্ষ্মীর সঙ্গে পরামর্শ করছে, না ডাকলে যেচে এসে কেউ তাদের আলাপে ব্যাঘাত করবে না।

আজ শুধু লক্ষ্মীর সঙ্গেই আলাপ করে উঠবে অথবা পাড়ার লোকজনকে ডেকে কিছুক্ষণ কথা বলবে ভাবছে, স্বয়ং মায়াকে এগিয়ে আসতে দেখে শুভর বিস্ময়ের সীমা থাকে না।

কাছে এসে লক্ষ্মীকে চিনতে পেরে মায়াও যেন অবাক হয়েই চেয়ে থাকে।

কি ব্যাপার মায়া ?

ব্যাপার ? ব্যাপার আবার কি, আমারও মন কেমন করতে লাগল, তাই দেখতে এলাম তুমি কি কাণ্ড করছ !

গাড়ি নিয়ে এসেছ ? একটা গাড়ি থামার আওয়াজ যেন পেয়েছিলাম।

পেয়েছিলে ? আশ্চর্য তো। গল্প করতে করতে গাড়ি থামার আওয়াজ পর্যন্ত কানে গেছে।

মায়া একটু বাঁকা হাসি হাসে। শুভর মুখে বিরক্তি ফোটে। লক্ষ্মী হাসিমুখে সরলভাবেই বলে, এত কাণ্ডের পর উনি হঠাৎ গাঁয়ে এলেন আপনার ভাবনা হবে বৈকি ! আসুন, বসুন।

মনে হয় দুজনেই যেন অপমান করছে মায়াকে—শুভ তার বিরক্তির ভাব দিয়ে আর লক্ষ্মী কিছু গ্রাহ্য না করে। কী কঠিন যে দেখায় মায়ার মুখ। বরফ-জমানো সুরে বলে, না, বসব না। সেবারও হঠাৎ কারখানায় ঢুকে তোমাদের আলাপে ব্যাঘাত করেছিলাম। তোমরা কথা কও, আমি বিদায় হচ্ছি।

শুভ গম্ভীর আওয়াজে কড়া শাসনের ভঙ্গিতে বলে, তোমার কি এ ছেলেমাস্থষি মানায় মায়া ? এসব ভাবা কি তোমার শোভা পায় ?

কিন্তু মায়ার কাছে তো অস্তিত্বই নেই বিস্তীর্ণ গ্রাম বা বিরাট গ্রাম্য জীবনের। দু-বার হানা দিয়ে দু-বারই সে শুভকে মশগুল হয়ে থাকতে দেখেছে এই গেঁয়ো মেয়েটাকে নিয়ে।

শুধু তাই নয়। কয়েকটা সিনেমায় সে তো দেখেছে কি ভাবে আজকের গেঁয়ো চাষীর মেয়ে শহরের বড়লোকের ছেলেদের বশ করে! এ নিয়ে শুভর সঙ্গে তর্কের নামে ঝগড়াও কি কম হয়েছে! আর শুভকে সে স্পষ্ট বলেছে যে তার বিদ্যাবুদ্ধি জ্ঞান আর সংস্কৃতি নিয়ে, আদর্শ নিয়ে, বড়াই করাটাই ভণ্ডামি। আসল কথায় তাদের আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেছে। স্বাধীন সমান আধুনিক বৌ সে চায় না, সে চায় ভীরু নিরীহ সরল সুমিষ্ট চিরন্তন ভারতীয় কাব্যের প্রতীকের মত একটা বৌ—যে একাধারে প্রিয়া এবং দাসী। শুভর জবাবগুলি হত খাঁটি। বৌ আর প্রিয়া নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় আর নেই এদেশের শিক্ষিত ভদ্রলোকের।

মায়ার কান্না পায়। সে বুঝতে পারে যে হঠাৎ সে যদি সমস্ত হিসাবনিকাশ চিন্তাভাবনা বিসর্জন দিয়ে শুধু নিরুপায় অসহায়ের মত—ভিখারিণীর মত—এখন মূর্ছিতা হয়ে পড়ে শুভর পায়ের কাছে—সমস্ত হিসাব সাময়িকভাবে বদলে যাবে। জগৎসংসার ভুলে গিয়ে এই শুভ তাকে সুস্থ সচেতন করে তোলার জন্য পাগল হয়ে উঠবে।

কিন্তু তাকে সুস্থ আর সচেতন করেই আবার শুভ ফিরে আসবে এই সরলা অবলা গেঁয়ো মেয়েটার টানে।

প্রেমের টানে নয়। সেটুকু বুঝবার মত বুদ্ধি মায়ার আছে। সব দিক থেকে বঞ্চিতা ধর্ষিতা দুঃখিনী মেয়েটাকে শুধু জানিয়ে দিতে যে সেও তার সঙ্গে আছে। বিদ্রোহ করতে চেয়ে বিপদে পড়েছে। তাই তার সঙ্গে আছে।

শুভ আর লক্ষ্মী মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। মোটর চেপে গাঁয়ে এসে তেঁতুল

গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে কি ভাবছে মায়া ?

লক্ষ্মী আবার বলে, একটু বসে যান না ? হলই বা ছেঁড়া পাটি। ছেঁড়া পাটিতে কি বসতে নেই ?

মায়া যেন ঘুম ভেঙে বলে, কি বলছ ?

বসতে বলছি।

না, বসব না। আমি যাই।

শুভ বলে, ফিরে যাচ্ছ ? একটা কাজ করবে ? কাউকে দিয়ে আমার স্যুটকেশটা পাঠিয়ে দেবে ?

তুমি থাকবে নাকি ?

হ্যাঁ, ক-দিন থাকব ভাবছি।

মায়ার চোখে আগুনের ঝিলিক মেরে যায় !

স্যুটকেশটা পাঠাব কোথায় ? তোমার এই লক্ষ্মীর এখানে এনে দিয়ে যাব ?

শুভ বলে, আমি কোথায় থাকব ঠিক নেই। গজেনের দোকানে হোক এখানে হোক, নন্দর বাড়িতে হোক—যেখানে পার পৌঁছে দিও। আমি ঠিক পেয়ে যাব।

লক্ষ্মী তাড়াতাড়ি বলে, সোজা কথা সহজ ভাষায় বোঝাতে পারেন না, কী লেখাপড়া শিখেছেন ?

মায়াকে বলে, লোক দিয়ে যদি পাঠান স্যুটকেশটা, তাকে বলবেন যেখানে হোক দিয়ে গেলেই হবে, ওঁকে খুঁজতে হবে না। আপনি নিজে যদি নিয়ে আসেন যাকে জিজ্ঞেস করবেন সেই বলে দেবে উনি কোথায় আছেন।

মায়া শুভর দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বলে, তোমাদের দুজনের কথাই বুঝেছি। আমি কিন্তু সোজা ফিরব না, জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে দেখা করে যাব।

শুভ হেসে বলে, বেশ, তাই যাও। বাবা খুব খুশি হবেন।

খুশি হোন বা না হোন…

খুব খুশি হবেন। জমিদারিটাই তোমার নামে লিখে দেবেন

তুমি ছোটলোক হয়ে গেছে শুভ।

ভাগ্যে হয়েছি!

মায়া আর দাঁড়ায় না। গটগট করে এগিয়ে যায়। লক্ষ্মী প্রায় ধমক দিয়ে শুভকে বলে, আপনি মিছেই লেখাপড়া শিখছেন! আপনারও মেয়েছেলের মত অভিমান, একটা কথার ঘা সইতে পারেন না? এখন কি করি আমি?

দু-হাতে দুটো ডাব ঝুলিয়ে ডোবার পাশ ঘুরে কচুজঙ্গল থেকে বেরিয়ে গাঁদা সামনে দাঁড়ায় মায়ার।

বলে, চলে যাচ্ছেন যে? আপনার জন্যে ডাব নিয়ে এলাম, জল খেয়ে। যান?

তুমি গাঁদা না?

গাঁদা খুশি হয়ে বলে, একদিন একমিনিট দেখে আমাকে আপনার মনে আছে!

একদিন দেখে নয়। তোমার কথা অনেকবার শুনেছি।

মায়া খানিকক্ষণ একদৃষ্টে গাঁদার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

গাঁদা, মহিম আসেনি?

নাঃ।

ছাড়া পাবে শুনেছিলাম?

হ্যাঁ ছাড়া পাচ্ছে। জেল থেকে অত শস্তায় ছাড়া পায় না।

মায়া ভেবেচিন্তে বলে, তুমি তো মুশকিল করলে।

কেন?

ওদের সঙ্গে ঝগড়া করে চলে যাচ্ছি। তুমি বলছ ডাবের জল খেতে। আমি এখন কোন্ দিক রাখি।

গাঁদা সঙ্গে সঙ্গে বলে, সব দিক রাখুন। ওদের সঙ্গে ভাব করুন, আমার ডাবের জল খান।

মায়া রুমাল দিয়ে মুখ মোছে।

এক্ষুনি ঝগড়া করলাম, এক্ষুনি যেচে গিয়ে ভাব করব?

যেচে ভাব করাই তো ভালো। আপনিই জিতে যাবেন। সত্যিকারের ঝগড়া তো আর হয়নি সত্যি সত্যি!

মায়া পায়ে পায়ে ফিরে যায়। ধীরে ধীরে পাটিতে বসে। কেউ কথা কইতে সাহস পায় না—লক্ষ্মী পর্যন্ত নয়। গাঁদা ঠিক কথাই বলেছে, যেখানে সত্যিকারের ঝগড়া নেই সেখানে যে যেচে ভাব করে সে-ই জিতে যায়। তাকে আবার চটিয়ে দেবার ভয়ে কেউ মুখ খুলতে সাহস পায় না!

গাঁদা অজস্র কথা বলে। নিজেই ডাব কেটে গেলাসে জল ঢেলে মায়ার হাতে তুলে দেয়।

এক নিশ্বাসে গেলাসের জলটা খেয়ে মায়া একটা নিশ্বাস ফেলে।

অনেকক্ষণ চিন্তা করে যেন একটা বিষয়ে শেষ সিদ্ধান্ত করেছে এমনিভাবে সে বলে, তোমার যেখানে সেখানে থেকে কাজ নেই। অসুখ-বিসুখ হয়ে যাবে। যতক্ষণ দবকার থাকো, আমিও থাকছি, আমার সঙ্গে ফিরে যাবে।

শুভ ক্ষুণ্ণ-স্বরে বলে, যেখানে সেখানে মানে?

লক্ষ্মী তাড়াতাড়ি বলে, আহা, কথাটা বুঝলেন না? উনি কি সে ভাবে বলেছেন কথাটা? উনি বলছেন, আপনার অভ্যাস নেই। মশার কামড় খাওয়া, ডোবা পুকুরের জল খাওয়া, এসব অভ্যাস নেই, হঠাৎ সইবে না। উনি ঠিক বলেছেন, আমিও তাই বলি। হঠাৎ বাড়াবাড়ি করে অসুখ বাধিয়ে লাভ কি?

লক্ষ্মী একগাল হাসে, না বোন, ভাবনা নেই! তোমাব উনি তোমার সঙ্গেই ফিরে যাবেন।

শুভ একটা সিগারেট ধরিয়ে বলে, তোমবা দুজনে মিলে আমায় যেন খোকা বানিয়ে দিলে।

বাতাসে ঝিরঝির শব্দ হয় তেঁতুলগাছের পাতায়। ঘন ছায়ার এখানে ওখানে অবিরাম ঝিকমিক করে আলোব রেখাগুলি কাঁপে।

—শেষ-